সমরেশ মজুমদার

অর্জুন সমগ্র

৪

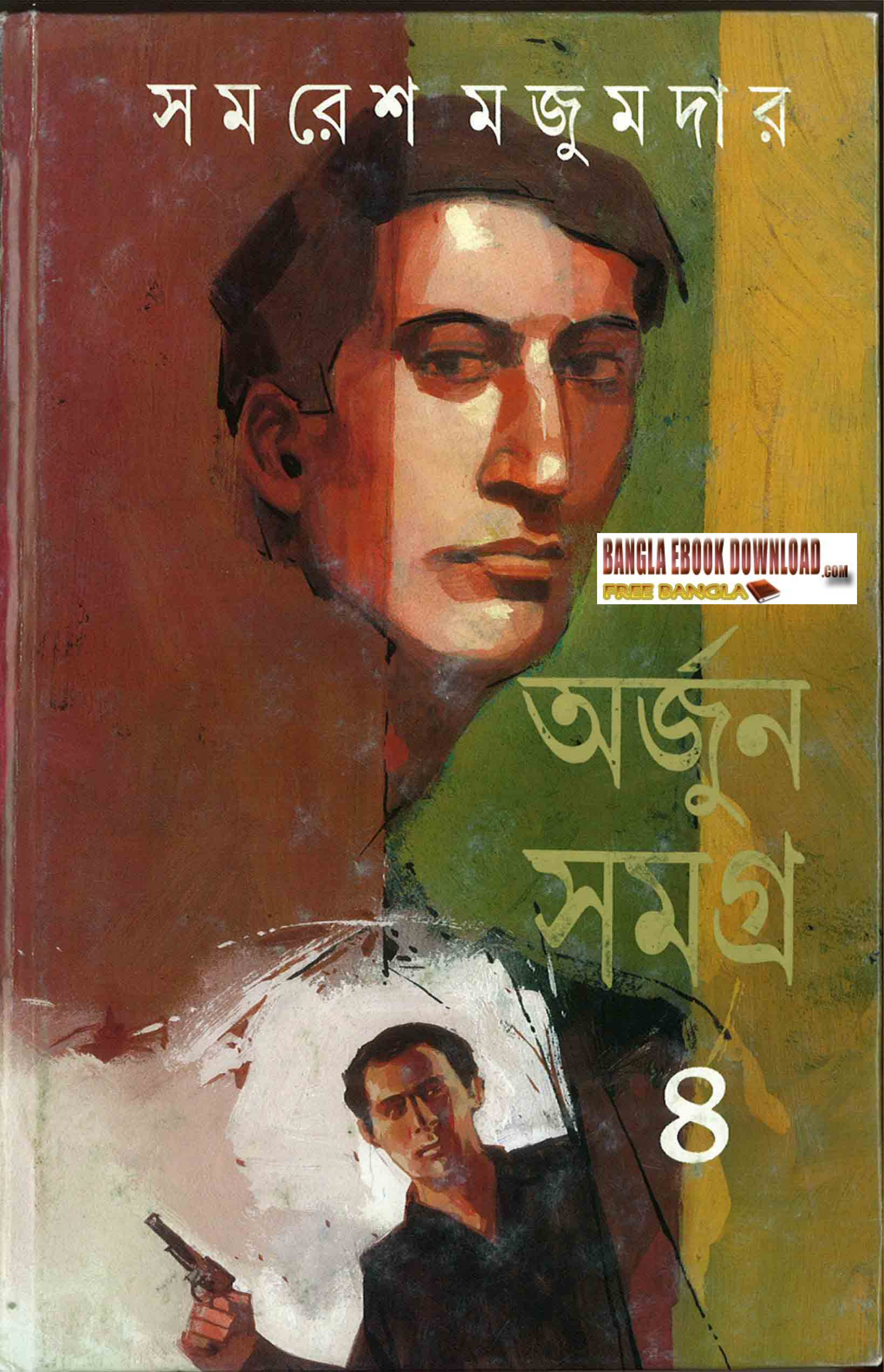

BANGLA EBOOK DOWNLOAD.COM
FREE BANGLA

অর্জুন সমগ্র ৪

সমরেশ মজুমদার

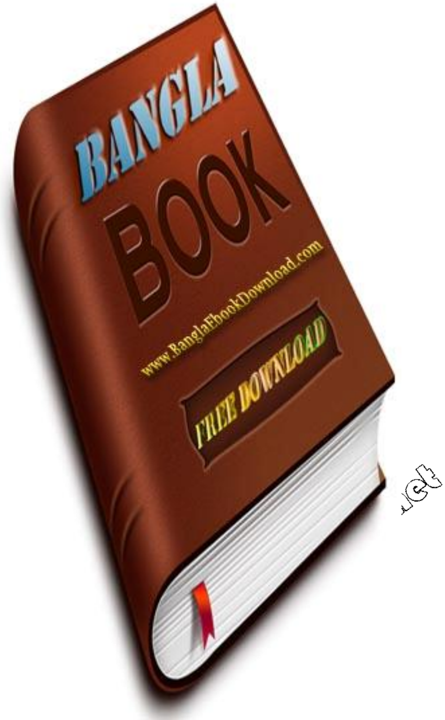

সূচিপত্র

অর্জুন এবার কলকাতায় ৭
জয়ন্তীর জঙ্গলে ৭৩
শমননন্দন যমনন্দন ১৫৫
তিন জালিয়াত এবং এক মিথ্যেবাদী ২৪১
ঘুমঘুমের সেনবাড়ি ৩৩১
আমি অর্জুন ৪০৭
অর্জুন হতভম্ব ৪২২
অর্জুন ও অদিতি ৪৩১
বেরসিক অর্জুন ৪৩৯

গ্রন্থ-পরিচয় ৪৬৯

pathagar.net

অর্জুন এবার কলকাতায়

pathagar.net

রাতের ট্রেনে কলকাতায় আসার একটাই সুবিধে। বিছানা পেতে টানটান হয়ে শুয়ে পড়ো, চোখ যখন খুলবে তখন কলকাতা আসব আসব করছে। অনেকের নাকি ট্রেনে ঘুম আসে না, অর্জুনের ঠিক উলটো। গাড়ির চাকার আওয়াজ, কামরার দুলুনি, দ্রুত ঘুম ডেকে আনে। সময়টা যদি শীতকাল হয় তো কথাই নেই!

এখন সেপ্টেম্বর। এ-সময় বৃষ্টি না পড়লে চিটচিটে গরম পড়ে যায়। যিনি অর্জুনকে কলকাতায় আসার জন্যে অনুরোধ করেছেন তিনি টেলিফোনে বলেছিলেন, "আগামীকাল সকালের মধ্যে চলে এলে ভাল হয়। আজ প্লেন পাবেন না বাগডোগরা থেকে, রাতের ট্রেন ধরুন। এসি-র যে-কোনও টিকিট কেটে চলে আসুন, আসামাত্র টাকাটা পেয়ে যাবেন।" কলকাতায় যাবে কি না সেটা স্থির করার পর স্টেশনে গিয়ে অর্জুন জানতে পারল, এসি টু বা থ্রির কোনও টিকিট নেই, ওয়েটিং লিস্টে নাম তোলার কোনও মানে হয় না। দ্বিতীয় শ্রেণীর থ্রি-টিয়ারের একটি টিকিট পাওয়া যেতে সেটাই কিনে ফেলেছে সে। এখন নাকি বেশিরভাগ ট্রেন থেকে ফার্স্ট ক্লাস উঠে গেছে। অথচ এক সময় ফার্স্ট ক্লাস কত আরামদায়ক ছিল।

দ্বিতীয় শ্রেণীর থ্রি-টিয়ার বলে খুব অসুবিধে হয়নি অর্জুনের। সোজা ওপরে উঠে গিয়ে শুয়ে পড়লে কী এমন পার্থক্য থাকে! কিন্তু গরমে শরীর যখন ঘামে ভিজল তখন ঘুম ভেঙে গেল অর্জুনের। ট্রেনটা এখন থেমে আছে বলেই বোধ হয় হাওয়া নেই। সে ঘড়িতে সময় দেখল, রাত দুটো। কামরায় হালকা নীল আলো জ্বলছে। সে পাশ ফিরল। কোনও হকারের গলা শোনা যাচ্ছে। যে প্ল্যাটফর্মে ট্রেন থামলে, তা যত রাতই হোক, ওদের হাঁক শোনা যায়। সে

pathagar.net

নীচের দিকে তাকাল। সবাই শুয়ে রয়েছে, শুধু প্যাসেজের পাশে ডাব্‌ল বাথের নীচেরটায় একজন জানলার পাশে গালে হাত রেখে বসে আছেন। অর্জুন তাঁকে জিজ্ঞেস করল, "কোথায় এল?"

"কোথাও না।" লোকটি না ফিরে জবাব দিলেন।

"এটা কোন স্টেশন?"

"সামনে জলা জঙ্গল। ঘুটঘুটে অন্ধকার। এরকম জলার অন্ধকারেই আলেয়ার আলো জ্বলে, বইতে পড়েছিলাম। অথচ দেখতে পাচ্ছি না।"

অর্জুনের বেশ মজা লাগল কথাগুলো শুনে। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই হাউন্ড অব বাস্কারভিল পড়েছেন। ওঁর যা বয়স তাতে ছেলেবেলায় পড়া উপন্যাসকে মনে করে এভাবে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকা একটু অস্বাভাবিক। অর্জুন সন্তর্পণে ওপরের বাঙ্ক থেকে নেমে এল নীচে। ঘুমন্ত শরীরগুলোর দিকে একবার তাকিয়ে ভদ্রলোকের পাশে এসে জিজ্ঞেস করল, "বসতে পারি?"

ভদ্রলোক এমনভাবে হাত নাড়লেন যার অনেক অর্থ হতে পারে। তবু অর্জুন বসল। বাইরে সত্যি গভীর অন্ধকার। আকাশে নিশ্চয় মেঘ আছে যার জন্যে তারার আলো পৃথিবী পাচ্ছে না। আন্দাজে একটুকু বোঝা যাচ্ছে, সামনে অনেকটা জায়গা জুড়ে জল রয়েছে। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "ট্রেনটা এখানে কতক্ষণ থেমে আছে?"

"ঘড়ি দেখিনি।"

অর্জুন তাকাল। নীল আলোয় যেটুকু দেখা যাচ্ছে, ওঁর বয়স চল্লিশের বেশি নয়। হয় ওঁর কথা বলতে ভাল লাগছে না, নয় সত্যি কথা বলতে উনি অভ্যস্ত। এই সময় নীচে টর্চের আলো দেখা গেল। দু'জন লোক কথা বলতে বলতে পাথরের ওপর দিয়ে আসছে। এরা ট্রেনের লোক আন্দাজ করে অর্জুন জানলা থেকেই জিজ্ঞেস করল, "কোনও গোলমাল হয়েছে নাকি?"

"এসি টু-টিয়ারে খুন হয়েছে।" লোকটি নীচ থেকে উত্তর দিল।

অর্জুনের পাশে বসা লোকটি হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠলেন, "খুন? আরিব্বাস! খুনি ধরা পড়েছে নাকি? ও মশাই— !"

"না। ধরা পড়েনি। খুন করে বাথরুমে লুকিয়ে ছিল। অন্য প্যাসেঞ্জাররা চেন টেনে ট্রেন থামাতেই লাফ দিয়ে নীচে নেমে গেছে।"

"নীচে কোথায় যাবে? সামনে তো জল। অন্ধকার।" পাশের লোকটি উঠে দাঁড়ালেন। যেন খুব সমস্যায় পড়ে গিয়েছেন এমন গলায় অর্জুনকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার কী মনে হয়?"

Pathagar.net

অর্জুন দেখল রেলের লোকদুটো টর্চের আলো ফেলে চলে গেল। সে বলল, "এমনও হতে পারে লোকটা নীচে নেমেই অন্য কামরায় উঠে গেছে।"

"অ্যাঁ? গুড। এই আইডিয়াটা আমার মাথায় আসেনি। উঠতেই পারে। অন্ধকারে জলে গিয়ে লুকোলে সাপের ছোবল খাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তার চেয়ে যে-কোনও একটা কামরায় উঠে পড়লে মানুষের ভিড়ে স্বচ্ছন্দে মিশে যেতে পারে। কে জানে ওই আমাদের এই কামরায় উঠেছে কি না। চলুন, দেখে আসি দরজাটা খোলা রয়েছে কি না।"

ভদ্রলোক এগিয়ে গেলেন। দেখা গেল প্ল্যাটফর্মের দিকের দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করা আছে। উলটো দিকটা খোলা। সেটাকে বন্ধ করে ভদ্রলোক চেঁচিয়ে উঠলেন, "সর্বনাশ! মনে হচ্ছে এই দরজা দিয়ে খুনি উঠে এসেছে। কে খুলল দরজাটা? খুনিকে সাহায্য করল কে?" ভদ্রলোক অর্জুনের দিকে তাকালেন, "কী করা যায় এখন? কামরায় সার্চ করলেই খুনি ধরা পড়ে যাবে। আপনি পুলিশকে খবর দেবেন?"

"এখানে পুলিশ কোথায়?" ওঁর ভঙ্গি দেখে অর্জুনের মজা লাগছিল।

"আঃ। মেল ট্রেনে পুলিশ থাকে এই খবরটা জানেন না? এই কামরায় তাদের থাকার কথা কিন্তু তারা নেই। আশপাশে খুঁজে দেখুন না, ঠিক পেয়ে যাবেন। পুলিশ এলে মধ্যরাতের খুনিকে আমরা ধরে ফেলতে পারব।" ওঁর কথা শেষ হতে-না-হতে পেছনের দরজায় শব্দ হল এবং সেইসঙ্গে গলা পাওয়া গেল, "আরে! দরজা বন্ধ করল কে? দরজা খুলুন। শুনছেন?"

"কে? কে ওখানে?" ভদ্রলোকের গলা কেঁপে উঠল।

"পুলিশ।"

অর্জুন এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিতে দু'জন রাইফেলধারী পুলিশ কামরায় উঠে এল। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "দরজা আপনারা খুলেছিলেন?"

"হ্যাঁ। লোকটাকে ধরতে পারলাম না, জলে নেমে গেল।"

ভদ্রলোক ফ্যাসফ্যাসে গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "জলে?"

"হ্যাঁ। সাঁতরে চলে গেছে অনেকটা।"

"আপনারা জলে নেমে ওকে ধরতে পারলেন না?"

"দুর মশাই। আমি স্থলপুলিশ, জলপুলিশ নই যে সাঁতার জানতেই হবে। ও জানে কিন্তু অন্ধকারে বিলের জলে নামলে সাপের ছোবল খাওয়া খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। আমাদের প্রাণের দাম নেই?" পুলিশটি বলল।

"সাপ তো ওকেও ছোবল মারতে পারে।"

pathagar.net

"ওর তো ঝুঁকি না নিয়ে কোনও উপায় নেই। তবে বেশিক্ষণ থাকতে পারবে না। জোঁক আছে খুব। উঠে আসবে। ট্রেন যদি ঘণ্টাখানেক দাঁড়ায় তা হলেই ধরা পড়ে যাবে বাছাধন। দরজায় দাঁড়িয়ে আমরা ওয়াচ রাখছি।"

অর্জুন একটু ঝুঁকে দেখতে পেল আশপাশের কামরা থেকে টর্চের আলো পড়ছে বিলের জলের ওপর। কোথাও একটু নড়াচড়া দেখলে ট্রেনের যাত্রীরা চেঁচিয়ে উঠছে। 'ওই যে ওই যে।' ভদ্রলোক বললেন, "উত্তেজিত হয়ে গুলি চালাবেন না যেন!"

পুলিশের একজন অবাক হল, "মানে?"

"খুনি আসামিও মানুষ। ন্যায়বিচার চাইবার অধিকার তার আছে। তাকে গুলি করে মেরে ফেলাও সমান অপরাধ করা। আর-একধরনের খুন করা।" ভদ্রলোক কথা শেষ করতেই ট্রেনটা নড়ে উঠে জোরে জোরে বাঁশি বাজাতে লাগল। পুলিশটি বলল, "যাঃ।"

ট্রেন চলা শুরু করেছে। ভদ্রলোক চিৎকার করলেন, "এটা কী হচ্ছে? ট্রেন চলছে কেন? আপনারা চেন টানুন।"

ঘুম ভেঙে বিরক্ত মুখে উঠে আসা দু'জন যুবক পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের একজন ধমকাল, "খবরদার, কেউ চেন টানবেন না। আমরা কি সারারাত এখানে দাঁড়িয়ে থাকব? তা হলে কলকাতায় পৌঁছব কখন? ইয়ার্কি!"

ট্রেন একটা সাঁকোর ওপর ওঠায় গুম গুম শব্দ হচ্ছিল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে দু'পাশে মাঠ চলে এল। অন্ধকারেও জল আর মাঠের মধ্যে যে পার্থক্য তার কিছুটা বোঝা যায়। ট্রেন চলতে শুরু করায় পুলিশরা দরজা বন্ধ করে দিল। যুবকরা ফিরে গেল তাদের বাঙ্কে আর ভদ্রলোক খুব হতাশ হয়ে বললেন, "এইজন্যে এদেশে অপরাধীরা ধরা পড়ে না। বলুন, আর কিছু করার নেই।"

ভদ্রলোক নিজের জায়গায় ফিরে এসে বসলেন। অর্জুনের ঘুম পাচ্ছিল না। সে লক্ষ করল এতসব ঘটনা ঘটা সত্ত্বেও কামরার বেশিরভাগ যাত্রী বাঙ্ক থেকে নেমে আসেনি। এখন কারও কারও নাক ডাকার আওয়াজ পাওয়া গেল। ভদ্রলোকের পাশে বসে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনার সঙ্গে আলাপ হল কিন্তু নামটা জানা হয়নি। আমি অর্জুন, জলপাইগুড়িতে থাকি।"

"ও। আমি সর্বেশ্বর বাগচি।" বলেই ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, "চেনা মনে হচ্ছে?"

Pathagar.net

সর্বেশ্বর বাগচি? অর্জুন ঠাওর করতে না পারায় মাথা নাড়ল।

"প্রতিহিংসা, ভরদুপুরে খুনোখুনি, হায়েনার হাসি, কিছু মনে পড়ছে?"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "এগুলো তো সিনেমার নাম!"

"গুড। আমার সৃষ্টির মধ্যেই আমি বেঁচে থাকব। ওই ছবিগুলোর পরিচালক আমি।"

"আচ্ছা! আপনি ফিল্ম ডিরেক্টর?" অর্জুন বলল।

"হ্যাঁ। তবে ক্রাইম এবং মিস্ট্রি, মানে রহস্য, আমার ছবির বিষয়। তাই অন্যান্য পরিচালকের মতো যে-কোনও গল্প নিয়ে বছরে তিনটে ছবি আমি করতে পারি না। খুব ভেবেচিন্তে আমাকে বিষয় নির্বাচন করতে হয়। মোহন সিরিজের মতো গোঁজামিলে আমি বিশ্বাস করি না। আমি যুক্তি দিয়ে রহস্য করি।" সর্বেশ্বরবাবু হাসলেন, "দার্জিলিং গিয়েছিলাম এক ক্রিমিন্যালের সঙ্গে দেখা করতে। একটু দেরি করে ফেলেছিলাম। গিয়ে শুনলাম লোকটার ক্যানসার হয়েছে! কলকাতায় এসেছে চিকিৎসার জন্যে। ভেবেছিলাম ওর সঙ্গে আলোচনায় বসলে পরের ছবির বিষয় পেয়ে যাব। হল না।"

"বাঃ, খুব ভাল। আপনি জীবন থেকেই গল্প খোঁজেন।"

"কারেক্ট। আমার সমস্যা হল আমি এয়ারকন্ডিশনে বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারি না। অ্যাজমার টেনডেন্সি আছে। তাই থ্রি-টিয়ারে যাওয়া আসা করি। এতে সুবিধে হল, অনেক নতুন চরিত্র দেখা যায়। আপনি কি বেড়াতে যাচ্ছেন?"

"না। কাজ নিয়ে যাচ্ছি।"

"কী কাজ? অফিসের?"

"না। একজন আমাকে তাঁর কোনও কাজ করে দিতে অনুরোধ করেছেন।"

"কলকাতায় কোথায় আপনি উঠবেন?"

"হোটেলে। পূরবী সিনেমার সামনে হোটেলটা।"

আচ্ছা। ইন্টারেস্টিং। আপনার প্রফেশনটা কি জানতে পারি?"

অর্জুন সর্বেশ্বরের দিকে তাকায়, "সত্যসন্ধান করা।"

"মানে?" সর্বেশ্বরের চোখ ছোট হয়ে গেল, "রহস্যসন্ধানীর কথা জানি, সত্যসন্ধানী মানে, আচ্ছা, আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি! আরে ভাই, আপনি এই অল্প বয়সেই, কী নাম বললেন যেন, অর্জুন! তাই না? এখন মনে হচ্ছে নামটা এর আগে মহাভারত ছাড়াও শুনেছি। হাত মেলান, আমরা একই পথের পথিক।"

সর্বেশ্বর অর্জুনের হাত ধরে ঝাঁকাতে লাগলেন। ভদ্রলোকের শরীরে শক্তি

pathagar.net

আছে, টের পেল অর্জুন। সে বলল, “নিন, শুয়ে পড়ুন। আর কতক্ষণ জেগে থাকবেন!”

“অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকতে আমার খুব ভাল লাগে। ইচ্ছেমতো কত কী কল্পনা করা যায়। আপনি শুয়ে পড়ুন, কাল সকালে দেখা হবে।”

অর্জুন নিজের বাঙ্কে উঠে পড়ল। সর্বেশ্বর বাগচি পরিচালিত প্রতিহিংসা, ভরদুপুরে খুনোখুনি অথবা হায়েনার হাসি ছবি তিনটের একটাও তার দেখা হয়নি। ওগুলো চিলড্রেন ফিল্ম না বড়দের জন্যে তাও তার জানা নেই। কিন্তু ভদ্রলোক যে রহস্য খুনজখম নিয়ে বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েন তা একটু আগে বোঝা গেল। কিন্তু সব মিলিয়ে মানুষটি সহজ, বেশ সহজ।

আবার ঘুমিয়ে পড়েছিল অর্জুন। চোখ খুলল যখন, তখন রোদ উঠে গেছে। ঘড়ি দেখল, প্রায় সাড়ে সাতটা। যাত্রীরা সবাই কথা বলছে। আলোচ্য বিষয় কাল রাতের খুন এবং খুনির আত্মগোপনের কাহিনী। কেউ কেউ এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে, পুলিশ ভুলও দেখতে পারে। খুনি বিলের জলে বা লুকিয়ে এই ট্রেনেই হয়তো উঠে পড়েছে, হয়তো এই কামরায়। তা হলে খুনি এবং মৃতদেহ নিয়ে ট্রেন চলছে।

অর্জুন বাঙ্ক থেকে নামতে নামতে ভাবল এই তথ্য ওঁরা পেলেন কী করে। কাল রাতে যখন ঘটনাটা ঘটেছিল তখন ওই যুবকেরা ছাড়া তো কেউ জেগে ছিলেন বলে মনে হয়নি। হঠাৎ নীচের বাঙ্কের এক যাত্রী বললেন, “এই তো, ইনি কাল পুলিশের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। হ্যাঁ ভাই, পুলিশ কি ঠিক দেখেছিল?”

অর্জুন মাথা নাড়ল, “ঘটনাটা যখন ঘটেছিল তখন আমি আপনার মতোই ঘুমিয়ে ছিলাম। আমরা কোথায় এখন?”

“এই বর্ধমান পেরিয়ে এলাম। দু'ঘণ্টা লেটে চলছে ট্রেন।”

অর্জুন সর্বেশ্বরবাবুর বাঙ্কের দিকে তাকিয়ে দেখল সেখানে তিনি নেই। ওঁর শোয়ার জায়গাটাকে মুড়ে চেয়ারে পরিণত করা হয়েছে। সে টয়লেটে গেল। এর মধ্যেই জায়গাটা প্রায় নরক হয়ে উঠেছে। থ্রি-টিয়ার নন-এসিতে যাঁরা যাওয়া-আসা করেন তাঁদের এই দুর্ভোগ পোহাতেই হয়।

“গুড মর্নিং অর্জুন।” সর্বেশ্বর উলটোদিকের টয়লেট থেকে বেরিয়ে এলেন।

“গুড মর্নিং। শেষপর্যন্ত ঘুমিয়েছিলেন তো?”

“নাঃ। এটাই আমার অসুখ। ঘুমের ওষুধ না খেলে ঘুম আসে না।”

pathagar.net

"তা হলে তো ওটা খাওয়া উচিত, নইলে শরীর খারাপ হয়ে যাবে।"

"দুর। না-ঘুমোবার জন্যে আমার শরীর খারাপ হয় না। সাত-সাতটা রাত না ঘুমিয়ে দেখেছি, দিনের বেলায় কাজ করতে অসুবিধে হয়নি। ডাক্তারও অবাক হয়ে গিয়েছে শুনে। যাকগে, বর্ধমানে পুলিশবাহিনী এসে খুব হইচই করল। যেন খুনিকে ধরে ফেলল বলে। অদ্ভুত!" সর্বেশ্বর বললেন।

অর্জুন অবাক হয়ে গেল। সত্যি যদি এই ভদ্রলোক সাত-দিনরাত না ঘুমিয়েও সুস্থ থাকতে পারেন, তা হলে ডাক্তারদের উচিত ওঁর ওপর গবেষণা করা।

"চা খেয়েছেন?" সর্বেশ্বর বাগচি জিজ্ঞেস করলেন।

"না।"

"আসুন আমার সঙ্গে।"

নিজের জায়গায় গিয়ে সর্বেশ্বর বাস্কেট থেকে ফ্লাস্ক বের করে গ্লাসে চা ঢাললেন, "কুৎসিত চা। বর্ধমান স্টেশনে বিক্রি হচ্ছিল। তবে ট্রেনে বসে গরম চা পাচ্ছেন এই আনন্দে খেয়ে নেওয়া উচিত। নিন।"

অর্জুন চায়ে চুমুক দিল, মন্দ না। হঠাৎ সর্বেশ্বর বাগচি বললেন, "একটা টানটান ক্রাইম স্টোরি দিন না, ছবি করি। প্রোডিউসার রেডি।"

অর্জুন হাসল, "আমি গল্প লিখতে পারি না।"

"লিখতে হবে না। এক্সপেরিয়েন্স থেকে বলুন।" সর্বেশ্বর বাগচি মাথা নাড়লেন, "বুঝতে পেরেছি, এভাবে হবে না। ঠিক আছে, আপনাকে হোটেলে উঠতে হবে না, আমার বাড়িতে চলুন। যে কাজের জন্যে এসেছেন সেটা করুন, আমি বিরক্ত করব না। রাত্রে আপনি আপনার অভিজ্ঞতার কথা আমাকে বলবেন, গল্প পেলাম তো ভাল, না পেলেও কোনও ক্ষতি নেই। ঠিক আছে?"

"আপনি আমাকে ভাল করে চেনেন না, অথচ বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইছেন। যদি আমি খুব বাজে লোক হই?"

"সত্যি কথা বলব? ঝুঁকি একটু থাকছেই। তা ঝুঁকি নিতে আমার মন্দ লাগে না।"

pathagar.net

ভবানীপুর থানার উলটোদিকের রাস্তায় সর্বেশ্বর বাগচির পৈতৃক বাড়ি। বেশ বয়স হয়েছে। দোতলায় তিনি থাকেন। সেখানে পাঁচখানা ঘর। নীচের

ঘরগুলোয় দোকান রয়েছে, ভাড়ায়। তালা খুলে তিনি বললেন, "না না, জিনিসপত্র যা আছে একেবারে আপনার ঘরে রেখে আসুন।"

এগিয়ে গিয়ে ঘরটা দেখিয়ে জানলা খুলে দিলেন তিনি। ঘরের মাঝখানে একটা সেকেলে পালঙ্ক, টেবিলের সঙ্গে আটকানো আয়না এবং চেয়ারটিও সেকালের। সর্বেশ্বর বাগচি বলল, "এ বাড়িতে অ্যাটাচ্‌ড বাথ অথবা টয়লেট নেই। একটা আছে ডান দিকে। অন্যটা বারান্দার বাঁ দিকে। আপনি বিশ্রাম নিন, আমি জলখাবারের ব্যবস্থা করি।" সর্বেশ্বরবাবু চলে যাচ্ছিলেন, অর্জুন ডাকল, "এখানে আপনি একাই থাকেন?"

"সেইজন্যেই তো আপনাকে ডেকে নিয়ে এলাম। কারও সঙ্গে পরামর্শ করার দরকার নেই, এর নাম স্বাধীনতা, হে হে হে।" ভদ্রলোক চলে গেলেন।

একদম অচেনা কোনও মানুষের বাড়িতে এভাবে আসতে এতক্ষণ যে সংকোচ মনে ছিল, তা চলে গেল। অনেক আপত্তি করেছিল অর্জুন, সর্বেশ্বরবাবু শোনেননি। স্টেশন থেকে বেরিয়ে পূরবী সিনেমার সামনে যে হোটেলে অর্জুনের ঘর বুক করা ছিল সেখানে গিয়ে নিজের টেলিফোন নাম্বার আর ঠিকানা জানিয়ে দিয়ে এখানে এসেছেন। যে ভদ্রলোকের আমন্ত্রণে অর্জুন এখানে এসেছে তিনি যাতে খবরটা পেয়ে যান তাই এই ব্যবস্থা। ফেরার সময় বলেছেন, "ব্যস, আর কোনও ধন্দ রইল না।"

"কীরকম?" অর্জুন জিজ্ঞেস করেছিল।

"আপনার নামে হোটেলের ঘর বুক করা ছিল। কথাটা আপনি ট্রেনে আমাকে বলেছিলেন। আপনি যদি প্রতারক হতেন তা হলে বুকিং থাকত না।" সর্বেশ্বর হেসেছিলেন। অর্জুন তর্ক করেনি। প্রতারকরা সব পারে, এটা বলে লাভ নেই।

স্নানটান করে সর্বেশ্বরবাবুর সঙ্গে ব্রেকফাস্ট করল অর্জুন। শসা, পেঁপে, টোস্ট আর এক গ্লাস বেলের শরবত। এমন সাত্ত্বিক প্রাতরাশ কোনওদিন করেনি সে। অবশ্য এখন সময়টা আর প্রাতরাশের নয়। সর্বেশ্বরবাবু একটা খারাপ খবর জানালেন। তাঁর ফোনটা কাজ করছে না। এ ক'দিনের অনুপস্থিতিতে যন্ত্রটি নির্বাক হয়েছে। এখনই টেলিফোন অফিসে খবর দিতে যাবেন। টেলিফোনের নাম্বারটা তিনি একটা কাগজে লিখে অর্জুনকে দিয়ে দিলেন।

সর্বেশ্বরবাবু বলেছিলেন তাঁর বাড়ি থেকে এলগিন রোড বেশি দূরে নয়। পাতাল রেলে ঠিক মিনিট চার লাগল। নাম্বার মিলিয়ে বাড়ির বদলে গেট খুঁজে

pathagar.net

পেল সে। দুটো লম্বা থামের একটায় নাম্বার, অন্যটায় নাম খোদাই করা। এস এন রায়চৌধুরী।

অর্জুন গলিটা দিয়ে হাঁটতে লাগল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই চারপাশের আবহাওয়া দ্রুত বদলে গেল। বড় রাস্তার গাড়ির আওয়াজ কমে যেতে পাখির ডাক কানে এল। দু'পাশের লম্বা পাঁচিল শেষ হতেই গাছগাছালি নজরে এল। বিশাল বাগান, বাগানের মাঝখানে একটি প্রাসাদ। বাইরে, ওই এলগিন রোডে দাঁড়িয়ে কল্পনাই করা যাবে না এরকম একটি প্রাসাদ শহরের মাঝখানে রয়েছে। পাখি ডাকছে বাগানের গাছগুলোতে। নিশ্চিন্তে।

সাদা দোতলা বাড়ির নীচের একদিকটায় গ্যারাজ স্পেস। সেখানে তিনটে দামি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। অর্জুন আর একটু এগোতেই একটি লোক সামনে এসে দাঁড়াল, "আপনি এখানে কীজন্যে এসেছেন?"

"এটা সীতানাথ রায়চৌধুরীর বাড়ি তো?"

"হ্যাঁ।"

"তিনি আমাকে আসতে বলেছেন।"

"আপনার নাম?"

"বলবেন, জলপাইগুড়ি থেকে অর্জুন এসেছে।"

"একটু অপেক্ষা করুন।" লোকটি ভেতরে চলে গেল। চেহারা এবং পোশাক দেখে এ-বাড়ির কর্মচারী বলে মনে হচ্ছিল কিন্তু কথাবার্তায় চমৎকার মার্জিত ভাব। মিনিটখানেক বাদে লোকটি ফিরে এসে অনুরোধ করল ওর সঙ্গী হতে।

দরজার দিকে যাওয়ার সময় লোকটি জিজ্ঞেস করল, "প্রধান গেটে কেউ আপনার পরিচয় জিজ্ঞেস করেছিল?"

"না। কেউ ছিল না সেখানে, কেন?", অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"একজনের থাকার কথা, কিন্তু প্রায়ই সে তার নিজের জায়গায় থাকে না। সাহেব জানলে ওর চাকরি থাকবে না।" সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় এসে লোকটি বলল, "আপনি বাঁ দিকের ওই দরজাটা ঠেলে ভেতরে গিয়ে বসুন, সাহেব এখনই আসছেন।"

বৈভব কাকে বলে এই ঘরের আসবাব দেখলে অনুমান করা যায়। শুধু বৈভব নয়, তার সঙ্গে মিশে আছে আভিজাত্য। পায়ের তলায় যে কার্পেট তা কি পারস্য থেকে এসেছে? অর্জুন আরামদায়ক চেয়ারে বসল। সামনের দেওয়ালে বিশাল লম্বা ঘড়ি। হঠাৎ তার দরজা খুলল। একটি পুতুল সেই

Pathagar.net

দরজায় নত হয়ে দাঁড়াতেই ঘড়ি সময় জানিয়ে দিল। পুতুল অদৃশ্য হতে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। অর্জুনের মনে পড়ল কোথায় যেন পড়েছে হায়দরাবাদের নিজামের সংগ্রহে এইরকম ঘড়ি ছিল।

শব্দ করে উলটোদিকের দরজা খুলে গেল। অর্জুন সেদিকে তাকাতে দেখতে পেল এক ভদ্রলোক হুইলচেয়ারের চাকা ঘুরিয়ে এগিয়ে আসছেন। মাথার চুল ধবধবে সাদা, শীর্ণ দেহে মূল্যবান পাঞ্জাবি, গায়ের রং এখনও পাকা সোনার মতো। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। একেবারে সামনে এসে থামলেন ভদ্রলোক। প্রায় তিরিশ সেকেন্ড এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললেন, "আপনি অর্জুন?"

"হ্যাঁ।"

"প্রমাণ কী?"

অর্জুন পকেট থেকে ট্রেনের টিকিট বের করে বলল, "এই টিকিটে আজ আমি জলপাইগুড়ি থেকে এসেছি। আমার সঙ্গে আইডেনটিটি কার্ড আছে, দেখতে চাইলে দেখতে পারেন।"

হাত বাড়িয়ে টিকিটটা নিলেন ভদ্রলোক, "এ কী! সেকেন্ড ক্লাস?"

"হ্যাঁ। এসি-র টিকিট পাওয়া যায়নি।"

"হোটেলে ওঠেননি কেন?"

"আমার এক সহযাত্রীর অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারিনি, তাই।"

"আমেরিকায় থাকেন এমন একজন বাঙালির নাম বলুন।"

"মেজর?"

"গুড। দেখতে কেমন?"

"লম্বা, মোটাসোটা, দাড়ি আছে।"

"বিশেষত্ব?"

"পৃথিবীর রহস্যময় জায়গাগুলোতে অভিযান করেছেন, যা কোনও বাঙালির পক্ষে অভিনব, আর হুইস্কি খেতে ভালবাসেন।" অর্জুন জানাল।

এতক্ষণে ভদ্রলোকের মুখে হাসি দেখা দিল। মাথা নেড়ে বললেন, "আমার নাম সীতানাথ রায়চৌধুরী। মেজর আমাকে আপনার নাম বলেছেন। কিন্তু আমি ভাবতে পারিনি আপনি এত অল্পবয়েসি। আমি ভেবেছিলাম—। যাকগে, কলকাতায় আসতে নিশ্চয়ই আপনার খুব অসুবিধে হয়েছে, এত অল্প সময়ে এসেছেন!"

"আমার কোনও অসুবিধে হয়নি।"

pathagar.net
BANGLA EBOOK DOWNLOAD.COM
FREE BANGLA

"ও।" হুইলচেয়ারের হাতলে লাগানো একটা সাদা বোতাম টিপলেন সীতানাথ রায়চৌধুরী। অর্জুন লক্ষ করল সাদা বোতামটা রয়েছে বাঁ দিকের হাতলে, ডান দিকে লাল বোতাম। ভদ্রলোক বললেন, "আপনি আমেরিকায় গিয়ে লাইটার সংক্রান্ত একটি সমস্যার সমাধান করেছেন। মেজর আমাকে নিউ ইয়র্ক টাইম্‌সের কপি পাঠিয়েছেন যেখানে আপনার কথা লেখা হয়েছিল। বাঃ। খুব ভাল কথা।"

"আপনি আমাকে কেন ডেকেছেন তা আমি এখনও জানি না।"

"নিশ্চয়ই জানবেন। এত দূরে আপনাকে ডেকে নিয়ে এসেছি যখন তখন তো জানাতেই হবে। টেলিফোনে আমি বলতে চাইনি সঙ্গত কারণে।" সীতানাথবাবুর কথা শেষ হতে না হতেই একজন পরিচারিকা ট্রে হাতে করে ঢুকল। তার পেছনে মধ্য তিরিশের এক মহিলা। এমন সুন্দরী মহিলাকে শুধু কল্পনা করা যায়। সাদা তাঁতের শাড়ি, তাতে নীল ফুল, সামান্য ঘোমটা-টানা, যা খোঁপার ওপর ওঠেনি, ঘরে ঢুকে নমস্কার করলেন। সীতানাথবাবু বললেন, "আমার বউমা।"

অর্জুন উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার জানাল। সীতানাথবাবু এই ভদ্রতায় খুশি হয়ে বললেন, "আমাদের পরিবারের নিয়ম, অতিথিকে জলখাবার পরিবেশন করার সময় বাড়ির মেয়েদের যে-কোনও একজনকে উপস্থিত থাকতে হবে। নিন, খেয়ে নিন।"

অর্জুন তাকাল। চাররকমের মিষ্টি, চিকেন প্যাটিস আর চা তার সামনে রাখা হয়েছে। সে আবার হাতজোড় করল, "একটু আগে পেট ভরে জলখাবার খেয়েছি। আমি আর খেতে পারব না।"

"একটুও খাবেন না?" ভদ্রমহিলা জিজ্ঞেস করলেন।

"না। জোর কোরো না। ভদ্রতা রাখতে শরীরকে কষ্ট দেওয়ার কোনও মানে হয় না। চা খেলেও কি অসুবিধে হবে?" সীতানাথবাবু তাকালেন।

চায়ের কাপ তুলে নিতে পরিচারিকা ট্রে নিয়ে ফিরে যেতে ভদ্রমহিলা নিচু গলায় বললেন, "বাবা, আমি আসতে পারি?"

"হ্যাঁ মা, এসো।"

ভদ্রমহিলা চোখের আড়ালে চলে যাওয়ার পর মুখ খুললেন সীতানাথবাবু, "এই কলকাতায় আমার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ কত তা কোনও ভ্যালুয়ার দিয়ে ইদানীং ঠিক করিয়ে নিইনি। বছর পাঁচেক আগের হিসেবে শুধু জমিজমা বাড়িঘর বিক্রি করলেই তিন কোটি টাকা পাব বলে জানতাম। এখন

pathagar.net

দ্বিগুণ না হলেও ওটা পাঁচ কোটি তো হবেই। এ ছাড়া ব্যাঙ্ক, শেয়ার, বিভিন্ন কোম্পানিতে ইনভেস্ট করা টাকার সঙ্গে সোনার গহনা তো আছেই। আমার স্ত্রী চলে গিয়েছেন আট বছর আগে। হঠাৎই বুকে ব্যথা, চিকিৎসা করানোর সময় পাইনি। আমার দুই ছেলে। বড় চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। বিলেত থেকেও ডিগ্রি নিয়ে এসেছিল। কিছুটা ওপর থেকে কাজ শুরু করায় দ্রুত আরও ওপরে উঠে যাচ্ছিল। বউমা ওরই স্ত্রী। আজ পনেরোদিন হয়ে গেল দেবাঞ্জনের কোনও হদিস নেই। একেবারে নিঃশব্দে সে আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছে। কোথায় গিয়েছে, কেন গিয়েছে তা আমরা জানি না। কেউ তাকে অপরহণ করলে এতদিনে টাকা চেয়ে ফোন আসত। আসেনি। এমন কোনও শত্রুর কথা আমরা জানি না, যে এই কাজ করতে পারে।"

সীতানাথবাবু একনাগাড়ে কথা বলায় একটু বেদম হয়েছিলেন। বড় শ্বাস নিলেন। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "পুলিশ কী বলছে?"

"না। পুলিশকে আমি এখনও জানাইনি। পুলিশকে জানালে সেটা খবরের কাগজের খবর হবে। বউমার ইচ্ছে নয় পাঁচজন এর মধ্যে কেলেঙ্কারির গন্ধ পাক।"

"আপনি কি আমাকে ডেকে এনেছেন আপনার ছেলেকে খুঁজে বের করার জন্যে?" অর্জুন সরাসরি জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ। পুলিশের দ্বারস্থ না হলে আমাকে কলকাতার ডিটেকটিভ সংস্থাগুলোর একটার শরণাপন্ন হতে হত। কিন্তু সে-ক্ষেত্রেও খবরটা চাপা থাকত কি না সন্দেহ। নিউ ইয়র্ক টাইম্‌সের খবরটার কথা আমার মনে ছিল। মেজর আমার দূর সম্পর্কের আত্মীয়। তাঁকে ফোন করে আপনার নাম্বার পেয়ে গেলাম। মনে হল এ-ব্যাপারে আপনার ওপর আমরা নির্ভর করতে পারি। অন্তত মেজর আমাকে সেই ভরসা দিয়েছেন।"

অর্জুন মুখ নামাল। কেউ হারিয়ে গেলে পুলিশকে না জানানো ঠিক নয়। পুলিশের নেটওয়ার্ক যে-কোনও প্রাইভেট এজেন্সির চেয়ে বহুগুণ বেশি, একজন মানুষ তো ধারেকাছে আসবে না। ওকে চুপ করে থাকতে দেখে সীতানাথবাবু বললেন, "ওকে খুঁজে বের করতে আপনি যা সহযোগিতা চাইবেন, পাবেন। যে-কোনও খরচ নির্দ্বিধায় করতে পারেন। এবং আপনার দক্ষিণার ব্যাপারে কোনও চিন্তা করবেন না।"

"আপনি বললেন আপনার দুই ছেলে। ছোট ছেলে কি এ-বাড়িতেই থাকেন?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

হুইলচেয়ারে সোজা হয়ে বসলেন সীতানাথবাবু। তারপর গম্ভীর মুখে মাথা নাড়লেন, "না। সে খুব স্বাধীনচেতা। একটু উদ্ধত স্বভাবের বলে আমার সঙ্গে বিরোধ লাগত। অথচ ওকে আমি দুন স্কুলে পড়িয়েছি। সেন্ট জেভিয়ার্স থেকে গ্র্যাজুয়েট হয়েছে। তার পরেই তার মধ্যে আমূল পরিবর্তন দেখতে পেলাম। তার আর পড়াশোনা করতে ভাল লাগছিল না। গাড়ি চালাতে ভালবাসে। কার র‍্যালি করে। ওই নিয়ে ভারতবর্ষে তো বটেই, সমস্ত পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছে। কয়েকবার অ্যাক্সিডেন্ট করেছে কিন্তু নেশা ছাড়েনি। পার্ক স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে আলাদা থাকে সে।"

"এসব করতে নিশ্চয়ই প্রচুর টাকার দরকার হয়, উনি কি ব্যবসা করেন?"

"না। ব্যাপারটা গর্ব করে বলার মতো নয়। আমার কাছ থেকে মোটা টাকা ও প্রতি মাসে নেয়। এ-ব্যাপারে ওর যুক্তি হল, আমার যা আছে তার অর্ধেক ও একদিন পাবে। সেটা যদি এখন থেকেই ইনস্টলমেন্টে পেতে শুরু করে তা হলে ওর রোজগার করার কোনও দরকার নেই। বলতে পারেন, ওর দাবির কাছে আমি আত্মসমর্পণ করেছি।"

"দেবাঞ্জনবাবুর নিরুদ্দেশ সম্পর্কে ওঁর কী বক্তব্য?"

"ওকে জানানো হয়নি। দেবাঞ্জনকে ও তাচ্ছিল্য করত, ওর ভালমানুষিকে ব্যঙ্গ করত। বউমা তাই ওকে এ-ব্যাপারে কিছুই জানাতে চাননি।"

"উনি কি বিবাহিত?"

"না। আমি চেয়েছিলাম ও সংসারী হোক, তা হলে মাথা স্থির হতে পারে। কিন্তু ও পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে যে, এ-ব্যাপারে ওর আগ্রহ নেই।"

"ওঁর ঠিকানা এবং টেলিফোন নাম্বার আমাকে দেবেন!"

সীতানাথবাবু মাথা নাড়লেন, "ওর কাছে গিয়ে আপনার কোনও লাভ হবে না। উলটে আপনি আমার লোক বলে ও অপমান করতে পারে।"

"কিছু মনে করবেন না, যে ছেলে আপনার সঙ্গে এইরকম ব্যবহার করেন তাকে আপনি নিয়মিত টাকা দিচ্ছেন কেন?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"আমার কোনও উপায় নেই। তা ছাড়া আমার বয়স হয়েছে, আমি মরে গেলে তো ও অর্ধেকটাই পাবে। কিন্তু ওকে নিয়ে আপনি এত চিন্তা করছেন কেন? আমার বড় ছেলের ব্যাপারে ওর কোনও ইন্টারেস্ট নেই।"

"আপনার বড় ছেলের সন্তান আছে?"

"না, নেই। এটাও আমার কাছে যন্ত্রণা।"

BANGLA EBOOK DOWNLOAD.COM
FREE BANGLA

"তা হলে আপনার বড় ছেলে না থাকলে পুরো সম্পত্তিটাই ছোট ছেলে পাবে।"

"নো। কখনওই নয়। বড় ছেলের শেয়ার বউমার নামে ট্রান্সফার হবে।"

অর্জুন বলল, "বেশ। আপাতত আমি আপনার বড় ছেলের একটি ছবি চাই। সাম্প্রতিক ছবি; এ ছাড়া, আপনি তো আছেনই। আপনার বউমা, এ-বাড়ির কাজের লোকজন, আপনার ছোট ছেলে এবং আপনার বড় ছেলে যে-অফিসে কাজের জন্যে যেতেন সেখানকার লোকজনের সঙ্গে কথা বলা খুব দরকার।"

"ছোট ছেলের কথা ভুলে যান। বাকিদের সঙ্গে কবে কথা বলতে চান?"

"আজই।"

"বেশ। আপনি বিকেলে চলে আসুন। আমি ওদের বলে রাখব।"

অর্জুন উঠে দাঁড়াল। সীতানাথবাবু হুইলচেয়ারের চাকা ঘোরালেন, "ট্রেনে যার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে তার বাড়িতে গিয়ে থাকাটা আমার পছন্দ হচ্ছে না। আপনি যদি ভাল কোনও হোটেলে থাকতে চান তা হলে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

"আপনাকে পরে বলব। আচ্ছা—।" অর্জুন দরজার কাছে এগিয়ে গেল। তারপর মনে পড়তেই ঘুরে দাঁড়াল, "একটা কথা, আপনাকে কবে থেকে হুইলচেয়ার ব্যবহার করতে হচ্ছে? কোনও দুর্ঘটনা কি ঘটেছিল?"

"এর সঙ্গে আমার ছেলের উধাও হওয়ার সম্পর্ক নেই। আপনাকে অনুরোধ, বিকেলে যখন ওদের প্রশ্ন করবেন তখন বাড়তি কথা বলবেন না। নমস্কার।" সীতানাথবাবু হুইলচেয়ার ভেতরের দরজার দিকে নিয়ে গেলেন।

অর্জুন যখন নীচের সিঁড়িতে নেমে এসেছিল তখন সেই লোকটি তাকে পেছন থেকে ডাকল যে তাকে ওপরে নিয়ে গিয়েছিল, "একটু অপেক্ষা করুন।"

অর্জুন দাঁড়াল। চারধার চুপচাপ। এই বিশাল বাড়ি, এত গাড়ি অথচ বাড়িতে সম্ভবত দু'জন মানুষ। তা ছাড়া আবার মনে হল, জায়গাটাকে কলকাতা বলে মনেই হয় না। লোকটি ফিরে এসে একটা খাম এগিয়ে দিল, "সাহেব এটা আপনাকে দিতে বললেন।" অর্জুন খামটা নিল। মুখে পিন লাগানো। কোনও কথা না বলে পকেটে রেখে দিল সে।

pathagar.net

সর্বেশ্বর বললেন, "তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নিন। জমিয়ে রান্না করেছি। খেয়েদেয়ে দু'জনে টিভিতে একটা দারুণ ক্রাইম থ্রিলার দেখব।"

অর্জুন বলল, "আমি তো স্নান সেরেই বেরিয়েছিলাম।"

"ও, তা হলে তো ভালই হল। চেঞ্জ করে আসুন, আমি খাবার বাড়ছি।"

লোকটিকে আবার ভাল লাগল অর্জুনের। খুবই আন্তরিক। কিন্তু দু-একদিনের মধ্যে অন্য কোথাও চলে যেতে হবে। এভাবে ওঁর অন্ন ধ্বংস করা ঠিক নয়। নিজের ঘরে গিয়ে পোশাক বদলে খামটা খুলল অর্জুন। ছ'টা পাঁচশো টাকার নোট। এত টাকা কেন? এর ছয়ভাগের একভাগও এখনও তার খরচ হয়নি।

খেতে বসে সর্বেশ্বর জিজ্ঞেস করলেন, "কাজ হল?"

"কী কাজ সেটা জানলাম। ধনী এবং নামী একটি পরিবারের প্রথম ছেলে হঠাৎ উধাও হয়ে গিয়েছে, তাকে খুঁজে বের করতে হবে।" অর্জুন খেতে খেতে বলল।

"পুলিশ খুঁজে পাচ্ছে না? অবশ্য না পাওয়াই স্বাভাবিক। একজন পুলিশ অফিসারের ওপর দিনে যত কাজের বোঝা চাপানো হয় তাতে কোনও কাজই তার পক্ষে মন দিয়ে করা সম্ভব নয়।" সর্বেশ্বর মাথা নাড়লেন।

"ওঁরা পুলিশকে ইনফর্ম করেননি।" অর্জুন জানাল।

"সে কী! কেন জানায়নি?"

"স্ক্যান্ডাল হবে, এই ভয়ে। আজ বিকেলে যাব সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে।"

"বাড়িতে আর কে আছে?"

"বাড়িতে কর্তা, পুত্রবধূ, কাজের লোকজন। ছোট ছেলে আলাদা ফ্ল্যাটে থাকে, পার্ক স্ট্রিটে। তার কাছেও যেতে হবে।"

"ছোট ছেলে ম্যারেড?"

"না। কার র‍্যালি নিয়ে ব্যস্ত থাকে।"

"হুম। ইন্টারেস্টিং। ধরা যাক বড় ছেলে আর ফিরে এল না, বাপ মারা গেল, তা হলে ওই সম্পত্তির মালিকানা কে পাবে? ছোট ছেলে?"

"বোধ হয় নয়! বড় ছেলের স্ত্রী রয়েছেন।"

"তা হলে আরও দুটো খুন ওই বাড়িতে হবে। লিখে দিতে পারি।"

"সে কী! এখনও তো কোনও খুন হয়নি!"

"নিশ্চিন্ত হওয়ার কোনও কারণ নেই। অবশ্য ডেডবডি না পাওয়া গেলে একটা আশা থাকে ফিরে আসার। কত বড়লোক? কয়েক লাখ?"

"কয়েক কোটি।"

pathagar.net

"অ্যাঁ! বাঙালি নিশ্চয়ই নয়।"

"হ্যাঁ, বাঙালি।"

"তা হলে বড় ছেলে খুন হয়ে গিয়েছে! তারপর স্বয়ং কর্তা দুর্ঘটনায় পড়ে মারা যাবেন। এ আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি।" সর্বেশ্বর বললেন।

"তৃতীয় খুন হবেন পুত্রবধূ এবং ছোট ছেলে পুরো সম্পত্তির মালিক হয়ে যাবে। আপনি নিশ্চয়ই এটাই বলতে চাইছেন! অতএব—।"

"নো ব্রাদার। এরকম জলের মতো সমাধান করলে এক সপ্তাহের বেশি ছবি চলবে না। ছোট ছেলেই অপরাধী এ কথা সবাই ভাববে অতএব তাকে অপরাধী করা চলবে না। এমন কাউকে অপরাধী করতে হবে যা দর্শকরা কল্পনাও করতে পারবে না। ধরুন, তৃতীয় খুনটা কার র‍্যালি করতে যাওয়া ছোট ছেলেই হয়ে গেল। এ বংশের সবাই খতম। তা হলে সম্পত্তি পাবে কে?" সর্বেশ্বর চোখ বন্ধ করলেন।

"বউমা।" অর্জুন হাসল, "একটু বাড়াবাড়ি কল্পনা হচ্ছে না?"

"জীবন কল্পনার থেকেও রহস্যময়। আচ্ছা, ধরা যাক, তৃতীয় নয়, দ্বিতীয় খুন হল ছোট ছেলে, তৃতীয় খুন কর্তা, চতুর্থ খুন বউমা। তা হলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াবে?"

"আপনি তিনটের বদলে চার-চারটে খুন করে ফেললেন।" অর্জুন খাওয়া শেষ করল, "ওই বংশে বাতি দেওয়ার জন্যে কেউ রইল না।"

"নো। একজন থেকে গেল।"

"কে?"

"যে হারিয়ে গিয়েছিল। যাকে খুন হয়ে গেছে বলে সবাই ভেবেছিল সেই উধাও হয়ে যাওয়া বড় ছেলে যদি ফিরে আসে এবং সম্পত্তির দখল পায় তা হলে দর্শকরা চমকে যাবে। গ্র্যান্ড। এখন, এই উধাও হয়ে যাওয়া লোকটি তো সন্ন্যাসী হয়ে যেতে পারে না, তা হলে ফিরবে কেন? এই ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে হবে, যাতে লজিকের কোনও ঘাটতি না থাকে।" সর্বেশ্বর বললেন।

"আপনার ক্রাইম থ্রিলার ছবি বোধ হয় শুরু হতে যাচ্ছে।" অর্জুন মনে করিয়ে দিল।

"দাঁড়ান ভাই। এই ব্যাপারটা আমার মাথায় ঢুকে গেছে। আচ্ছা, আজ যখন আপনি ইন্টারভিউ করতে যাবেন তখন আমি কি সঙ্গে যেতে পারি?" সর্বেশ্বর জিজ্ঞেস করলেন। তাঁকে খুব আগ্রহী দেখাচ্ছিল।

"বোধ হয় সেটা উচিত হবে না। মিস্টার রায়চৌধুরী পছন্দ করবেন না।"

pathagar.net

"অ!" একটু হতাশ হলেন ভদ্রলোক, "তা হলে আপনি ফিরে এলে ইন ডিটেল্‌স শুনতে হবে। কে জানে, এই কেস থেকে আমি ছবির সাবজেক্ট পেয়ে যেতে পারি। আরে, কথায় বলে না, যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই, পাইলেও পাইতে পার অমূল্য রতন। একেবারে খাঁটি কথা।"

অর্জুন নিজের ঘরে চলে এল। ওর গুরু অমল সোম বলতেন কখনও আগে থেকে কোনও সিদ্ধান্ত মনে নিয়ে তদন্তে নামবে না। চোখ কান খোলা রেখে যুক্তি দিয়ে বিচার করে তবেই সিদ্ধান্তে আসবে। এই সর্বেশ্বর বাগচির সঙ্গে কথা বললে অমলদার উপদেশ পালন করা সম্ভব হবে না। অর্জুনের এখনই মনে হচ্ছে, বড় ছেলে যদি কোনও বদমতলব হাসিল করার জন্যে উধাও হয়!

ঠিক চারটের সময় গেটের সামনে পৌঁছে অর্জুন দারোয়ান গোছের একজনকে দেখতে পেল। প্যাসেজে ঢোকার মুখে টুল পেতে বসে ছিল, অর্জুনকে ঢুকতে দেখে উঠে দাঁড়াল। অর্জুন বলল, "আমার এই সময় আসার কথা আছে।"

"আপনার নাম?"

"অর্জুন।"

লোকটি পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে চোখ বুলিয়ে বলল, "ঠিক আছে, যান।"

অর্জুন সোজা বাড়ির সামনে এগিয়ে আসতেই দ্বিতীয় লোকটি সামনে এসে দাঁড়াল, "নমস্কার। এ-বাড়িতে কুক, দারোয়ানদের ধরলে আমরা সাতজন কর্মচারী আছি। সাহেব বলেছেন, আপনাকে নীচের ঘরে বসাতে, এখানেই আমাদের সবাইকে আপনি পেয়ে যাবেন।"

"বেশ তো! আপনারা একসঙ্গে আসবেন না। একের পর এক আসুন।"

লোকটি ঘাড় নেড়ে নীচের তলার একটি ঘর খুলে দিল। পরিষ্কার ঘর, টেবিল এবং চেয়ার আছে মাঝখানে। প্রথম যে লোকটি ঘরে এল সে নিজেকে কুক বলে পরিচয় দিল। এ-বাড়িতে কাজ করছে বছর পাঁচেক।

"সাহেবের বড় ছেলে কীরকম মানুষ ছিলেন?"

"ভাল লোক, আমার রান্না খুব ভালবাসতেন।"

"ভালবাসতেন বলছ কেন? তোমার কি মনে হয় তিনি আর বেঁচে নেই?"

"না, না! উনি এখন বাড়িতে নেই তাই বলে ফেলেছি।"

"কোথায় যেতে পারেন উনি?"

pathagar.net

"তা আমি জানি না বাবু।"

"কখনও ওঁকে কারও সঙ্গে ঝগড়া করতে শুনেছ?"

"না বাবু! তা ছাড়া আমি থাকি কিচেনে, বাড়ির পেছনে। এদিকে আসি খাবার দেওয়ার সময়। তখন তো তেমন কিছু দেখিনি।"

"নেশা করতেন?"

"না বাবু, আমি দেখিনি।"

দ্বিতীয় লোকটি জামাকাপড় এবং ঘর পরিষ্কার রাখার দায়িত্বে আছে। সেও প্রায় একই কথা বলল। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "উনি খুব শৌখিন ছিলেন?"

"না বাবু। সকালে যে পোশাকে বেরোতেন সেটাই রাত পর্যন্ত পরে থাকতেন। তবে কোনও নেমন্তন্ন থাকলে আলাদা কথা। ওঁর জামায় কখনও কোনও সেন্ট পাইনি বাবু। তবে রুমাল দুটো করে দিতে হত।"

"কেন? খুব ঘামতেন বুঝি?"

লোকটি যেন লজ্জা পেল, "একটু নস্যি নিতেন। নস্যির রুমালটা বাঁ পকেটে রাখতেন, ডান পকেটে ভাল রুমাল।"

"তুমি ওঁকে নস্যি নিতে দেখেছ?"

"না সার। বাড়িতে উনি নস্যি নিতেন বলে মনে হয় না।"

"উনি কোথায় যেতে পারেন?"

"আমি তো জানি না বাবু।"

মোটামুটি একই প্রশ্ন এল, উত্তরগুলো আলাদা হচ্ছিল না। শুধু ড্রাইভার বলল, "বড়সাহেব মাঝে মাঝে আমাকে বলতেন নস্যি এনে দিতে।"

"তখন টাকা দিতেন তোমাকে?"

"না। মাসের প্রথমে আমার কাছে একশো টাকার নোট রেখে দিতেন। তাই ভাঙিয়ে ভাঙিয়ে আমি নস্যি কিনে দিতাম।"

"অফিস আর বাড়ি ছাড়া উনি কোথায় যেতেন?"

"কোথাও না। তবে মেমসাহেব সঙ্গে থাকলে কখনও টলি ক্লাব, কখনও ক্যালকাটা ক্লাবে যেতেন। সেটা সন্ধের পরে।"

"ওখানে গিয়ে ওঁরা খাওয়াদাওয়া করতেন?"

"আমি বলতে পারব না। আমাদের ওই অবধি যেতে দেওয়া হয় না। তবে সার, উনি যখন ফিরতেন তখন আমি কখনও মদের গন্ধ পাইনি। এটা আমি জোর দিয়ে বলতে পারি।"

যে লোকটা তাকে এই ঘরে এনেছিল তাকে ম্যানেজার বলা যায়। সব খবর

pathagar.net

রাখে। এ-বাড়ির কোথাও কোনও ত্রুটি আছে বলে সে মনে করে না। সাহেবের বড় ছেলে, যাকে সবাই বড়সাহেব বলে তিনি যে কেন না বলে চলে গেলেন তা লোকটি ভেবে পাচ্ছে না।

প্রশ্ন করতে করতে একসময় অর্জুনের মনে হল এদের কাছ থেকে বড় কোনও তথ্য পাওয়া যাবে না। সে সীতানাথ রায়চৌধুরীকে খবর পাঠাল। ওঁর সঙ্গে কথা বলতে চায় সে। লোকটি তাকে আবার দোতলার সেই ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে সীতানাথবাবু আগেই পৌঁছে গিয়েছিলেন। লোকটি দরজা থেকে চলে গেলে অর্জুন ভদ্রলোকের সামনের চেয়ারে গিয়ে বসল।

সীতানাথবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "ওদের প্রশ্ন করে কোনও ক্লু পেলেন?"

"না।"

"ও। তা আমার সঙ্গে তো সকালে অনেক কথা হয়ে গেছে। আর নতুন কী জানার আছে আপনার?"

"আছে। আপনার বড় ছেলে মানুষ হিসেবে কীরকম ছিলেন?"

"ভাল। ওয়েল বিহেভ্ড। শিক্ষিত, ভদ্র।"

"ছেলেবেলা থেকে ওর মধ্যে এমন কিছু আপনি লক্ষ করেছেন, যা একটু অস্বাভাবিক। যেমন, গুম হয়ে বসে থাকা, সারাদিন কারও সঙ্গে কথা না বলা। মানসিক অবসাদে কি মাঝে মাঝে ভুগতেন?"

"না। ছেলেবেলায় সেরকম কিছু দেখিনি। আর এখন, ছেলে বড় হয়ে নিজের জগতে চলে গেলে বাবার সঙ্গে একটা ব্যবধান তৈরি হয়। সবসময় কথাবার্তা না হওয়াই স্বাভাবিক। এখন তেমন কিছু হলে অবশ্য কানে আসত।"

"ওকে সরিয়ে দিলে কে বেশি উপকৃত হবেন?"

"কেউ না। ওর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বউমার সঙ্গে, অন্য সবকিছুর ওয়ারিশ বউমা। তাই আর কারও কিছু পাওয়ার কোনও সুযোগ নেই।"

"কথাটা ঠিক হল না। আপনার কথা অনুযায়ী ওঁকে সরিয়ে দিলে আপনার বউমাই সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবেন। তাই না?"

"এ আপনি কী বলছেন?" ফোঁস করে উঠলেন সীতানাথবাবু, "আমার পুত্রবধূর ওপর এমন কলঙ্ক আরোপ করতে আপনাকে আমি ডেকে আনিনি।"

"আপনি মিছিমিছি উত্তেজিত হচ্ছেন। আমি সম্ভাবনার কথা বলেছি, তাঁর কোনও দোষ অকারণে দেখতে চাইছি না। আচ্ছা, দেবার্জুনবাবু উধাও হওয়ায় টাকাপয়সা দাবি করে কেউ কোনও ফোন করেনি?"

"কেউ যে করেনি তা আগেই বলেছি।"

"আপনার ছেলে কোথায় যেতে পারেন? উনি গিয়েছেন বা চেনেন এমন জায়গার নাম বলুন।"

"শান্তিনিকেতনে আমার একটা বাড়ি আছে। সেখানে যে যায়নি তা আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি।" সীতানাথবাবু বললেন।

"কোনও ব্যাপারে কি তিনি আপনাদের ওপর বিরক্ত হয়েছিলেন?"

"না। আমি জানি না।"

"একটু ভেবে বলুন।"

"আমার ছেলেকে আমি যা জানি তা ভেবে বলতে হবে না। ওর কোনও নেশা ছিল না। চেঁচিয়ে কথা বলত না।"

"নেশা ছিল না এটা ঠিক কথা নয়।"

"তার মানে?"

"এই দেখুন, আপনি জানেন না, আপনার ছেলের একটা নেশা ছিল, খুবই অভদ্রজনোচিত নেশা। আমি বলতে চাইছি, কোনও পার্টি বা মিটিং-এ সবার সামনে সেই নেশা করা যায় না। সেক্ষেত্রে চুপচাপ টয়লেটে গিয়ে করে আসতে হয়। নেশাখোররা অবশ্য ওটাকে নেশা বলে পাত্তা দেয় না। আপনার ছেলে নস্যি নিতেন।" অর্জুন বলল।

"*স্ট্রেঞ্জ! আপনি জানলেন কী করে!*"

"এটা খুব সাধারণ ব্যাপার। আপনার না জানলেও চলে যায় তাই আপনি জানেননি। কিন্তু আমি বলতে চাইছি, খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে থেকেও আমরা সবসময় পরস্পরের অনেক কিছুই জানতে পারি না। আপনার বউমার সঙ্গে এবার কথা বলব!"

সীতানাথবাবু বললেন, "আমি থাকলে অসুবিধে হবে?"

"উনি সব কথা নাও বলতে পারেন। হাজার হোক আপনি ওঁর শ্বশুরমশাই।"

"বেশ। আপনি এখানে অপেক্ষা করুন," হুইলচেয়ার ঘুরিয়ে ভেতরের দরজা ঠেলে চোখের আড়ালে চলে গেলেন সীতানাথবাবু। অর্জুন লক্ষ করল ওঁর হুইলচেয়ার প্রায় নতুন। চাকাগুলি একটুও ক্ষয়ে যায়নি।

মিনিটখানেকের মধ্যে ভদ্রমহিলা ঘরে এলেন। আজও ওঁর শাড়িতে রং খুবই হালকা। সাদার ওপর হালকা হলুদ কলকা। অর্জুন উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করতে দেবাঞ্জনবাবুর স্ত্রী সেটা ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, "বসুন।"

দু'জনে বসার পর অর্জুন বলল, "আপনার শ্বশুরমশাই আমাকে যে দায়িত্ব

pathagar.net

ছিলেন সেটা আপনি নিশ্চয়ই জানেন। দেবাঞ্জনবাবুর চলে যাওয়ার ব্যাপারে বাড়ির সদস্যদের সঙ্গে আমি কথা বলেছি, কিন্তু কোনও সূত্র পাইনি। এখন আপনার সঙ্গে কথা বলছি। কিছু অপ্রিয় কথা হয়তো উঠতে পারে, কিছু মনে করবেন না।" অর্জুন একটু থামল। ভদ্রমহিলা গম্ভীরমুখে তার দিকে তাকিয়ে আছেন।

"আপনার শ্বশুরমশাই বলেছেন যে, দেবাঞ্জনবাবু কম কথা বলতেন, একটু গম্ভীর হয়ে থাকতেন। এর কারণ কিছু ছিল?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"আমি জানি না।"

"আপনার সঙ্গেও কম কথা বলতেন উনি?"

"হ্যাঁ। কারণ বেশি কথা বলা আমি নিজেও পছন্দ করি না।"

"বিয়ের পর এ-বাড়িতে এসে ওঁর ব্যবহারে অস্বাভাবিক কিছু দেখেছেন?"

"না। তবে উনি নিজের মতো থাকতে চাইতেন। এই বাড়ির কোনও সমস্যায় নিজেকে জড়াতেন না। জানি না এটাকে অস্বাভাবিক বলা উচিত কি না।"

"আপনাদের ছেলেমেয়ে!"

"নেই।"

"এ ব্যাপারে ওঁর কি খুব আক্ষেপ ছিল?"

"মুখে কখনও কিছু বলেননি।"

"মিসেস রায়চৌধুরী, আপনার স্বামী হঠাৎ কোথায় যেতে পারেন বলে আপনার সন্দেহ হয়? উনি নিজে গিয়েছেন, না কেউ ওঁকে যেতে বাধ্য করেছে?"

"খবর জানলে পনেরো দিন আগেই আমি শ্বশুরমশাইকে জানিয়ে দিতাম।"

"বেশ। আপনি আমাকে সাহায্য করুন। উনি যেতে পারেন এমন কয়েকটা জায়গার নাম বলুন, যেখানে খোঁজ নেওয়া যেতে পারে।"

"প্রথমেই শান্তিনিকেতনের নাম মনে পড়েছিল। সেখানে খোঁজ নেওয়া হয়েছে, উনি যাননি। তা ছাড়া অকারণে সব ছেড়েছুড়ে তিনি কেনই বা যাবেন! যারা সন্ন্যাসী হয়ে সংসার ছেড়ে চলে যায় তাদের আচার-আচরণের মধ্যে বোধ হয় কিছুটা নিরাসক্ত ভাব ফুটে ওঠে বলে শুনেছি। ওঁর মধ্যে সেসব দেখতে পাইনি। বরং চলে যাওয়ার আগের রাতে জানলা দিয়ে বাইরের লন, বাগান দেখতে দেখতে নিজের মনে বলেছিলেন, 'অপচয়। জায়গার কী বিপুল অপচয়।"

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, "তার মানে?"

"উনি বলেছিলেন, 'কলকাতার এমন জায়গায় যেখানে এক ফুট জমির জন্যে কত মারামারি সেখানে দ্যাখো কী বিপুল জমি অনাবশ্যক পড়ে আছে।'"

"কী করলে কাজে লাগবে জমিটা? জিজ্ঞেস করেছিলেন?"

"কত কী করা যায়! প্রতিবন্ধী শিশুগুলোকে জীবনে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্যে একটা আধুনিক ট্রেনিং সেন্টার খুললে কত উপকার হবে ভাবো তো!"

"বলেছিলাম, 'বাবাকে বলো, উনি যদি রাজি হন!'"

"উনি যদি রাজি হতেন তা হলে এগুলো এমন ফালতু পড়ে থাকত না। বংশমর্যাদা, আভিজাত্য ওঁর কাছে অনেক মূল্যবান। উনি কথাগুলো বলে বিছানায় চলে গিয়েছিলেন।"

"তারপর?" অর্জুন জিজ্ঞেস করেছিল।

"সকালে উঠে দেখলাম উনি নেই। ভাবলাম, মাঝে মাঝে এলগিন রোড থেকে বেরিয়ে ভিক্টোরিয়ার দিকে হাঁটতে যান। তাই হয়তো গিয়েছেন। কিন্তু বেলা বাড়লে ভুল ভাঙল।"

"প্রথমে খবরটা কাকে দিলেন?"

"শ্বশুরমশাইকে।"

"ওঁর প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল?"

"খুব স্বাভাবিক। ছেলের অমঙ্গলের আশঙ্কায় বাবার যেমন হয়।"

"ওঁর ভাইকে খবরটা জানাননি কেন?"

দেবাঞ্জনবাবুর স্ত্রী মুখ নামালেন, জবাব দিলেন না।

"ব্যাপারটা একটু দৃষ্টিকটু বলে কি মনে করেন না? দাদা মিসিং আর কথাটা ভাইকে জানানো হল না। কারণটা কী?"

"দুই ভাইয়ের মধ্যে সম্পর্ক খারাপ ছিল বা ভাল ছিল বলা যায় না। দু'জনের জগৎ ছিল আলাদা, কেউ কারও খবর রাখত না। সে-কারণেই হয়তো।"

"আপনার শ্বশুরমশাই বলেছেন যে, আপনি চাননি ওঁকে খবরটা দেওয়া হোক।" অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কেন?"

মিসেস রায়চৌধুরী সোজা হয়ে বসলেন, "আমরা চাইনি লোকে এই ঘটনা নিয়ে নানা গল্প তৈরি করুক। আমি তাই ওঁকে বলেছিলাম বেশি প্রচার না করতে। উনি হয়তো এই কথা শুনে ভেবেছিলেন ওঁর ছোট ছেলেকেও জানাতে নিষেধ করেছি।"

boiRboi.net

"মিসেস রায়চৌধুরী, এই যে আপনি চাইছেন না বাইরের লোক খবরটা জানুক, এর ফলে আপনার ক্ষতিও হতে পারে। জানাজানি হলে দেবাঞ্জনবাবুর পক্ষে বেশিদিন লুকিয়ে থাকা সম্ভব নাও হতে পারে।" অর্জুন বলল।

"আমি জানি না, আপনি শ্বশুরমশাইয়ের সঙ্গে কথা বলুন।"

"বেশ। একটা কথা, আজ সকাল থেকে এই সমস্যা শোনার পর আমি এখনও অন্ধকারে আছি। আপনি নিশ্চয়ই চাইছেন দেবাঞ্জনবাবুর হদিস পেতে?"

"নিশ্চয়ই।"

"তা হলে আপনি আমাকে সাহায্য করুন।"

"বলুন, কী সাহায্য চাইছেন।"

"উনি নস্যি নিতেন এ-খবরটা আপনার শ্বশুরমশাই জানতেন না। ওঁর যে এখানে পড়ে থাকা খালি জমিতে প্রতিবন্ধীদের জন্যে একটা ট্রেনিং স্কুল করার ইচ্ছে ছিল, তাও ওঁর অজানা ছিল। এ-কথা যে মানুষ চিন্তা করেন তিনি আত্মহত্যা করতে পারেন না।"

"আমারও তাই বিশ্বাস।"

"আপনার শ্বশুরমশাই প্রতিবন্ধী। আপনি কি বিয়ের পর থেকেই ওঁকে এই অবস্থায় দেখছেন?"

"হ্যাঁ।"

"কী হয়েছিল ওঁর?"

"শুনেছি কার অ্যাক্সিডেন্টে ওঁর দুই পা অসাড় হয়ে যায়।"

"অ্যাক্সিডেন্টটা কোথায়, কীভাবে হয়েছিল?"

"কলকাতার বাইরে। আমার শাশুড়ি সেই দুর্ঘটনায় মারা যান।"

"আচ্ছা। আপনার দেওর শুনলাম কার র‍্যালি করেন। সেখানে তো কার অ্যাক্সিডেন্ট যে-কোনও মুহূর্তে হতে পারে। আপনার শ্বশুরমশাইয়ের অনুমতি আছে?"

"অঞ্জন নিজে যেটা ভাল মনে করে তাই করে।"

"ওঁর টেলিফোন নাম্বার বলবেন?"

"আমার শ্বশুরমশাই চান না যে আপনি ওর সঙ্গে দেখা করুন।"

"দেখা করলে কোনও লাভ হবে এ-কথা যেমন জোর দিয়ে বলতে পারি না তেমনই হতেও পারে এমন সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।"

মিসেস রায়চৌধুরী একটু ভাবলেন। তারপর নিচু গলায় টেলিফোন নাম্বার বললেন।

pathagar.net

“পার্ক স্ট্রিটে ওঁর ফ্ল্যাটটা ঠিক কোথায়?”

“আমি কখনও যাইনি।”

“শেষ প্রশ্ন, এতবড় একটা ঘটনা আপনার জীবনে ঘটেছে, আপনার বাপের বাড়ির লোকজনকে জানিয়েছেন?”

“না।”

“কেন?”

“আমার মা-বাবা বেঁচে নেই। দাদারা আছেন। তাঁদের বিব্রত করতে চাইনি।”

“ও। ঠিক আছে, এখন এই পর্যন্ত। পরে দরকার হলে আপনার সঙ্গে কথা বলব।”

মিসেস রায়চৌধুরী উঠে দাঁড়ালেন। তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে অর্জুন বাইরে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াল।

সেই ম্যানেজার ধরনের লোকটি দাঁড়িয়ে ছিল। অর্জুন নীচে নামতেই বলল, “সাহেব বলেছেন আপনার কলকাতার ঠিকানাটা জেনে রাখতে। আর আপনার জন্যে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের ড্যাফোডিল হোটেল ঠিক হয়েছে।”

সর্বেশ্বরবাবু টিভিতে হিচককের ছবি দেখছিলেন। সন্ধের মুখে অর্জুন ফিরে আসতেই রিমোট টিপে ছবি বন্ধ করে জিজ্ঞেস করলেন, “এখন কী হল, বলুন।”

“আপনি ছবি দেখছিলেন, বন্ধ করলেন কেন?”

“এই ছবিটা আমি অন্তত দশবার দেখেছি। প্রতিটি ফেস মুখস্থ। কী প্রতিভা ছিল লোকটার। আহা! যাকগে, চা চলবে?”

“না।”

“বলুন, গল্পটা কতদূর এগোল!”

“এক ইঞ্চিও নয়। বাড়িসুদ্ধু লোককে প্রশ্ন করে কিছুই জানতে পারিনি।”

সর্বেশ্বরবাবু এমন কৌতূহলী হলেন যে, অর্জুনকে মোটামুটি যা শুনেছে তা জানাতে হল। সব শুনে ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, “কোনও লাভ হবে না।”

“কীসে?”

“অঞ্জনের কাছে গিয়ে। আরে মশাই, সকালেও শুনলাম, এখনও শুনছি, ছোটছেলেকে অপরাধী বানাবার একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ওঁরা করছেন।”

pathagar.net

না কখনওই তা কেউ করেননি।"

ওর বাকি কী থাকল! সে একটু উড়নচণ্ডী, আলাদা থাকে, বাপ বাধ্য হয়ে তাকে টাকা দেয়, মোটর র‍্যালিতে জীবনের ঝুঁকি নেয়। ওই বাড়ির ঐতিহ্যের সঙ্গে মানানসই নয়। ঠিক তো? ওর সঙ্গে দেখা করে কোনও লাভ হবে না বলেছেন বাড়ির কর্তা। এতে আপনার কৌতূহল বাড়বে বলে তিনি জানেন। বাড়ির বউমার শ্বশুরের অবাধ্য হওয়া উচিত নয়। তবু তিনি দেওরের ফোন নম্বর আপনাকে দিয়েছেন। আমি আপনাকে বলছি, শ্বশুরমশাই ওঁকে টেলিফোন নাম্বার দেওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্যেই এসব ইঙ্গিত ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু সমাধান যদি এত সহজে হবে তা হলে জলপাইগুড়ি থেকে আপনাকে ডেকে আনবেন কেন ওঁরা! আমি বিশ্বাস করি ছোটভাই কোনও অপরাধ করেনি, বড়ভাইয়ের অপহরণের সঙ্গে সে আদৌ জড়িত নয়। যাকে দর্শকের প্রথম সন্দেহ হয় সে কখনওই অপরাধী নয়।"

অর্জুন হাসছিল। সর্বেশ্বরবাবু কথা শেষ করে বললেন, "আপনি বোধ হয় একটু বেশি ভাবছেন। দেবাঞ্জনবাবুর হারিয়ে যাওয়ার পেছনে যে কোনও ক্রাইম আছে এমন তো নাও হতে পারে। উনি স্ব-ইচ্ছায় কোথাও চলে গিয়েছেন।"

"কেন?"

"সেই উত্তরটাই আমি খোঁজার চেষ্টা করছি।"

"উত্তর যেটা মাথায় আসে সেটা হল ভদ্রলোক বাবার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে না পেরে নিজে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। কলকাতার ঠিক মাঝখানে অতটা জমি এমনি খালি পড়ে আছে অথচ মানুষের উপকার হবে এমন কিছু তিনি ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও সেখানে করতে পারছেন না, এই অভিমানে চলে যেতেই পারেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, এক্ষেত্রে তিনি একা কেন যাবেন? স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। স্ত্রী যদি যেতে রাজি না হন তখন একা যাওয়ার কথা। সেক্ষেত্রে ওঁর স্ত্রী নিশ্চয়ই জানবেন কেন উনি বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন। কিন্তু উনি সেটা জানেন না। তাই তো?"

"হুঁ।"

"আপনি কি ছোটছেলের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন?"

"নিশ্চয়ই।"

"বেশ, ঠিক হয়ে গেছে। ফোন করে ঠিকানাটা জেনে নিতে পারেন।"

pathagar.net

অর্জুন তখনই ফোন করল না। নিজের ঘরে এসে কয়েক মিনিট চুপচাপ বসে রইল। সর্বেশ্বরবাবু বড্ড গায়ে পড়ে কথা বলছেন। সে কিছু ভেবে ওঠার আগেই নিজের ভাবনা ওর মাথায় ঢুকিয়ে দিচ্ছেন। অনিচ্ছা থাকতেও এর একটা প্রভাব তো পড়বেই। অথচ ভদ্রলোককে বলা যাচ্ছে না যে, এ ব্যাপারে আলোচনা করতে সে আগ্রহী নয়। এর একটিমাত্র কারণ, সে এই বাড়িতে আছে। এখানে না থেকে কোনও হোটেলে উঠলে ওঁর বিশ্লেষণ শুনতে হত না। আজ রাতে সম্ভব নয়, কাল ওঁকে বলতে হবে, মিস্টার রায়চৌধুরী চাইছেন তাকে হোটেলে রাখতে।

সকালে চা খেয়ে 'একটু বেড়িয়ে আসি' বলে বাড়ি থেকে বের হল অর্জুন। সিনেমা হলের পাশে টেলিফোন-বুথে ঢুকে ফোন করতে ওপাশে রিং বাজল। একসময় যখন মনে হল বাড়িতে কেউ নেই তখনই সাড়া পাওয়া গেল, "হ্যালো!"

অর্জুন বলল, "হ্যালো! আমি কি অঞ্জন রায়চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলতে পারি?"

"স্পিকিং।"

"ও। নমস্কার। আমার নাম অর্জুন! জলপাইগুড়ি থেকে গতকাল এসেছি। আমি আপনার সঙ্গে মিনিট পনেরো কথা বলতে চাই।"

"ও। জলপাইগুড়ি-দার্জিলিং র‍্যালি? আমি তো কনভেনারকে বলে দিয়েছি যে আমার পক্ষে জয়েন করা সম্ভব নয়। ঠিক আছে, আপনি আধঘণ্টা বাদে আমার এখানে আসতে পারেন।" অঞ্জন বলল।

"আপনার ঠিকানাটা?"

"টেলিফোন নাম্বার নিয়ে এসেছেন আর ঠিকানা আনেননি!" ঠিকানাটা খুব বিরক্ত গলায় বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল অঞ্জন।

সকালবেলায় যে মানুষ এই গলায় কথা বলে সে কখনওই ভাল থাকতে পারে না। অঞ্জন যে কোনও ব্যাপারে বেশ বিরক্ত, তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। সে যে মোটর র‍্যালির ব্যাপারে আসেনি এই ভুল ধরিয়ে দেওয়ার কোনও সুযোগ অর্জুন পায়নি। পেলে এবং তা সংশোধন করলে অঞ্জন হয়তো দেখাই করত না। এরকম লোকের সঙ্গে কথা বলতে হলে তাকে সতর্ক হতে হবে।

পাতাল রেলে চেপে পার্ক স্ট্রিটে নেমে হাঁটতে গিয়ে চমৎকার লাগল অর্জুনের। এখনও অফিস-টাইমের ভিড় শুরু না হওয়ায় পার্ক স্ট্রিট প্রায় ফাঁকাই

বলা যায়। সুন্দর দোকানগুলো এখনও খোলেনি। চারধার কী পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। বিদেশ বলে ভুল হয়।

লিফ্‌ট থেকে নেমে দরজার পাশে বেলের বোতামে চাপ দিতে ভেতরে যে বাজনা বাজছে তা বাইরে থেকেই বোঝা যায়। সেকেন্ড পাঁচেক বাদে দরজা খুলল যে যুবক তার পরনে বারমুডা, ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত, হাতে একটা বড় কফির মগ। সরাসরি জিজ্ঞেস করল, "জলপাইগুড়ি?"

অর্জুন মাথা নাড়তেই অঞ্জন বলল, "কাম ইন।"

ঘরে পা দিয়ে অর্জুন দেখল দেওয়ালজোড়া পোস্টার। পোস্টারে মোটর র‍্যালির ছবি। যেন ঘরের দেয়ালে দেয়ালে দুরন্ত গতিতে গাড়ি ছুটে যাচ্ছ।

অর্জুন ঘুরে দাঁড়াল, "প্রথমেই আপনার একটা ভুল ধারণা সংশোধন করতে চাই। আমি জলপাইগুড়ি থেকে এসেছি ঠিক, কিন্তু অন্য কারণে।"

অঞ্জনের চোখ ছোট হল, "কী ব্যাপার? আপনি র‍্যালির লোক নন?"

"না।" মাথা নাড়ল অর্জুন, "টেলিফোনে আপনাকে এটা বলার সুযোগ পাইনি।"

"দেন? এখানে এসেছেন কেন? কী দরকার?"

"আপনি আমাকে মিনিট পাঁচেক সময় দিন। সব কথা শোনার পর যদি আপনি কথা বলতে না চান তা হলে চলে যাব।"

অঞ্জন একটু ভাবল। তারপর বলল, "ওয়েল, বসুন। কী ব্যাপার?"

অর্জুন বসল কিন্তু অঞ্জন দাঁড়িয়ে রইল কফি হাতে নিয়ে।

"আমার নাম অর্জুন। সত্য সন্ধান করা আমার পেশা।"

"কী সন্ধান?"

"সত্য সন্ধান। যে-কোনও রহস্যের পেছনে একটি সত্য থাকে, আমি চেষ্টা করি সেটা খুঁজে বের করতে। আপনি কলকাতার মানুষ, আপনার পক্ষে আমাকে না জানাটা খুব স্বাভাবিক।" অর্জুন হেসে কথাগুলো বলল।

"আচ্ছা! আপনি একজন গোয়েন্দা?"

"শব্দটায় আমার প্রবল আপত্তি রয়েছে।"

"আমার কাছে কেন এসেছেন?"

"একটু বলি। আপনার বাবা শ্রীযুক্ত সীতানাথ রায়চৌধুরী আমাকে এখানে ডেকে এনে একটি দায়িত্ব দিয়েছেন। দায়িত্বটি হল, আপনার দাদা দেবাঞ্জনবাবুকে খুঁজে বের করতে হবে। তাঁকে গত পনেরো দিন হল পাওয়া যাচ্ছে না।"

pathagar.net
BANGLA EBOOK DOWNLOAD.COM
FREE BANGLA

"মাই গড! দাদাকে পাওয়া যাচ্ছে না মানে?" চেঁচিয়ে উঠল অঞ্জন।

"উনি স্রেফ হারিয়ে গিয়েছেন।"

"অসম্ভব। দাদা এমনি এমনি হারিয়ে যাওয়ার মানুষ নয়। কেউ কি দাদাকে ছেড়ে দেওয়ার বদলে টাকা চেয়েছে?"

"না। তা হলে তো কোনও সমস্যা থাকত না; আমি বলতে চাইছি সমস্যা অনেক কমে যেত। কোনও ফোন আসেনি?"

"আশ্চর্য! পনেরো দিন দাদাকে পাওয়া যাচ্ছে না, খবরটা আমাকে কেউ জানানোর প্রয়োজন মনে করল না?" অঞ্জনের চোয়াল শক্ত হল।

"আমার টেলিফোন নাম্বার কি বাবা আপনাকে দিয়েছেন?"

"না। আপনার বউদির কাছে জেনেছি।"

"আপনি বউদির সঙ্গেও কথা বলেছেন?"

"হ্যাঁ। ও-বাড়ির সবাইকে আমি প্রশ্ন করেছি।"

"আমাকে প্রশ্ন করে কোনও লাভ হবে না। বুঝতেই তো পারছেন, আমি ও-বাড়ির লোক নই। এই ফ্ল্যাটে আমি আমার মতো থাকি।"

"ঠিকই। আপনার বাবাও একই কথা বলেছেন। সত্যি কথা বলতে কী, তিনি চাননি আমি আপনার সঙ্গে দেখা করি।"

"তা হলে? নিজের সময় তো নষ্ট করছেনই, আমাকেও বিব্রত করছেন।"

"কিন্তু আপনি এখন ও-বাড়িতে থাকেন না ঠিকই, কিন্তু সম্পর্ক তো অস্বীকার করতে পারেন না। ওখানে কোনও খারাপ ঘটনা ঘটলে আপনারও ক্ষতি হবে।"

"কে বলেছে? কিস্সু হবে না।"

"হবে। অঞ্জনবাবু, প্রতি মাসের প্রথমে যে মোটা টাকা আপনি ওই বাড়ি থেকে পেয়ে থাকেন সেটা বন্ধ হয়ে গেলে আপনি সামলাতে পারবেন? পারবেন বলে মনে হয় না।"

"আপনি কী বলতে চাইছেন?"

"আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না। দেবাঞ্জনবাবুকে খুঁজে বের করতে আমি আপনার সাহায্য চাইছি।" অর্জুন বলল।

"আমি যে ও-বাড়ি থেকে মোটা টাকা পাই তা আপনি কী করে জানলেন?"

"সোর্স বলাটা অনৈতিক কাজ হবে।"

"এক মিনিট দাঁড়ান।" মোবাইল ফোনটা টেবিল থেকে তুলে অঞ্জন বোতাম টিপল, "কে? ও, বাবা কোথায়? ঠিক আছে, দাদাকে দাও। কী? দাদা বাড়িতে

pathagar.net

নেই? কোথায় গিয়েছে? তুমি অ্যাঁ অ্যাঁ করছ কেন? ঠিক করে কথা বলো। দাদা কোথায় গিয়েছে? তুমি জানো না? কে জানে? কেউ না? বাঃ কদ্দিন হল গিয়েছে?" উত্তরটা শুনে ফোনটা অফ করে টেবিলে রেখে দিল অঞ্জন। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, "কলকাতায় তো অনেক প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি রয়েছে। তাদের না ডেকে জলপাইগুড়ি থেকে আপনাকে ডেকে আনলেন বাবা। হোয়াই?"

"উনি চাননি আপনাদের পারিবারিক ব্যাপারটা বাইরের লোক জানুক। আমি যেহেতু অনেক দূরের মানুষ তাই আমার ওপর ভরসা করতে চেয়েছেন।"

"ঠিক আছে, বলুন, কী জানতে চান? প্রথমেই বলে রাখছি, দাদার সঙ্গে আমার কোনও যোগাযোগ ছিল না। আমাকে বলে যায়নি কোথায় গিয়েছে।"

"সেটা তো অনুমান করা যায়।"

"বেশ, বলুন—!"

"আপনি গাড়ি চালাতে ভালবাসেন?"

"আরে! এর সঙ্গে দাদার হারিয়ে যাওয়ার কী সম্পর্ক?"

"সরাসরি নেই অবশ্য। যাকগে, আপনি মোটর র‍্যালি করেন, গাড়ি পালটান শখ মতো, অর্থাৎ ঝুঁকি নিয়ে জীবনটাকে উপভোগ করতে চান, তাই তো?"

"হ্যাঁ। আমি ভিজে ন্যাতার মতো জীবনযাপনের কথা ভাবতে পারি না।"

"আপনি পড়াশোনা মাঝপথে বন্ধ করলেন কেন?"

"ভাল লাগছিল না। তাই।"

"আপনি যে গাড়ি ভালবাসলেন, গাড়ি নিয়ে দৌড়োচ্ছেন, আপনার বাবা এতে আপত্তি করলেন না কেন?" অর্জুন সরাসরি জিজ্ঞেস করল।

"সেটা বাবাকে জিজ্ঞেস করুন।"

"করেছিলাম। তিনি প্রশ্নটার জবাব দেননি।"

"কেন?"

"মনে হয় আপনার সব জেদ উনি মেনে নেন।"

"জেদ মেনে নেওয়ার মানুষ আর যিনিই হোন সীতানাথ রায়চৌধুরী নন। মেনে না নিতে পারলে তিনি খুশি হতেন।" অঞ্জন হাসল, "বাবা চাইতেন আমি যেন গাড়ির ধারেকাছে না যাই। ড্রাইভারদের ওপর হুকুম ছিল আমাকে ড্রাইভিং না শেখানোর। অথচ মাত্র ষোলো বছর বয়সে ওটা শিখে ফেলেছিলাম। কলকাতার রাস্তায় গাড়ি চালিয়েছি লাইসেন্স ছাড়াই। আঠারো বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করার ধৈর্য আমার ছিল না।"

pathagar.net

"উনি কেন গাড়ি চালাতে দেওয়ার বিরুদ্ধে ছিলেন?"

অঞ্জন প্রশ্নটা শুনে মাথা নিচু করল কয়েক সেকেন্ড, তারপর বলল, "আপনার এইসব প্রশ্নের সঙ্গে দাদার কোনও সম্পর্ক নেই।"

"শুধু আপনার ক্ষেত্রেই, না আপনার দাদাকেও উনি গাড়ি চালাতে দেননি?"

"দু'জনকেই। দাদা মেনে নিয়েছিল কারণ প্রতিবাদ করার সাহস দাদার ছিল না। বাবার খুব বাধ্য ছেলে ছিল ও।"

"সীতানাথবাবু মোটর দুর্ঘটনায় পঙ্গু হয়ে গেছেন। আপনার মা সেই দুর্ঘটনায় মারা যান। আপনি ছিলেন সেই গাড়িতে?"

ঠোঁট টিপে নীরবে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল অঞ্জন।

"তখন আপনার কত বয়স?"

"বছর পাঁচেক।" অঞ্জন বলল, "দাদা বাড়িতে ছিল।"

"ঘটনাটা ঘটেছিল কলকাতার বাইরে। তাই তো?"

"বাব্বা। একদিনেই এত জেনে গিয়েছেন! হ্যাঁ, দুর্গাপুরের কাছে।"

"কী করে ঘটেছিল দুর্ঘটনাটা?"

"স্পষ্ট মনে নেই। আমি পেছনের সিটে ছিলাম।"

"কিছুই মনে নেই?"

"ঝাপসা! অস্পষ্ট। বাবার সঙ্গে মায়ের ঝগড়া চলছিল। গাড়ি চালাতে চালাতে বাবা ইংরেজিতে বেশি কথা বলছিলেন, যা সেই বয়সে আমি ভাল বুঝতে পারিনি। হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দ হল। আমি ছিটকে সামনের সিটে ধাক্কা খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলাম। অ্যাম্বাসাডার গাড়ির পেছনের সিটের লেগস্পেস বেশি থাকে বলে বড় চোট লাগেনি।"

"তারপর?"

"ঘোর কাটতে মুখ তুলে দেখি বাবা-মা কেউ সামনের সিটে নেই। ব্যস, এইটুকু আমার মনে আছে।" অঞ্জন বলল।

"পরে কিছু শুনেছিলেন?"

"শুনেছিলাম বাবার গাড়ি রাস্তার পাশের একটা বড় গাছে গিয়ে ধাক্কা মেরেছিল। মা যে দরজার পাশে বসেছিলেন সেটা ভেঙে তুবড়ে যায়। মায়ের মৃত শরীর গাছের পাশে ছিটকে পড়েছিল।"

"আপনার চোট কীরকম ছিল?"

"সামান্য কেটে গিয়েছিল, এমন কিছু নয়।"

pathagar.net

"আপনার বাবার দুটো পা ওই দুর্ঘটনায় অবশ হয়ে গিয়েছিল, তাই তো?"

"হ্যাঁ। তবে—।"

"তবে কী? বলুন!"

"দুর্ঘটনা যখন ঘটেছিল তখন বাবার পা ঠিক ছিল।"

"কীরকম?"

"আপনাকে বলেছি আমি 'ওদের দু'জনকেই সিটে দেখতে পাইনি। পরে স্টিয়ারিংয়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে থাকতে দেখা যায়। ওঁর মাথা ফেটে রক্ত বেরোচ্ছিল আর জ্ঞান ছিল না। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর জানা গেল বাবার পা অবশ হয়ে গিয়েছে।"

"আপনি বলতে চাইছেন দুর্ঘটনা ঘটার সময় আপনার বাবা-মা দু'জনেই গাড়ি থেকে ছিটকে বাইরে চলে যান। তারপর আবার উঠে এসে নিজের সিটে বসেন এবং তখনই তিনি অজ্ঞান হয়ে যান আর পা অবশ হয়।"

"এটা সম্ভব নয়। হলে উনি মাটিতেই পড়ে থাকতেন।"

"ঠিক। আপনার দেখায় কোনও ভুল হয়নি তো?"

"আগেই বলেছি, পাঁচ বছর বয়সের স্মৃতি খুব ঝাপসা। অনেক ভেবেছি আমি। পরে, অনেক পরে, যখন আমার বারো বছর বয়স তখন বাবাকে প্রশ্নটা করি। উনি এমনভাবে আমাকে দেখেন, যেন আমি অন্য গ্রহের প্রাণী। তারপর বলেন, উনি কখনওই গাড়ির বাইরে যাননি। দুর্ঘটনা ঘটার সময় ওঁর কোনও জ্ঞান ছিল না। আমি সম্পূর্ণ মনগড়া কল্পনা করেছি। হয়তো মাকে সামনের সিটে না দেখে ভেবে নিয়েছি বাবাও নেই। পরে মজা করে বলেছেন, পাঁচ বছর বয়সে যদি আমি ও-কথা পুলিশকে বলতাম তা হলে সমস্যা তৈরি হত। আমি যেন কল্পনাটা আর না করি।"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "ঠিক বলেছেন উনি।"

"আর একটু বড় হয়ে আমি যখন গাড়ি চালাতে চাইলাম উনি মুখের ওপর বলে দিলেন একশোটা ড্রাইভার রাখার ক্ষমতা যাদের আছে তাদের গাড়ি চালাবার কোনও প্রয়োজন নেই। ওঁর সঙ্গে তর্ক করা নিষেধ ছিল। আমার মনে হল উনি ভয় পাচ্ছেন আমিও অ্যাক্সিডেন্ট করব বলে। নিজের অভিজ্ঞতা ওঁকে ভীত করেছে। তখন আমি ট্রেনিং স্কুলে বয়স বাড়িয়ে ভর্তি হয়ে ড্রাইভিং শিখে নিলাম। ওই ট্রেনিং স্কুলে ভর্তি না হলে আমার হয়তো গাড়ির মেকানিজম সম্পর্কে আগ্রহ জন্মাত না। শুধু এজন্যে আমি বাবার কাছে কৃতজ্ঞ।" অর্জুন হাসল।

"উনি নিশ্চয়ই সেটা জানতে পারতেন—"

"হ্যাঁ। এখন আমি লাইসেন্স পেয়ে গেছি।"

"উনি তো হুইলচেয়ারে বসে বাড়িতেই এ-ঘর, ও-ঘর করতেন, বাইরের খবর পেতেন কী করে? কে তাঁকে খবরগুলো দিত?"

"জানি না! কিন্তু ওঁর কাছে সবকিছু স্পষ্ট ছিল। আবার লাইসেন্স পাওয়ার পর জানতে পেরে খুব খেপে গিয়েছিলেন। আমি অনেক সহ্য করার পর বলেছিলাম, 'আর যাই হোক তোমার মতো অ্যাক্সিডেন্ট করব না!' উনি অবাক হয়ে বলেছিলেন, 'আমার মতো মানে?' বলেছিলাম, 'মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করতে করতে গাড়ি চালিয়েছিলে তুমি, তাই স্টিয়ারিংয়ের ওপর কন্ট্রোল ছিল না। ওই অ্যাক্সিডেন্টটা সতর্ক থাকলেই এড়ানো যেত, মা-ও মারা যেত না।'"

অঞ্জন উঠে দাঁড়াল। কোমর বেঁকিয়ে বারতিনেক ব্যায়ামের ভঙ্গি করল। তারপর বলে, "লক্ষ করলাম ওই কথাগুলো শোনার পর থেকে বাবা একদম পালটে গেলেন। আমার সঙ্গে আর কোনও ঝামেলা করতেন না। একসময় যখন আমি ও-বাড়ি ছেড়ে চলে এলাম তখন আপত্তি করেননি। টাকাপয়সা যা চেয়েছি কারণ জানতে না চেয়ে দিয়ে যাচ্ছেন। সো নাইস অব হিম!"

"আপনি আলাদা থাকছেন কেন?"

"কারণ এখানে আমি স্বাধীনভাবে থাকতে পারছি। কিন্তু এসব কথা জেনে আপনার কী লাভ হচ্ছে বলুন তো? আপনি তো দাদার ব্যাপারে কিছুই জানতে পারছেন না।"

"হ্যাঁ। ওঁর প্রসঙ্গে আসছি। আপনার বাবা কি কোনও উইল করেছেন?"

"আমি জানি না।"

"দেখুন, বোঝাই যাচ্ছে, আপনার থেকে দেবাঞ্জনবাবু সীতানাথ রায়চৌধুরীর বেশি প্রিয়পাত্র ছিলেন। আপনার এই যে বিক্ষোভ, ওঁর অমতে গাড়ি চালানো শেখা, পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়া, ও-বাড়ি থেকে চলে এসেও প্রতি মাসে ভাল টাকা নেওয়া, এসব আপনার দাদা কী চোখে দেখতেন?"

"আমি জানি না। জানবার প্রয়োজন বোধ করিনি।"

"কেন?"

"কেন জানব? আমি তো দাদার কাছ থেকে কিছু নিচ্ছি না। ও-বাড়ির সম্পত্তিতে আমার যে শেয়ার আছে তা থেকে অতি সামান্য আগাম হিসেবে নিচ্ছি। তা ছাড়া বাবা তো দিতে আপত্তি করছেন না। উনি যদি দিতে রাজি না হতেন তা হলে আমার কিছুই করার ছিল না।" অঞ্জন বলল।

Pathagar.net

"ঠিকই। সীতানাথবাবু মারা না যাওয়া পর্যন্ত আপনাকে চুপচাপ থাকতে হত।"

"মানে?" চোখ ছোট করল অঞ্জন।

"উনি যদ্দিন জীবিত আছেন তদ্দিন আপনার কোনও শেয়ার আইনের চোখে গ্রাহ্য হবে না। ধরা যাক, জীবদ্দশায় সীতানাথবাবু তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি উড়িয়ে দিয়ে গেলেন। তা হলে আপনার ভাগ্যে কী থাকবে? আপনার অধিকার জন্মাবে উনি মারা যাওয়ার পর।" অর্জুন বলল।

"আমি এতশত ভাবিনি।"

"কেন ভাববেন? আপনি যা চাইছেন তাই পাচ্ছেন।"

"মোটেই না। আমি কখনওই বাড়াবাড়ি রকমের কিছু চাইনি।"

"আমি জানি না। চাইলে দিতে রাজি হতেন কি না তাও ঠিক নেই। কিন্তু এই যে উনি আপনাকে দিয়ে যাচ্ছেন এতে আপনার দাদার সম্মতি ছিল?"

"আমাকে কখনও কিছু বলেনি দাদা।"

"কখনও না? মনে করে দেখুন।"

"না। দাদা আমার সঙ্গে কথা বলত না। মনে হয় বাবার সেরকম নির্দেশ ছিল।"

"দেবাঞ্জনবাবুর ইচ্ছে হয়েছিল আপনাদের বাড়ির পাশে অকারণে পড়ে থাকা জমিতে প্রতিবন্ধীদের জন্যে কিছু করবেন। টাকা চাইলে আপনার বাবা রাজি হতেন?"

"অসম্ভব!"

"আপনি যদি ওঁর হয়ে বাবার কাছে টাকা চাইতেন?"

"আশ্চর্য! আমি কেন চাইতে যাব?"

"ঠিক কথা। অঞ্জন, আপনি যদি খবর পান দেবাঞ্জনবাবুর সঙ্গে আপনার বাবার বিরোধ লেগেছিল আপনাকে এইভাবে টাকা দেওয়া নিয়ে, তা হলে কি অবাক হবেন?"

অর্জুনের প্রশ্ন শুনে হো হো করে হেসে উঠল অঞ্জন। হাসি থামলে বলল, "দেবাঞ্জন রায়চৌধুরী আপাদমস্তক ভদ্রলোক, যার কোনও মেরুদণ্ড নেই। অন্তত বাবার সামনে নেই। বাবা যদি বলেন আমার জুতোটাকে তুমি মুখে করে নিয়ে যাও, দাদা তাই যাবে। আমি বউদিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তিনি কেন দাদাকে সংশোধন করছেন না! বউদি কোনও জবাব দেননি। অথচ বউদি দাদার চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমতী।"

Pathagar.net

"কী করে বুঝলেন?"

"কেন? আপনার সঙ্গে তো উনি কথা বলেছেন, মনে হয়নি কিছু?"

"হ্যাঁ, হয়েছে।" অর্জুন মাথা নাড়ল, "দেবাঞ্জনবাবু কোথায় যেতে পারেন?"

"আমি কী করে বলব?" অঞ্জন একটা সিগারেট ধরাল, "বাবার উচিত ছিল খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া, পুলিশকে জানানো। কীসের এত ঢাকাঢাকি? পারিবারিক সম্মানের থেকে বাড়ির ছেলের জীবনের দাম কম হয়ে গেল? বউদি কেন মেনে নিলেন? কোনও স্বার্থ না থাকলে কেউ মেনে নেয় না অর্জুনবাবু।"

"কী স্বার্থ?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "সীতানাথবাবু জানেন পুরো সম্পত্তিটা তাঁর দখলে। অতএব তাঁর কোনও স্বার্থ নেই। বরং যে ছেলে তাঁর অনুগামী সে না থাকলে তাঁর ক্ষতি। তবে হ্যাঁ, আপনার বউদির স্বার্থ থাকতে পারে। ওঁর স্বামীর অবর্তমানে অংশটা উনি পাবেন। কিন্তু স্বামীর পাওয়া তো ওঁরই পাওয়া। অতএব আপনার কথা মেনে নিতে পারছি না।" অর্জুন বলল।

"একটা কথা আপনাকে বলা হয়নি। আমার যখন টাকার দরকার হয় তখন আমি বাবার ম্যানেজারকে ফোন করি। মাসখানেক আগে ফোন করেছিলাম, শুনলাম সে মোবাইলের সুইচ অফ করে রেখেছে। বাবার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করল না। তাই বউদিকে করলাম। উনি খুব অবাক হয়ে বললেন, 'বাবা, আজ কোনদিকে সূর্য উঠেছে! কী ব্যাপার, বলো?'"

"'বাবার ম্যানেজারকে বলো আমায় ফোন করতে।' বলেছিলাম। কারণ টাকাপয়সা নিয়ে আমি বউদির সঙ্গে কথা বলতে চাইনি।"

"ও আজ ছুটি নিয়েছে। কেন? টাকার দরকার।"

"হ্যাঁ।"

"তুমি বেশ আছ। চাইলেই পেয়ে যাও।"

"চাইতে জানতে হয়।"

"তোমার দাদা অবশ্য অন্য কথা বলে।"

"কী কথা?"

"বলে, যে দুর্ঘটনায় তোমার মা মারা গিয়েছিলেন সেই দুর্ঘটনায় তুমিও মারা যেতে পারতে। যাওনি বলে তোমার বাবা একটু দুর্বল হয়ে আছেন।"

"কেন?"

"বাঃ, গাড়িটা তো তিনিই চালাচ্ছিলেন!"

"ও, এই ব্যাপার।"

pathagar.net

"আচ্ছা অঞ্জন, দুর্ঘটনাটা ঠিক কোথায় ঘটেছিল?"

"বাবাকে জিজ্ঞেস কোরো, বলে দেবেন। আমি তো তখন একেবারে বাচ্চা। এতদিন বাদে এসব নিয়ে কথাবার্তা কেন?"

"এমনি। তোমার বাবাকে প্রশ্ন করা মানে তাঁকে মনে করিয়ে দেওয়া। এতবড় একটা আঘাত উনি ভুলে থাকার চেষ্টা করছেন, কেন আর খুঁচিয়ে ঘা করি!" বউদি বললেন।

"দুর্গাপুর থানায় গিয়ে সাল তারিখ বললেই জেনে যাবে। যাক গে, তুমি ম্যানেজারকে বলবে কাল সকালেই যেন আমায় ফোন করে।"

অঞ্জন কথা শেষ করল।

অর্জুন আচমকা প্রশ্ন করল, "যেখানে দুর্ঘটনা ঘটেছিল সেখানে আপনি আবার কখনও গিয়েছেন? মানে, ওই যেভাবে বললেন, থানায় জিজ্ঞেস করে, যাওয়ার ইচ্ছে হয়নি?"

"একটা কৌতূহল তো হয়ই। গিয়েছিলাম। দুর্গাপুরে যাওয়ার রাস্তাঘাট এখন অনেক পালটে গেলেও দুর্ঘটনার জায়গাটা বদলায়নি। রাস্তা চওড়া হয়েছে কিন্তু সেটা উলটোদিকে।"

"জায়গাটা কোথায়?"

"ওই যে বললাম, থানায় গেলে জানা যাবে।"

"আমাকে বলতেও অসুবিধে হচ্ছে?"

অঞ্জন উঠল। একটা কাগজ আর কলম নিয়ে আসতে আসতে বলল, "আপনি ঠিক কী চাইছেন আমি বুঝতে পারছি না। দাদাকে সন্ধান করতে বাবা আপনাকে ডেকে এনেছেন। সেটা না করে এত বছর আগে ঘটে যাওয়া একটা দুর্ঘটনার স্পট জেনে আপনার কী লাভ হবে!" অঞ্জন সামনে এসে রাস্তার ম্যাপ আঁকল কাগজে। তারপর জায়গাটা বুঝিয়ে দিল।

কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে রেখে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "একটা ফোন করতে পারি?"

"শিওর।"

মোবাইলে নয়, সরকারি টেলিফোনের বোতাম টিপল অর্জুন। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে গলা পেয়ে বলল, "আমি অর্জুন। গুডমর্নিং।"

"ও হ্যাঁ। গুডমর্নিং। আপনি কতটা এগোলেন?"

"একদিনে যতটা সম্ভব এগোনো যায়।"

"ও। আপনার হোটেল ঠিক করে রেখেছে। রয়েড স্ট্রিটে হোটেল

pathagar.net

মিস্টিরিয়া। ওখানে গিয়ে রিসেপশনে নাম বললেই ওরা চাবি দিয়ে দেবে।"

"ঠিক আছে। তবে আমি বোধ হয় আজ হোটেলে যেতে পারব না।"

"কিন্তু আমি চাইছি আপনি হোটেলে থাকুন। আপনাকে আমি আমার কাজে ডেকে নিয়ে এসেছি।" সীতানাথ রায়চৌধুরী দৃঢ় গলায় বললেন।

"আমি নিশ্চয়ই যাব। তবে আজ নয়। আচ্ছা, নমস্কার।" টেলিফোন রেখে দিল অর্জুন, "অনেক ধন্যবাদ অঞ্জনবাবু। একটা কথা মনে রাখবেন, আপনার দাদার অন্তর্ধানের ব্যাপারে প্রথম সন্দেহ কিন্তু আপনার ওপরই হবে। তাই যতটা সম্ভব সাবধানে থাকার চেষ্টা করবেন। আর কিছুদিন র‍্যালি বন্ধ রাখুন।"

"কেন? র‍্যালির সঙ্গে দাদার অন্তর্ধানের কী সম্পর্ক?"

"আপনার দাদা আপাতত নেই। আপনার যদি কিছু হয়ে যায় তা হলে আপনাদের এই বিপুল সম্পত্তির মালিকানা কার হাতে যাবে?"

"যদ্দিন বাবা বেঁচে আছেন তিনিই মালিক।"

"তাঁর পরে?"

"বউদি ছাড়া তো আর কেউ নেই।" হাসল অঞ্জন, "ও, বুঝতে পেরেছি। আমরা দু' ভাই পৃথিবীতে না থাকলে বাবা তাঁর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির পুরোটা বউদির জন্যে রেখে যাবেন বলে মনে হয় না। ওঁকে ওঁর অংশ দিয়ে বাকিটা রামকৃষ্ণ মিশনকে দান করে যাবেন।"

"টাকাপয়সার কথা বলছি না। বিষয়সম্পত্তি যা তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে আরও বাড়িয়েছেন তা বিক্রি বা দান করার অধিকার ওঁর আছে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠবেই। আচ্ছা, এলাম!" অর্জুন বেরিয়ে এল।

সর্বেশ্বর বাগচি বললেন, "কী মশাই, কোথায় গিয়েছিলেন?"

অর্জুন হাসল, "এই তো। আপনার এখানে বেশ ভাল ছিলাম কিন্তু সেটা আর কপালে নেই।"

"কেন? কোনও অসুবিধে হচ্ছে?"

"না। একদম নয়। কিন্তু এখনই আমাকে দুর্গাপুরে যেতে হবে।"

"দুর্গাপুর? দেবাঞ্জনবাবু সেখানে গিয়েছেন নাকি?"

"না। উনি কোথায় গিয়েছেন এখনও জানি না।"

"একটা খবর আপনাকে দিচ্ছি, লোকটা এখনও বেঁচে আছে।"

"কীভাবে জানতে পারলেন?"

"প্রথমে গত পনেরো দিনের সবক'টা বড় কাগজ পড়ে ফেললাম। ওইরকম

pathagar.net

বয়সের কোনও অজ্ঞাত ব্যক্তির মৃতদেহের কথা কাগজে পাইনি। লালবাজারে আমার একজন বন্ধু আছেন। তাঁকে ফোন করেছিলাম। তিনি খোঁজ নিয়ে জানালেন মাত্র একটা ডেডবডিকে আইডেন্টিফাই করা যায়নি যার বয়স ষাটের ওপর।”

“বাঃ। আপনি দারুণ কাজ করেছেন। এখন বলুন, দুর্গাপুরে যাওয়ার ট্রেন কোথায়? শিয়ালদা না হাওড়ায়?” অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

“হাওড়া দিয়ে যাওয়াই সুবিধে।” সর্বেশ্বর উঠে টেলিগ্রাফ পত্রিকার সাপ্লিমেন্টারি খুললেন, “দুর্গাপুর-দুর্গাপুর-হ্যাঁ, একটা দশে ট্রেন আছে। পৌঁছতে পৌঁছতে বিকেল চারটে হয়ে যাবে। সন্ধে ছ'টা নাগাদ অনেক ট্রেন আছে কলকাতায় ফেরার।” সর্বেশ্বর হিসেব করে খবর দিলেন।

“তা হলে চটপট স্নান সেরে নেওয়া যাক।” অর্জুন এগোল।

স্নান সেরে তৈরি হয়ে অর্জুন ঠিক করল বাইরে খেয়ে নেবে। দুপুরের খাওয়া সর্বেশ্বরবাবুর ওপর চাপাতে আর ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু সে অবাক হয়ে দেখল ইতিমধ্যে ভদ্রলোক টেবিলে খাবার সাজিয়েছেন। ভাত আর মাংসের ঝোল। শুধু তাই নয়, ওঁর পোশাক দেখে বোঝা যাচ্ছে উনিও বেরোনোর জন্যে তৈরি।

কোনও আপত্তি ভদ্রলোক শুনতে চাইলেন না। অগত্যা অর্জুনকে রাজি হতে হল। সর্বেশ্বর বললেন, “বাড়িতে অলস হয়ে বসে আছি, আপনার সঙ্গে গেলে একটু থ্রিল হবে, বুঝলেন। কোনও ডিসটার্ব করব না, আপনি আপনার কাজ করবেন। কোনও প্রশ্ন করব না আমি।”

সত্যি, ভদ্রলোক কোনও প্রশ্ন করলেন না। কেন যাচ্ছে অর্জুন, তাও শুনতে চাইলেন না। অর্জুন মৃদু আপত্তি করলেও টিকিট কেটে বললেন, “যাওয়ারটা আমি কাটছি, ফেরারটা আপনি করবেন। শোধ হয়ে যাবে।”

ট্রেনে উঠে জিজ্ঞেস করলেন, “দুর্গাপুরে এর আগে গিয়েছেন?”

অর্জুন মাথা নেড়ে না বলল।

“বিধান রায় মশাই ওই শহরটির কথা ভেবেছিলেন। ইস্পাত নগরী। গরমের সময় প্রচণ্ড গরম হয়।” বলে একটা ইংরেজি ক্রাইম থ্রিলার বের করে পড়তে লাগলেন।

স্টেশনে নেমে দেখা গেল দিনের আলো এখনও বেশ কিছুটা সময় থাকবে। একটা মোটোরিকশা নিয়ে গন্তব্যস্থল জানিয়ে দিল অর্জুন। ফাঁকা রাস্তা দিয়ে অটো ছুটল। কাগজটা ভাল করে দেখল সে। ঠিক কোন জায়গায় দুর্ঘটনা

pathagar.net

ঘটেছিল তা অঞ্জন চিহ্নিত করেনি। এলাকাটা বলে দিয়েছে। শহরে ঢোকার মুখে রাস্তাটা মোটামুটি চওড়া। প্রায় মাইল তিনেক যাওয়ার পর অটোওয়ালা বলল, "আমরা এসে গেছি, কোথায় যাবেন?"

অর্জুন দেখল রাস্তার দু'ধারে ছাড়া ছাড়া বাড়ি, কিছু দোকান রয়েছে। ওরা অটোটাকে ছেড়ে দিয়ে একটা দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। মুদির দোকান, নাম ভ্যারাইটি স্টোর্স, স্থাপিত উনিশশো সত্তর।

দোকানে ভিড় নেই। এক প্রৌঢ় বসে ছিলেন। অর্জুন এগিয়ে গেল, "নমস্কার।"

"নমস্কার।"

"আপনার দোকানের বয়স তিরিশ বছর হয়ে গেল?"

"তা তো হবেই। পঁচিশ বছর বয়সে দোকানটা খুলেছিলাম। এই অঞ্চলে তখন আমার দোকান ছাড়া আর কিছু ছিল না। রাস্তাটাও ছিল ছোট।"

"পরে রাস্তা চওড়া হয়েছে?"

"হ্যাঁ। ওদিকটা বাড়িয়েছে। কী ব্যাপার বলুন তো?"

"আমরা কলকাতা থেকে আসছি। এই রাস্তায় কোনও অ্যাক্সিডেন্টের কথা কি আপনার মনে আছে? এক ভদ্রমহিলা মারা গিয়েছিলেন।"

"এ তো অদ্ভুত কথা! এই রাস্তায় রোজ একটা না একটা অ্যাক্সিডেন্টে মানুষ মারা যাচ্ছে। কোনটার কথা বলছেন?"

"অনেকদিন আগের কথা। প্রায় কুড়ি বছর হয়ে গেল।"

"ও! ভদ্রমহিলা সামনে বসে ছিলেন। স্পট ডেড। পেছনে একটা বাচ্চা ছিল? অ্যাম্বাসাডার গাড়ি। তাই তো?"

"ঠিক। আপনার দেখছি মনে আছে।"

"ছিল না। কয়েকদিন আগে একজন প্রশ্ন করার মনে পড়ে গেল।" ভদ্রলোক বললেন, "এই আপনি যেমন প্রশ্ন করছেন তিনিও তাই করেছেন।"

"কে ভদ্রলোক?"

"জানি না। তিরিশের ওপর বয়স, চশমা পরা। তাঁকেও যা বলেছি আপনাকেও তাই বলি। অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল, ওই যে নতুন বাড়িটা দেখছেন, ওর সামনে। আমি তখন দোকানে বসে। প্রচণ্ড জোরে গাড়িটা আসছিল। হঠাৎ জোরে ব্রেক কষল। এবং ঘুরে গিয়ে গাছটাতে ধাক্কা মারল।"

"তারপর?"

"ব্যাপারটা এমন আচমকা হল যে, কয়েক মুহূর্ত হতভম্ব হয়ে বসে ছিলাম।

pathagar.net

এরই মধ্যে দেখলাম ড্রাইভার ভদ্রলোক দরজা খুলে কোনওমতে গাড়ি থেকে নামলেন। বনেট ধরে ধরে উলটোদিকে গেলেন। আমি ততক্ষণে দোকান থেকে নেমে পড়েছি। এত বছর আগে এখানে লোকজন কম ছিল, বাড়িঘর দোকানও হাতে গোনা। তবু দু'-তিনজনের সঙ্গে আমিও ছুটে গেলাম। ইতিমধ্যে ওই ভদ্রলোক আবার ফিরে গেছেন নিজের জায়গায়। স্টিয়ারিংয়ে মাথা রেখে অজ্ঞান হয়ে গেছেন।"

"তারপর?"

"কপালগুণে সেই সময় একটা পুলিশের ভ্যান ফিরে যাচ্ছিল দুর্গাপুর থানায়। তারাই ওদের নিয়ে গেল হাসপাতালে। আর হ্যাঁ, গাড়ির পেছনে একটা বাচ্চা ছেলে বসেছিল। তার কিছু হয়নি।"

"আপনার ঠিক মনে আছে যে ড্রাইভার ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নেমে ওপাশে গিয়েছিলেন এবং তখনই ফিরে এসেছিলেন?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ। কিন্তু ওঁর শরীরে শক্তি ছিল না।"

"উনি কেন গিয়েছিলেন ওপাশে?"

"বোধ হয় ভদ্রমহিলাকে দেখতে। তিনি তো দরজা খুলে মাটিতে পড়ে গিয়েছিলেন। স্পট ডেড। তাই দেখে ভদ্রলোক আর সামলাতে পারেননি।"

"উনি ঠিক কী করেছিলেন আপনি দেখেননি, তাই তো!"

"সম্ভব ছিল না। গাড়ির ওপাশে কী ঘটেছে তা এপাশ থেকে বলব কী করে? তা ছাড়া এসব কুড়ি বছর আগের ঘটনা। ভুলেই গিয়েছিলাম। আপনার আগে যিনি এসেছিলেন তিনি এমন নাছোড়বান্দা যে বাধ্য করালেন ঘটনাটা মনে করাতে।"

"উনি কেন জানতে চাইছেন জিজ্ঞেস করেননি?"

"করেছিলাম। বললেন, ভদ্রমহিলার মৃত্যুর পরে ওঁর বিষয়সম্পত্তি নিয়ে কিছু ঝামেলা হওয়ায় সঠিক ঘটনা জানতে এসেছেন।"

"উনি নিজের নাম বলেছিলেন?"

"না। এই যেমন আপনার নাম আমি জানি না, জিজ্ঞেসও করিনি, ওঁকেও করার কথা মনে আসেনি। তবে উনি দুর্গাপুরের লোক নন।"

"সেটা কী করে মনে হল?"

"হোটেলের কথা জিজ্ঞেস করলেন। আমি হোটেল সানরাইজের নাম বলে দিলাম। উনি চলে গেলেন।"

pathagar.net

"আপনি ছাড়া আর কেউ এখানে আছেন যিনি ওই অ্যাক্সিডেন্টটা দেখেছিলেন?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"না। এখন এখানে কেউ নেই। তবে হ্যাঁ, ওই রাস্তার মোড়ে হলুদ দোতলা বাড়িটা দেখছেন, ওটা কর্মকারবাবুর। রিটায়ার্ড পুলিশ অফিসার। যেসময় দুর্ঘটনা ঘটেছিল সেসময় উনি দুর্গাপুর থানায় ছিলেন, উনি যদি কিছু মনে করতে পারেন গিয়ে দেখুন।"

"যে ভদ্রলোক আপনার কাছে খোঁজখবর করতে এসেছিলেন তিনি ঠিক কবে এসেছিলেন?" অর্জুন শেষ প্রশ্ন করল।

"এই তো, তরশু।"

অর্জুন নমস্কার জানাতে ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার বলুন তো? অতীতের ওই দুর্ঘটনা নিয়ে হঠাৎ আপনারা ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন কেন?"

"বুঝতেই পারছেন, বিষয়সম্পত্তির ব্যাপার।"

"দেখবেন ভাই, আমাকে আবার জড়াবেন না।"

অর্জুন এগিয়ে গেল সর্বেশ্বরবাবুর কাছে। ভদ্রলোক তখন থেকে ঠায় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কাছে যেতেই বললেন, "কী করবেন? হোটেল খুঁজতে যাবেন, না পুলিশ অফিসারের বাড়িতে ঢুঁ মারবেন?"

অর্জুন অবাক হয়ে বলল, "এতদূরে দাঁড়িয়েও আপনি সব শুনতে পেরেছেন?"

"আপনারা তো বেশ জোরে জোরেই কথা বলছিলেন।"

অর্জুন একটু ভাবল, "এতদূরে যখন এসেছি তখন মিস্টার কর্মকারের সঙ্গে দেখা করে যাওয়াই উচিত। চলুন।"

"আমি বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে আছি, আপনি কথা বলে আসুন।"

অর্জুন হেসে ফেলল, "তা হলে আপনি কোনও কথাই শুনতে পাবেন না। এক যাত্রায় আর আলাদা হওয়া কেন, আপনিও চলুন।"

"থ্যাঙ্কু। থ্যাঙ্কু। স্বীকার করছি, আপনার বেশ ব্যক্তিত্ব আছে।"

সেটা কীরকমের, তা জিজ্ঞেস করল না অর্জুন।

মিনিট সাতেকের মধ্যে বাড়িটায় পৌঁছে গেল ওরা। এই বাড়ির বয়স দশ-বারোর বেশি নয়। সর্বেশ্বর চাপা গলায় বললেন, "ভদ্রলোকের ভাল রোজগার ছিল।"

অর্জুন বলল, "মনে হচ্ছে।"

pathagar.net

"যদি নিজের পয়সায় বাড়িটা করে থাকেন তা হলে মাইনের টাকায় করেননি।"

অর্জুন এগিয়ে গিয়ে একটি কাজের লোককে বলল কর্মকারবাবুকে খবর দিতে। তিনি নেমে এলেন মিনিটখানেকের মধ্যে। বিশাল চেহারা। লুঙ্গি এবং পাঞ্জাবি পরে আছেন। মুখটা পাঁচ নম্বর ফুটবলের মতো গোল।

"কী ব্যাপার?"

"আমি অর্জুন আর ইনি সর্বেশ্বর বাগচি। বিখ্যাত ফিল্ম ডিরেক্টর। আপনি কি মিস্টার কর্মকার?"

"হ্যাঁ। ফিল্ম ডিরেক্টর আমার বাড়িতে। কী আশ্চর্য! আসুন, আসুন।" ভদ্রলোক ওদের নিয়ে গেলেন বসার ঘরে। সুন্দর সোফায় বসতে বলে নিজে বসে পড়লেন আলাদা, "এককালে আমিও অ্যাকটিং করতাম, ছাত্র বয়সে। তখন ভাল ভাল নাটক হত। কেদার রায়, বঙ্গে বর্গী, আহা—।"

"আপনি তো সম্প্রতি অবসর নিয়েছেন।"

"নিতে বাধ্য হয়েছি। সবাই বলে আপনার যা শরীর স্বাস্থ্য, আরও দশ বছর চালিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু চাকরির আয়ু তো বয়সের ওপর। কিছু করার নেই। হ্যাঁ, বলুন, আমার কাছে কী দরকার?"

"বলছি, আপনি তো একসময় দুর্গাপুর থানায় ছিলেন।"

"ছিলাম সেভেন্টি নাইন থেকে এইট্টি ওয়ান পর্যন্ত। কেন?"

"ভালই হল। ওই সময়ে আপনার এই বাড়ি থেকে কিছুটা এগোলে একটা অ্যাম্বাসাডার গাড়ি ভয়ংকর অ্যাক্সিডেন্ট করে। ঘটনাটা মনে আছে?"

"তখন আমার এই বাড়ি কোথায়? এখানে ফাঁকা মাঠ।"

"ও। কিন্তু অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছিল।"

"আরে মশাই তখন রোজ এত অ্যাক্সিডেন্ট হত যে, মনে রাখার উপায়ও নেই।"

"তা হয়তো। তবে ওই অ্যাক্সিডেন্টে যিনি গাড়ি চালাচ্ছিলেন তিনি এবং পেছনের সিটে বসা ওঁর ছেলে বেঁচে গিয়েছিলেন। কিন্তু ওঁর স্ত্রী ঘটনাস্থলেই মারা যান। ওঁরা কলকাতার খুব অভিজাত পরিবার।"

কর্মকারের চোখ ছোট হয়ে এল। নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "এত দিন পরে?"

স্রেফ আন্দাজে ঢিল ছুড়ল অর্জুন, "আপনি তো কেসটা তদন্ত করেছিলেন?"

pathagar.net

"হ্যাঁ।"

হঠাৎ সর্বেশ্বরবাবু বলে বসলেন, "ওটা সত্যি অ্যাক্সিডেন্ট, পরিকল্পিত খুন নয়, এ-কথা নিশ্চয়ই আপনি আপনার রিপোর্টে লিখেছিলেন?"

"আরে! খুন হতে যাবে কেন? ব্রেক ফেল করে গাড়ির স্টিয়ারিং হঠাৎ ঘুরে যাওয়ায় গাছের গায়ে ধাক্কা মেরেছিল।" কর্মকার জানালেন।

"গাড়ির ব্রেক ফেল করেছিল কিনা তা মেকানিককে দিয়ে পরীক্ষা করিয়েছিলেন নিশ্চয়ই।" সর্বেশ্বরবাবু বললেন।

"আপনারা কী বলতে চাইছেন? এত বছর পুলিশে চাকরি করেছি, কোনটা খুন আর কোনটা নয় তা বুঝতে পারব না? মিস্টার রায়চৌধুরী যদি তাঁর স্ত্রীকে খুন করতে চাইতেন তা হলে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ওইভাবে অ্যাক্সিডেন্ট করতেন না। ওতে তো ওঁর নিজেরও মরে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কোনও ঝুঁকি না নিয়ে খুন করার হাজারটা রাস্তা আছে।" কর্মকার খুব বিরক্ত হয়ে কথাগুলো বললেন।

"আপনার দেখছি এত বছর পরেও নামটা মনে আছে।" অর্জুন বলল।

"আপনারা কারা? কোত্থেকে এসেছেন?"

"আপাতত কলকাতা থেকে।"

"কেন?"

"সত্য সন্ধান করতে। আমরা থানায় যেতাম। যে অফিসার ওই কেসটির দায়িত্বে ছিলেন তাঁর সঙ্গে কথা বলা দরকার ছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রে আপনাকে এখানেই পেয়ে গেলাম।"

কর্মকারের মুখ ভয়ংকর হয়ে উঠল, "সত্য সন্ধান! মানে প্রাইভেট গোয়েন্দা। নো, প্রাইভেট গোয়েন্দার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। আপনারা যেতে পারেন।"

"আপনি ভদ্র ব্যবহার করছেন না।" অর্জুন হাসল।

"কী? আমাকে ভদ্রতা শেখাবে সেদিনের ছোকরা?"

"আপনি আমাকে সেদিনের ছোকরা মনে করলেও হয়তো আপনার এস পি সাহেব তা করবেন না। ডি আই জি, আই জি সাহেবরা তো নিশ্চয়ই নয়।" অর্জুন হাসল, "আপনি একটু শান্ত হয়ে কথা বলুন। তা হলেই হবে।"

"কী জানতে চান?"

"ওই দুর্ঘটনার ফলে মিস্টার রায়চৌধুরী চিরদিনের জন্যে পঙ্গু হয়ে গিয়েছেন। হুইলচেয়ার ছাড়া ওঁর চলে না, জানেন?"

Pathagar.net

"জানি।"

"ওঁকে নিশ্চয়ই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল?"

"হ্যাঁ। ওঁর জ্ঞান ছিল না।"

"কোন ডাক্তার ওঁর চিকিৎসা করেছিলেন?"

"আশ্চর্য! সরকারি হাসপাতালের কোনও ডাক্তার কি চিরকাল একই জায়গায় থাকে? আজ এখানে, কাল সেখানে। তিনি এখন কোথায় তা কী করে বলব!"

"মারা না গেলে তাঁকে খুঁজে বের করা অসম্ভব ব্যাপার নয়।"

"কেন? তাঁকে কী দরকার?"

"উনি কী রিপোর্ট দিয়েছিলেন? মিস্টার রায়চৌধুরী অ্যাক্সিডেন্টের সময়ই পঙ্গু হয়ে গিয়েছিলেন, না পরে ওঁর শরীর অবশ হয়ে যায়?"

"অন দি স্পট। স্টিয়ারিংয়ে বসা অবস্থায় ওটা হয়।"

"আপনার ঠিক মনে আছে?"

"হ্যাঁ।"

"যখন অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল তখন আপনি কোথায় ছিলেন?"

"কোথায় আর থাকব! থানায় ছিলাম। আমাদের একটা ভ্যান স্পট থেকে ওঁদের তুলে হাসপাতালে নিয়ে যায়। খবর পেয়ে আমি সেখানে গিয়েছিলাম।"

"তা হলে আপনি জানলেন কী করে স্টিয়ারিংয়ে বসা অবস্থায় ওঁর শরীর অবশ হয়ে গিয়েছিল? আপনি নিশ্চয়ই কারও কাছে শুনেছেন!"

"দেখুন ভাই, পুলিশ শুধু চোখে দেখে না, কানেও দেখতে পায়। যে ভ্যানটি ওদের তুলে এনেছিল তার ড্রাইভার, কনস্টেবল বলেছে ওরা মিস্টার রায়চৌধুরীকে তাঁর গাড়ির স্টিয়ারিংয়ে মাথা নামিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতে দেখেছে। জ্ঞান হওয়ার পর উনি আর উঠে দাঁড়াতে পারেননি।"

[illegible] হাসলেন, "উনি নিশ্চয়ই অ্যাক্সিডেন্টের পর গাড়ি থেকে নেমে আবার [illegible]?"

"যেখানে দুর্ঘটনা ঘটেছিল সেখানকার সাক্ষীরাও কি একই কথা [illegible]?"

"[illegible] কোথায় এখানে। লোকজনই ছিল না।"

[illegible] বললেন, "কেন? মুদির দোকান, ভ্যারাইটি স্টোর্স তখন ছিল না?"

"[illegible] বন্ধ ছিল। কেন? ও কি অন্য কথা বলেছে আপনাদের?"

pathagar.net

অর্জুন হাসল। তারপর একটু অবাক হয়ে যাওয়া কর্মকারকে নমস্কার করে বেরিয়ে এল সর্বেশ্বরের সঙ্গে। এখন রাত হয়ে গেছে। কিন্তু অটো পেতে অসুবিধে হল না। হোটেল সানরাইজের নাম বলতে অটোওয়ালা ঘাড় নাড়ল।

সর্বেশ্বর বললেন, "আজ মনে হচ্ছে দুর্গাপুরেই রাত্রিবাস করতে হবে।"

"কেন? এখন ট্রেন নেই?" অর্জুন অটোয় বসে অন্যমনস্ক গলায় জিজ্ঞেস করল।

"এখন নেই। এর পরে যেটা আছে সেটা ভোরবেলায় কলকাতায় পৌঁছবে।"

"আপনি কী করবেন?"

"কোনও অল্টারনেটিভ নেই। কেস যেরকম জমে উঠেছে তাতে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবতে পারি না। অবশ্য আপনার যদি কোনও অসুবিধে না হয়—!"

"আমার অসুবিধে হচ্ছে না।"

"ধন্যবাদ। অর্জুনবাবু, এই কর্মকার লোকটা সন্দেহজনক।"

অর্জুন কোনও কথা বলল না। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে সর্বেশ্বর আর মুখ খুললেন না।

সানরাইজ খুব বড় হোটেল নয় কিন্তু পরিচ্ছন্ন, আদবকায়দা মেনে চলে। অটো ছেড়ে রিসেপশনে পৌঁছে অর্জুন জানতে চাইল ঘর পাওয়া যাবে কি না! মহিলা ঘাড় নাড়লেন। অর্জুন বলল, "দুটো সিঙ্গল রুম দিন।"

পাশে দাঁড়ানো সর্বেশ্বর মিনমিনে গলায় বললেন, "দুটো—!"

"হ্যাঁ। একা থাকলে দেখবেন আরও ভাল ভাবতে পারবেন।"

"তাই বুঝি! ধন্যবাদ, ধন্যবাদ।" খুশি হলেন ভদ্রলোক।

ঘরে ঢুকে মিনিট পাঁচেক শুয়ে থাকল অর্জুন। ভ্যারাইটি স্টোর্সের লোকটির কথা ঠিক হলে এ ব্যাপারে যার আগ্রহ হয়েছে সে এখানে, এই হোটেলে এসেছিল তরশু। অর্থাৎ তিনদিন হয়ে গিয়েছে। এ-ব্যাপারে আগ্রহ হতে পারে অঞ্জনের, কিন্তু সে আসেনি। নিরুদ্দিষ্ট দেবাঞ্জনবাবু যদি এখানে শেষপর্যন্ত এসে থাকেন তা হলে তিনি কোথায় ছিলেন এতদিন? তিনদিন ধরে এই হোটেলে কি আছেন? দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তর রিসেপশনে গেলেই পাওয়া যাবে, যদি তিনি নাম ভাঁড়িয়ে না থাকেন। কিন্তু যে ব্যাপারটা সবচেয়ে অস্বস্তিতে ফেলছে তা হল অ্যাক্সিডেন্টের খবর নিচ্ছে দেখে পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত অফিসার কর্মকারবাবু এত রেগে গেলেন কেন? দুর্ঘটনার সময় ভ্যারাইটি

Pathagar.net

স্টোর্স খোলা ছিল অথচ উনি বলে দিলেন দোকানের ঝাঁপ বন্ধ ছিল। দোকানদারের কথা অনুযায়ী সীতানাথ রায়চৌধুরী দুর্ঘটনার পর গাড়ি থেকে নেমে স্ত্রীকে দেখে আবার তাঁর সিটে ফিরে গিয়েছিলেন। প্রায় একই কথা বলেছে অঞ্জন। ওই সময় সে সামনের সিটে বাবা এবং মাকে দেখতে পায়নি। এই দুটো তথ্য এক হলে ব্যাপারটা বেশ জটিল হয়ে পড়ছে। অর্জুনের মনে পড়ল সে যখন সীতানাথ রায়চৌধুরীকে প্রশ্ন করেছিল তিনি কবে থেকে হুইলচেয়ার ব্যবহার করছেন তখন তিনি খুব অসন্তুষ্ট হয়ে বলেছিলেন বাড়তি কথা না বলতে।

স্নান সেরে কিছুটা ঠান্ডা হয়ে অর্জুন নীচে নামল। রিসেপশনে এখন একটি ছেলে দাঁড়িয়ে। অর্জুন এগিয়ে যেতে ছেলেটি হাসল, "গুড ইভ্‌নিং সার। বলুন, আমি কী করতে পারি?"

"মিস্টার দেবাঞ্জন রায়চৌধুরী নামের এক ভদ্রলোকের এই হোটেলে ওঠার কথা। উনি কি এখনও আছেন?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে কম্পিউটারের বোতাম টিপল। কিছুক্ষণ বাদে মাথা নাড়ল সে, "সরি সার। এই নামে কোনও বুকিং নেই।"

"তিনদিন আগে উনি এসেছিলেন, হয়তো এখন চলে গিয়েছেন।"

ছেলেটি আবার ঝুঁকে পড়ল। এবং জানাল তিনদিন আগেও ওই নামে কেউ এই হোটেলে আসেনি। অর্জুন এইরকমটাই ভেবেছিল। সে হাসল, "তিনদিন আগে এই হোটেলে ক'জন চেক-ইন করেছিলেন?"

"তিনটি গ্রুপ এসেছে। চারজন কাপ্‌ল আর দু'জন সিঙ্গল ভদ্রলোক।"

"এই দু'জনের নাম কী?"

"কিছু মনে করবেন না, আপনি কেন জানতে চাইছেন তা যদি স্পষ্ট করে বলেন। আমাদের ক্লায়েন্টদের স্বার্থে এটা জানা দরকার।" ছেলেটি জানাল।

"আমার ক্লায়েন্টের ছেলে বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছেন। খবর পেয়েছি তিনি এই হোটেলে উঠেছেন। ওঁদের পরিবারের শান্তির জন্যেই আমাকে এখানে আসতে হয়েছে।"

"আই সি। হ্যাঁ, প্রথমজনের নাম জগদীশ চৌবে। উনি এসেছেন পটনা থেকে। বয়স বাহান্ন। ব্যবসায়ী। দ্বিতীয়জনের নাম অরিত্র ঘোষদস্তিদার। এসেছেন বর্ধমান থেকে। ইনিও ব্যবসায়ী। বয়স চৌত্রিশ।"

"এঁরা দু'জনেই হোটেলে আছেন?"

"না। মিস্টার চৌবে চলে গিয়েছেন গতকাল আর মিস্টার ঘোষদস্তিদার চেকআউট করেছেন আধঘণ্টা আগে।"

"উনি কোথায় যাচ্ছেন কিছু বলেছেন?"

"না।"

"এ-সময় কলকাতায় ফিরে যাওয়ার কোনও ট্রেন আছে?"

ছেলেটি ঘড়ি দেখল, "না। মাঝরাতে অনেক ট্রেন আছে।"

"কলকাতা বা বর্ধমানের বাস তো রাত দশটা পর্যন্ত পাওয়া যায়।"

ছেলেটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে অর্জুন বেরিয়ে এল। অরিত্র ঘোষদস্তিদার যদি দেবাঞ্জনবাবু হন তা হলে তিনি কেন বর্ধমানে যাবেন? তবু একটা অটো ভাড়া করে সে চলে এল বাস টার্মিনাসে। হালকা ভিড়। এই সময় তার খেয়াল হল। একটা কাঁচা কাজ করে ফেলেছে। সীতানাথবাবুর কাছ থেকে ওঁর ছেলের ছবি চেয়ে নিয়ে আসা উচিত ছিল। এখন এই বাস টার্মিনাসে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষদের মধ্যে কোনজন দেবাঞ্জন তা শুধু চেহারার বর্ণনা শুনে চেনা প্রায় অসম্ভব।

কোন বাস কখন কোথায় যাবে মাইকে ঘোষণা করা হচ্ছিল। অর্জুন সেই অফিসে গিয়ে অনুরোধ করল তার হয়ে একটা ঘোষণা করতে। কাগজে লিখে দিতে ঘোষক সেটা পড়তেই মাইকে শব্দগুলো ছড়াল, "মিস্টার অরিত্র ঘোষদস্তিদার, আপনি যদি এখানে থাকেন তা হলে এখনই অফিসে চলে আসুন। সানরাইজ হোটেলে আপনি একটা দামি জিনিস ফেলে এসেছেন!"

তিন-চারবার ঘোষণা করা সত্ত্বেও কারও দেখা পাওয়া গেল না। নিজের ওপর খুব রাগ হচ্ছিল অর্জুনের। এরকম মূর্খের মতো কাজ সে কী করে করল? ছবিটা তার আনা উচিত ছিল।

হোটেলে যখন সে ফিরে এল তখন রাত সাড়ে দশটা। একটা ব্যাপারে সে কিছুটা খুশি, কারণ এখানে এসে অনুমান করা যাচ্ছে দেবাঞ্জনবাবু বেঁচে আছেন। তাকে দেখতে পেয়ে রিসেপশনের ছেলেটি ডাকল, "সার!"

অর্জুন এগোল। ছেলেটি বলল, "আমি জানি না খবরটা আপনার কোনও কাজে লাগবে কি না। আপনি চলে যাওয়ার একটু পরেই মিস্টার ঘোষদস্তিদারের ফোন এসেছিল।"

"মিস্টার ঘোষদস্তিদার? ও হ্যাঁ, কে ফোন করেছিল?"

"একজন ভদ্রমহিলা। উনি এর আগে দু'দিন ফোন করেছিলেন। আজ মিস্টার ঘোষদস্তিদার চলে গেছেন শুনেই লাইনটা কেটে দিলেন।"

Pathagar.net

"ফোনটা কি লোকাল কল?"

"না। কলকাতা থেকে এসেছিল।" একটা কাগজ এগিয়ে দিল ছেলেটি, "এই নাম্বার থেকে ফোনটা এসেছিল।"

অর্জুন নাম্বারটা দেখল। তারপর জিজ্ঞেস করল, "আমি একটা এস টি ডি করতে পারি?"

"শিওর।"

অর্জুন কলকাতার কোড ব্যবহার করে নাম্বার টিপল। রিং হচ্ছে। তারপরেই একটি মহিলা কণ্ঠে শোনা গেল, "হেলো!"

"মিসেস রায়চৌধুরী?"

"ইয়েস। হু আর ইউ প্লিজ?"

অর্জুন লাইনটা কেটে দিল।

মাথা ঝিমঝিম করছিল অর্জুনের। নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে না। দেবাঞ্জনবাবু কোথায় আছেন তা ওঁর স্ত্রী জানেন? ভদ্রমহিলা তার সঙ্গে চমৎকার অভিনয় করে গিয়েছেন! সীতানাথবাবু বলেছিলেন যে তাঁর বউমাই চাননি পুলিশে খবর দিতে। এই না চাওয়াটা নাকি বংশের মুখরক্ষা করতে। সীতানাথবাবু সেটা বিশ্বাস করেছিলেন। কিন্তু যিনি হারাননি তাঁকে বিপদে ফেলতে কেন তাঁর স্ত্রী পুলিশের দ্বারস্থ হবেন? তা হলে এই ষড়যন্ত্র করে হারিয়ে যাওয়ার পেছনে রহস্যটা কী?

দ্বিতীয়ত, দেবাঞ্জনবাবু এতদিন বাদে দুর্গাপুরে এসে মায়ের মৃত্যুর কারণ এবং সেদিনের ঘটনা সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছেন। শুধু ভ্যারাইটি স্টোর্সের মালিককে জিজ্ঞাসাবাদ করে তিনি নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হননি। হয়তো থানায় গিয়েছেন। কর্মকারের কাছে যাননি তা বোঝা গিয়েছে। গেলে ভদ্রলোক সে-কথা তাদের জানাতেন। দেবাঞ্জনবাবু কি সীতানাথ রায়চৌধুরীর বিরুদ্ধে অস্ত্র সংগ্রহ করতে এখানে এসেছেন! কিংবা বউমার মদতে ছেলে বাবার বিরুদ্ধে সাহসী হয়েছে?

"ঘুরে এলেন?"

গলা শুনে পেছনে ফিরে অর্জুন দেখল সর্বেশ্বরবাবু দাঁড়িয়ে আছেন।

"হ্যাঁ।"

"বাস টার্মিনাসে দেখা পেলেন না?"

"আপনি জানলেন কী করে?"

"রিসেপশনিস্টের কাছে আপনার খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম।"

pathagar.net

সর্বেশ্বরবাবু বললেন, "বড়লোকের আদুরে ছেলে হলে চট করে বাসে ওঠার কথা বোধ হয় ভাববে না। পকেটে টাকা থাকলে গাড়ি ভাড়া করবে, নইলে ট্রেনে যাবে। উনি কি অনেক টাকা সঙ্গে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন?"

"বোধ হয়, না। তবে ক্রেডিট কার্ড থাকা স্বাভাবিক।"

"ট্যাক্সি ড্রাইভার ক্রেডিট কার্ড নেবে না। তার চেয়ে চলুন না, একবার স্টেশনে যাওয়া যাক। আমরা তো কেউ কিছু খাইনি, রাতের খাওয়া খেয়েও যাওয়া যেতে পারে।" সর্বেশ্বরের কথায় খুশি হল অর্জুন। বেশ কিছুক্ষণ থেকে পেট চিনচিন করছিল।

রাত সাড়ে এগারোটায় দুর্গাপুর স্টেশন ঘুমিয়ে নেই। যাওয়া-আসার দুই প্ল্যাটফর্মেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে মানুষ রয়েছে। মধ্যবয়সি, চশমা পরা ফরসা কোনও মানুষ একা দাঁড়িয়ে আছে কি না ওরা দেখতে লাগল।

প্ল্যাটফর্মে তেমন কাউকে পাওয়া গেল না। একজনকে সন্দেহ হয়েছিল সর্বেশ্বরবাবুর। কাছে গিয়ে পরিচয় জানার পর ফিরে এসে বললেন, "উনি মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভ। আইডেনটিটি কার্ড দেখালেন।"

"আপনাকে পুলিশ ভেবেছিল নাকি?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"বোধ হয়।" হাসলেন সর্বেশ্বরবাবু।

"আপনি একটা কাজ করুন।" অর্জুন সর্বেশ্বরবাবুকে কাজটা বুঝিয়ে দিতেই তিনি সোৎসাহে পা বাড়ালেন। ভদ্রলোক চলচ্চিত্র পরিচালক। একটু বয়সও হয়েছে। কিন্তু এসব ব্যাপারে উৎসাহ খুব।

অর্জুন যাত্রীদের জন্যে বিশ্রামগৃহগুলোতে উঁকি মারতে লাগল। দেবাঞ্জনবাবু প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থেকে পরিচিত মানুষের সামনে পড়ার ঝুঁকি হয়তো নেবেন না। সেক্ষেত্রে ট্রেনের অপেক্ষায় এসব জায়গায় বসে থাকা স্বাভাবিক। দ্বিতীয় শ্রেণী ভর্তি। গায়ে গায়ে যাত্রীরা বসে আছেন। দেবাঞ্জনবাবুর বয়সি কাউকে একা চোখে পড়ল না। বাতানুকুল কামরার যাত্রীদের বিশ্রামগৃহে ঢুকে অর্জুন দেখল জনাপাঁচেক যাত্রী আছেন। তাঁদের দু'জন সম্ভবত স্বামী-স্ত্রী। এই সময় মাইকে শোনা গেল, "মিস্টার অরিত্র ঘোষদস্তিদার, যিনি সানরাইজ হোটেলে উঠেছিলেন তিনি অবিলম্বে এনকোয়ারিতে চলে আসুন, হোটেলে একটি দামি জিনিস আপনি ফেলে এসেছিলেন। মিস্টার অরিত্র ঘোষদস্তিদার—।"

ঘরের কোণে ইজিচেয়ারে শুয়ে এক ভদ্রলোক কাগজ পড়ছিলেন, কাগজটা নামিয়ে তিনি দ্বিতীয়বার ঘোষণাটা শুনলেন। তারপর আবার

কাগজের আড়ালে চলে গেলেন। ওই ভদ্রলোকের বয়স বছর পঁয়ত্রিশ, ফরসা, চশমাপরা। কিন্তু ঘোষণা শুনে চমকে ওঠা দূরের কথা, সামান্য প্রতিক্রিয়াও হল না। অর্জুন তবু দাঁড়িয়ে রইল। ভদ্রলোক নির্বিকার। অর্জুনের মনে হল অরিত্র ঘোষদস্তিদার নামটা যদি উনি উপেক্ষা করেন তা হলে কাছে গিয়ে দেবাঞ্জনবাবু বলে ডাকলে কী করবেন? সত্যি হলে চমকে উঠবেনই।

সে এগিয়ে গেল। খুব নিচু গলায় ডাকল, "দেবাঞ্জনবাবু!"

ভদ্রলোক কাগজ সরালেন, কিছু বললেন না।

"আপনি তো দেবাঞ্জনবাবু, তাই না?"

"না তো। আপনি ভুল করছেন!"

"আপনি এখানকার হোটেল সানরাইজ থেকে আসছেন তো?"

"একদমই না। আর কিছু?"

"আপনি কোথায় যাচ্ছেন?"

"কলকাতায়। কী ব্যাপার বলুন তো?" ভদ্রলোক পকেট থেকে একটা আইডেনটিটি কার্ড বের করে সামনে ধরলেন। ছবি সহ সেই কার্ডে অন্য নাম লেখা রয়েছে—" অর্জুন বলল, "আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত।"

বাইরে বেরিয়ে এল সে। অন্যের আইডেনটিটি কার্ড নিয়ে নিশ্চয়ই দেবাঞ্জনবাবু ঘুরবেন না। ঠিক তখনই সে দেখতে পেল ভদ্রলোককে। কর্মকার। হাতে একটা ছোট ব্যাগ নিয়ে স্টেশনে ঢুকছেন। মাইকে ঘোষণা করা হল কলকাতায় যাওয়ার ট্রেনগুলো আসানসোলের পরে ট্রেন লাইনে সামান্য গোলমাল দেখা দেওয়ায় ঘণ্টা দুয়েক দেরিতে পৌঁছবে। কর্মকার ঘড়ি দেখলেন। বেশ বিরক্ত হয়েছেন ঘোষণা শুনে। এই সময় সর্বেশ্বরবাবু এগিয়ে এলেন, "আমি বলে এসেছি এনকোয়ারিতে কেউ ওই নাম বললে তাকে আটকে রাখতে। চলুন।"

অর্জুন চোখ না সরিয়ে বলল, "আপনি একটা কাজ করবেন?"

"বলুন!" সর্বেশ্বরবাবু বললেন।

"ওই ভদ্রলোক, দেখতে পাচ্ছেন, ওঁর ওপর নজর রাখুন। আমি যত তাড়াতাড়ি পারি হোটেলের বিল চুকিয়ে চলে আসি।"

"আরে! এ তো মিস্টার কর্মকার! উনি এত রাতে কোথায় চললেন?"

"সেইটে জানা দরকার।" অর্জুন বলল।

এই সময় মাইকে ঘোষণা করা হল শেষ বর্ধমান লোকাল যেটা রাস্তায় আটকে ছিল সেটা এখনই স্টেশনে ঢুকবে। যাত্রীদের মধ্যে তেমন ব্যস্ততা

pathagar.net

দেখা গেল না। এই সময় লোকাল ট্রেনের যাত্রীদের স্টেশনে থাকার কথাও নয়।

অর্জুন বলল, "ভদ্রলোক যেন আপনাকে দেখতে না পান। সাবধান।"

"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি ছায়ার মতো সেঁটে থাকব। আমার হোটেল ভাড়ার টাকাটা যদি নিয়ে যান।" সর্বেশ্বর পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করলেন।

"ওটা এখন থাক। পরে হিসেব করা যাবে।"

"না, না। তা হয় না।" মাথা নাড়লেন সর্বেশ্বরবাবু।

আর তখনই একটা লোকাল ট্রেন প্রায় ভূতের মতো প্ল্যাটফর্মে ঢুকল। অর্জুন তাকিয়ে দেখল মিস্টার কর্মকার যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখানে নেই। দ্রুত হাঁটল সে। যতটা তফাতে থেকে খোঁজা সম্ভব খুঁজতে লাগল সে। পেছনে সর্বেশ্বরবাবু। হঠাৎ নজরে এল ভদ্রলোক ওপাশের প্ল্যাটফর্মে ওভারব্রিজ থেকে নামছেন। অর্জুন বলল, "ওই যে ওদিকে, তাড়াতাড়ি চলুন।"

ওরা ওভারব্রিজে উঠে প্ল্যাটফর্মে নামার আগেই লোকাল ট্রেনটা আবার চলতে শুরু করল। সেটা বেরিয়ে যাওয়ার পর দেখা গেল ওই প্ল্যাটফর্ম ফাঁকা, কোথাও মিস্টার কর্মকার নেই। সর্বেশ্বরবাবু বললেন, "যাঃ, বাবা। চলে গেল?"

"মনে হয় আমাদের দেখতে পেয়েছেন তাই কোনও ঝুঁকি নিলেন না। এই ট্রেনে বর্ধমান পর্যন্ত এগিয়ে গেলেন।" অর্জুন বলল।

"কোনও লাভ হবে না। বর্ধমান স্টেশনে গিয়ে ওঁকে বসে থাকতে হবে হাওড়া লোকালের জন্যে, অথবা এখান থেকে যে ট্রেন যাবে সেটাই ধরতে হবে ওঁকে কলকাতায় যাওয়ার জন্যে।"

"কিন্তু ওঁর আগে আমাদের কলকাতায় পৌঁছতে হবে।"

"আপনি তো দেবাঞ্জনকে খুঁজতে এসেছেন, কর্মকারকে নিয়ে পড়লেন কেন?"

"এখন কান নাক ঠোঁট একাকার হয়ে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি চলুন।"

স্টেশনের বাইরে বেশ কয়েকটা ট্যাক্সি অলস হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। দূরপাল্লার ট্রেন দেরিতে আসছে তা জানায় ড্রাইভার খুঁজে পাওয়ার সমস্যা হল। যখন পাওয়া গেল তখন অর্জুন জানতে চাইল কলকাতায় পৌঁছে দেবে কি না। দু'জন ড্রাইভারকে পাওয়া গিয়েছিল। ওরা বলল, কলকাতায় যাওয়া সম্ভব নয় তবে বর্ধমান স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে মাঝরাতেই। অর্জুন

Pathagar.net

রাজি হল। প্রথমে হোটেলে গিয়ে বিল মিটিয়ে দেওয়া হল।

গাড়িতে ওঠার পর ড্রাইভার বলল, "এই হোটেলের এক ভদ্রলোক আমাকে খুব বলেছিলেন কলকাতায় যাওয়ার জন্যে, আমি তাঁকেও না বলেছি।"

"কবে?"

"আজই। একটু আগে। ভদ্রলোক কাল সারাদিন আমার ট্যাক্সিতে ঘুরেছেন। থানায় গিয়েছেন তিনবার। কিন্তু কী করব বলুন, কাল সকালেই মাকে নিয়ে যেতে হবে আসানসোলে। কোনও উপায় নেই।" ড্রাইভার বলল।

"ভদ্রলোককে দেখতে কেমন?" সর্বেশ্বরবাবু জানতে চাইলেন।

"ফরসা। আপনার চেয়ে অনেক ছোট কিন্তু ওঁর চেয়ে বেশ বড়। চশমা আছে। খুব আস্তে কথা বলেন।" ড্রাইভার জানাল।

"থানায় গিয়েছিলেন কেন?"

"অনেক বছর আগে এখানে নাকি একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল সে ব্যাপারে খোঁজখবর করতে। তিনদিন ধরে যাওয়া-আসা করে আজ তার রেকর্ড দেখতে পেয়েছেন। আপনারা যদি আর আধঘণ্টা আগে আসতেন তা হলে সর্দারজির গাড়িতে ওঁর সঙ্গে কলকাতায় চলে যেতে পারতেন।"

"উনি স্টেশন থেকেই ট্যাক্সি ধরেছেন?"

"হ্যাঁ। লেট হবে ট্রেন শোনামাত্র বেরিয়ে এসেছিলেন।"

ট্যাক্সির পেছনের সিটে অলস ভঙ্গিতে বসে সর্বেশ্বর কথাবার্তা শুনছিলেন। এবার সোজা হয়ে বসে বললেন, "ইস।"

অর্জুন বলল, "আপনি ঠিকই ধরেছিলেন, ভদ্রলোক স্টেশনেই গিয়েছিলেন।"

আড়াইটে নাগাদ ওরা বর্ধমান স্টেশনে পৌঁছে গেল। ড্রাইভার বলেছিল, "এখান থেকে আর ট্যাক্সি নেবেন না সার। চারটের লোকাল ধরুন।"

দার্জিলিং মেলে বর্ধমান কলকাতার দূরত্ব সওয়া ছ'ঘণ্টায় অতিক্রম করা যায়। লোকালে গেলে সাড়ে ছ'টার মধ্যেই পৌঁছোনো যাবে। এ ক্ষেত্রে দেবাঞ্জনবাবু যদি সরাসরি ট্যাক্সি নিয়ে কলকাতায় যান তা হলে অনেক আগেই পৌঁছে যাবেন। আধঘণ্টা আগে যিনি রওনা হয়েছেন তাঁকে তাড়া করে ধরা সম্ভব নয়।

boiRboi.net

ট্যাক্সিতে আসতে আসতে অর্জুন মনে মনে ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করছিল। সর্বেশ্বরবাবুকে ধন্যবাদ, তিনি আর একটিও শব্দ উচ্চারণ করেননি। এক, পনেরো-ষোলো দিন আগে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন দেবাঞ্জন, কিন্তু দুর্গাপুরে এসেছেন মাত্র দিন তিনেক আগে। দুর্গাপুরে আসার আগে উনি কোথায় ছিলেন? না কি উনি দুর্গাপুরের অন্য কোনও হোটেলে আগের দিনগুলোতে আত্মগোপন করে ছিলেন? এইটে জানা যাচ্ছে না। কিন্তু ভদ্রলোক তাঁর মায়ের মৃত্যুসংক্রান্ত দুর্ঘটনার ব্যাপারে খোঁজ নিতে এসেছিলেন যখন, তখন বোঝা যাচ্ছে তাঁর মনে ও-ব্যাপারে সন্দেহ জন্মেছে। এতকাল বাবার ছায়ায় মাথা নিচু করে থাকার পর হঠাৎ তাঁর মধ্যে এই পরিবর্তন কী করে এল? এই দুর্ঘটনার পেছনে যদি কোনও সত্য লুকিয়ে থাকে তা হলে সেটা জেনে ওঁর কী লাভ হবে?

দুই, ব্রেক ফেল করায় অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল। স্ত্রীর মৃত্যু একটি আকস্মিক দুর্ঘটনা। পুলিশ প্রথম রিপোর্ট নিশ্চয়ই দিয়েছিল তাই কোনও মামলা সীতানাথ রায়চৌধুরীর বিরুদ্ধে আদালতে যায়নি। তা ছাড়া দুর্ঘটনায় ভদ্রলোক আজীবনের জন্যে পঙ্গু হয়ে গেছেন বলে সকলের সহানুভূতিও পেয়েছেন। কর্মকারবাবু বলেছেন, নিজের জীবন বিপন্ন করে কেউ কাউকে খুনের চেষ্টা করে না যখন অনেক সহজ পথ খোলা রয়েছে। কিন্তু ভ্যারাইটি স্টোর্সের মালিক এবং অঞ্জনের অস্পষ্ট স্মৃতি বলছে যে দুর্ঘটনার পরই সীতানাথ গাড়ি থেকে নেমেছিলেন। গাড়ি থেকে ছিটকে গাছের পাশে পড়ে থাকা স্ত্রীর মৃতদেহ দেখার পর আবার ফিরে গিয়েছিলেন স্টিয়ারিংয়ের সামনে। এই তথ্য অনুযায়ী সীতানাথ দুর্ঘটনার সময়েই পঙ্গু হয়ে যাননি। হলে পরে হয়েছেন। সেটা ডাক্তাররা নিশ্চয়ই ধরতে পেরেছেন। কিন্তু কোন ডাক্তার ওঁর চিকিৎসা করেছিলেন সেটা হাসপাতালের রেকর্ড থেকে এতদিন পরে বোঝা যাবে কি না সন্দেহ। তা ছাড়া গাড়ির ব্রেক সত্যি বিকল হয়েছিল কি না তা কোনও মেকানিক দিয়ে পরীক্ষা করানো হয়েছিল কিনা কর্মকারবাবু জানাননি। প্রসঙ্গটি তিনি এড়িয়ে গিয়েছিলেন।

তিন, মিসেস রায়চৌধুরীর সঙ্গে ওঁর স্বামীর নিয়মিত যোগাযোগ ছিল এবং তা সত্ত্বেও উনি ভান করেছেন যে, স্বামীর খোঁজ পাচ্ছেন না। স্বামীকে আড়াল করার জন্যে উনি শ্বশুরকে পুলিশের কাছে যেতে দেননি। বউমার এই ভূমিকার কথা শ্বশুর জানলে কী প্রতিক্রিয়া হবে তা অনুমান করা যেতে পারে।

চার, কর্মকারবাবু কলকাতায় যাচ্ছেন? বোঝাই যাচ্ছে তাঁর কোনও

পরিকল্পনা আগে ছিল না। সন্ধেবেলায় তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে মনে হয়েছে কলকাতায় যাওয়া দরকার। নিজে না গিয়ে তিনি টেলিফোনে জানাতে পারতেন যাকে জানাতে চান। তা হলে কি টেলিফোনে জানাতে পারেননি? না কি এই ব্যাপারটা ওঁর কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ যে, টেলিফোনে জানাতে চাননি?

ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে অর্জুন ড্রাইভারকে বলল, "আপনি তো এখনই দুর্গাপুরে ফিরে যাচ্ছেন, একটা উপকার করবেন?"

"বলুন।"

"শহরে ঢোকার মুখে একটা দোকান আছে, ভ্যারাইটি স্টোর্স, মুদির দোকান, চিনতে পারছেন?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"খুব চিনি।"

"কাল সকালে তো আপনি মাকে নিয়ে আসানসোলে যাবেন। তাই আজ ফেরার পথে ভদ্রলোককে খুঁজে বের করতে পারবেন?"

"একটু মুশকিল হবে। দোকান তো সকালের আগে খুলবে না। আশপাশের সবাই নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে থাকবে। ঠিক আছে, ও-পাড়ায় আমার এক বন্ধু আছে, ওকে ডেকে তুলে জেনে নেব বাড়ির ঠিকানা। কী বলতে হবে?"

"দিনতিনেক দোকান বন্ধ করে দূরে কোথাও চলে যেতে। কোথায় যাচ্ছেন বাইরের কেউ যেন না জানে। ওঁর জীবন বিপন্ন। দোকানে থাকলে উনি মারা যেতে পারেন। ব্যস, এটুকু।" অর্জুন বলেছিল।

"তা হলে তো যেমন করেই হোক খবরটা দিতে হয়।" ড্রাইভার বেশ উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কিন্তু কে খুন করবে? কোনও গ্রুপ?"

"কোনও গ্রুপ নয়। একটা অ্যাক্সিডেন্টের উনি সাক্ষী ছিলেন, এই ওঁর অপরাধ।" অর্জুন আর কথা না বাড়িয়ে স্টেশনের দিকে পা বাড়িয়েছিল।

সর্বেশ্বরবাবু টিকিট কাটলেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেল বর্ধমান লোকাল একটু আগে পৌঁছে গিয়েছে। মেল-এক্সপ্রেস ট্রেনগুলো এখন পর পর আসছে। অর্থাৎ কর্মকারবাবুকে এখন প্ল্যাটফর্মেই পাওয়া যাবে।

অনুমান ভুল হল না। কর্মকারবাবু প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছেন মেল ট্রেন ধরার জন্যে। লোকাল ছাড়তে এখনও দেরি আছে। দুর্গাপুর স্টেশনে না ধরে এখান থেকে ট্রেন ধরার কারণ উনি নিশ্চয়ই ওদের দেখেছিলেন তাই এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। বেশ খানিকটা দূরত্বে অর্জুনরা দাঁড়িয়ে ছিল। ট্রেন আসামাত্র কর্মকারবাবু একটা এসি টু টিয়ারে উঠে পড়লেন।

সর্বেশ্বরবাবু বললেন, "মরেছে! এ দেখছি এসি-তে উঠল।"

"উঠুক। পাশের থ্রি টিয়ারে উঠুন। ট্রেনটা এক জায়গাতেই পৌঁছবে।"

সর্বেশ্বরবাবুর উৎসাহ বেশি। ট্রেন না ছাড়া পর্যন্ত বারেবারে মুখ বাড়িয়ে দেখে গেলেন যদি কর্মকারবাবু আবার কামরা পরিবর্তন করেন। ট্রেন গতি নিলে বললেন, "যাক, আর চিন্তা নেই।"

অর্জুন বলল, "স্টেশনে নেমে ওঁকে ফলো করতে পারবেন? স্টেশন থেকে বেরিয়ে উনি কোথায় উঠছেন জেনে আপনি বাড়িতে চলে যাবেন।"

"আপনি?" সর্বেশ্বরবাবু বেশ উত্তেজিত।

"আমি পার্ক স্ট্রিট ঘুরে আপনার বাড়িতে যাব।"

"পার্ক স্ট্রিট? ও হো, ছোট ছেলের কাছে যাচ্ছেন। ওই চরিত্রটা দেখা হল না।"

"আপনি তো সীতানাথ রায়চৌধুরী এবং তাঁর বউমাকেও দেখেননি।"

"তা অবশ্য।"

"দেবাঞ্জনকে?"

"উঃ। নাকের ডগা দিয়ে বেরিয়ে গেল!" আফসোস করলেন ভদ্রলোক।

হাওড়া স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে যেভাবে হাঁটলেন কর্মকারবাবু তাতে তাঁকে অবসরপ্রাপ্ত বলে মনে হচ্ছিল না। কিন্তু গেটের দিকে না এগিয়ে ভদ্রলোক পাশের প্ল্যাটফর্মের দিকে গেলেন। বেশি দামের টিকিট কেটে গাড়ি একেবারে প্ল্যাটফর্মের গায়ে নিয়ে যাওয়া যায়। এরকম বেশ কিছু দাঁড়িয়ে-থাকা গাড়ির একটার দরজা খুলে গেল এবং কর্মকারবাবু তাতে চুপচাপ উঠে পড়তেই গাড়ি সোজা এগিয়ে গেল। সর্বেশ্বরবাবু বললেন, "যাচ্চলে। ওঁকে কেউ নিতে এসেছিল।"

অর্জুন মারুতি থাউজেন্ড গাড়িটার নাম্বার মনে রাখার চেষ্টা করল।

গাড়ি চোখের আড়ালে চলে যেতে সর্বেশ্বরবাবু বললেন, "এখন কী করব?"

"কিছু করার নেই। বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম নিন।"

"দুর! এখন বিশ্রামের কথা ভাবতেই পারছি না। কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে, বুঝলেন। আমার সিক্সথ সেন্স বলছে এ-কথা।" সর্বেশ্বরবাবু চোখ বন্ধ করে বললেন।

অর্জুন দাঁড়াল না। একটা টেলিফোন বুথে ঢুকে সীতানাথবাবুর নাম্বার ডায়াল করল। রিং হচ্ছে। এই ভোরে ভদ্রলোক যদি ঘুম থেকে না ওঠেন তা হলে—।

Pathagar.net

"হ্যালো। কাকে চান?"

"সীতানাথবাবু আছেন? আমি অর্জুন। খুব জরুরি দরকার।"

"সাহেব তো বাড়িতে নেই।"

"কোথায় গিয়েছেন?"

"এই ঘণ্টাখানেক আগে গাড়িতে বসে বেড়াতে গেছেন। ফিরে এলে কিছু বলতে হবে?" অর্জুন বুঝল এ ম্যানেজার নয়, অন্য লোক।

টেলিফোন নামিয়ে রেখে অর্জুন হাসল, ওই গাড়িতে সীতানাথ রায়চৌধুরী থাকলে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

ওঁরা এখন কী করবেন? কর্মকারবাবু নিশ্চয়ই জানাবেন দু'জন লোক অ্যাক্সিডেন্ট নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছে। সাক্ষী হিসেবে ভ্যারাইটি স্টোর্সের মালিকের কথা বলেছে। কুড়ি বছর ধরে যখন কর্মকারবাবু সীতানাথের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছেন তখন নিশ্চয়ই সম্পর্কটা ধোয়া তুলসীপাতা নয়। ভদ্রলোককে হাতে রেখেছেন সীতানাথ। আবার সীতানাথকেও ভদ্রলোকের দরকার। নইলে এত রাতে ছুটে আসতেন না।

সর্বেশ্বরবাবু একটা বাংলা কাগজ কিনলেন। ট্যাক্সির ডাইনে দাঁড়িয়ে তিনি মন দিয়ে কাগজ পড়ছিলেন। হঠাৎ তাঁর গলা থেকে অদ্ভুত আওয়াজ বের হল।

অর্জুন চমকে বলল, "কী হল?"

সর্বেশ্বরবাবু কাগজটার একটা জায়গা আঙুল দিয়ে দেখালেন। দেখে অর্জুন স্তম্ভিত। গতকাল সন্ধের পরে দুর্গাপুর শহরের উপকণ্ঠে অজ্ঞাত আততায়ীর গুলিতে একটি স্টেশনারি দোকানের মালিক গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। আততায়ীকে ধরা যায়নি। পুলিশ তদন্ত করছে।"

সর্বেশ্বরবাবু মাথায় হাত দিলেন, "আমার জন্যে, আমার জন্যে লোকটার এই অবস্থা। আমি যদি কর্মকারবাবুকে ওঁর কথা না বলতাম।" খুব ভেঙে পড়লেন ভদ্রলোক।

ট্যাক্সিতে উঠেও তিনি বারংবার আফসোস করতে লাগলেন। ব্যাপারটা যে আর সাধারণ পর্যায়ে নেই তা বুঝতে পারছিল অর্জুন। ধর্মতলার কাছে ট্যাক্সি আসতে অর্জুন বলল, "আপনি সোজা গাড়িটা নিয়ে এলগিন রোডে চলে যান। সীতানাথ রায়চৌধুরীর বাড়িটা ঠিক কোথায় বলে দিচ্ছি। হয়তো খুব দেরি হয়ে গিয়েছে তবু চান্স নেওয়া যেতে পারে। ওই বাড়ি থেকে কোনও মহিলা যদি গাড়ি নিয়ে বের হন তা হলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে অনুসরণ করবেন। আমার

বিশ্বাস সেই গাড়ি কোনও হোটেল বা গেস্ট হাউসে যাবে। যেখানেই যাক জেনে নিয়ে আপনি বাড়িতে ফিরে গিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন।"

বাড়িটার অবস্থান ভাল করে বুঝিয়ে ট্যাক্সি থেকে নেমে কিছু টাকা জোর করে সর্বেশ্বরবাবুর হাতে গুঁজে দিল অর্জুন।

দরজা খুলে অর্জুনকে দেখে অঞ্জন অবাক! বোঝাই যাচ্ছে যে, ঘুম ভেঙে যাওয়ার বিরক্তও। বলল, "এ-সময় কেন?"

ঘরে ঢুকে অর্জুন বলল, "আপনি চটপট তৈরি হয়ে নিন।"

"মানে? কোথায় যাব? আশ্চর্য! একদিনের আলাপে আপনি হুকুম করছেন?"

"হুকুম নয়, অনুরোধ। এখানে থাকলে আপনি খুন হয়ে যেতে পারেন।"

"খুন? আমি? এ-পাড়ায় এসে আমাকে খুন করবে এমন কারও হিম্মত হবে?"

"রাবণ থেকে হিটলার সবাই তাই ভাবতেন। আপনাকে অনুরোধ করছি যা নেওয়ার তা নিয়ে কয়েকদিনের জন্যে কোনও হোটেলে গিয়ে থাকতে।"

"বাট হোয়াই? কেন?"

"কারণ আপনি একজন সাক্ষী। বাল্যকালে যা দেখেছেন তা অস্পষ্ট বলে মনে হওয়ায় গলা খোলেননি। কিন্তু সেটা করতে পারেন এই ভেবে আপনি যা চান তা দিয়ে ব্যাপারটাকে চেপে রাখতে চেয়েছিলেন আপনার বাবা। কিন্তু তিনি বোধ হয় আর ঝুঁকি নিতে চাইবেন না।" অর্জুন বলল।

"তার মানে, আপনি বলতে চাইছেন আমার বাবা আমাকে খুন করবেন?"

"আজকাল কেউ নিজে কিছু করে না, করে দেওয়ার জন্যে লোকের অভাব হয় না।"

"আপনি এসব কথা জানলেন কী করে?"

"বলব। কোথাও চলুন। গিয়ে বসি।"

অঞ্জন একটু ভাবল। তারপর ভেতরের ঘরে গিয়ে ব্যাগ গুছিয়ে পোশাক পালটে বেরিয়ে এল। দরজায় চাবি দিয়ে ওরা ফ্লুরিস রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসল। বিরাট ছিমছাম শীতাতপনিয়ন্ত্রিত রেস্টুরেন্টের পরিবেশ খুব ভাল লাগল অর্জুনের। স্যান্ডুইচ আর চায়ের অর্ডার দিয়ে অঞ্জন জিজ্ঞেস করল, "ঠিকঠাক বলুন তো, কী হয়েছে?"

Pathagar.net

যা ঘটেছিল তা সংক্ষেপে বলে গেল অর্জুন। শুনতে শুনতে দু'হাতে মুখ ঢাকল অঞ্জন। অর্জুন কথা শেষ করলে সে বিড়বিড় করছিল, "যদি এসব ঠিক হয় তা হলে মাকে খুন করেছিল বাবা। কিন্তু কেন? মা কী অন্যায় করেছিল? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

অর্জুন বলল, "উনি খুন করেছিলেন কি না জানি না, কিন্তু উনি সত্য গোপন করেছিলেন। দুর্ঘটনা ঘটা মাত্র উনি পঙ্গু হয়ে যাননি। গাড়ি থেকে নেমেছিলেন। হয়তো খেয়াল হয়েছিল, দুর্ঘটনায় মৃত্যু হওয়ায় পুলিশ ওঁর বিরুদ্ধে কেস করতে পারে। সেই ঝুঁকি নিতে চাননি। উনি নিজে পঙ্গু হয়ে গেছেন জানার পরে ওঁর প্রতি সহানুভূতি আসবেই। পঙ্গু হওয়ার বদলে উনি নিজেই মরে যেতে পারতেন বলে লোকে ভাববে। কিন্তু এটা প্রমাণ করতে দু'জন লোকের সাহায্য চাই। একজন, যিনি হাসপাতালে ওঁর চিকিৎসা করেছেন। দ্বিতীয়জন, যে পুলিশ অফিসার তদন্তে ছিলেন। হাসপাতালের ডাক্তারের যেহেতু বদলির চাকরি, তাই খুঁজে বের করতে অসুবিধে হবে। যদি তিনি ইতিমধ্যে অবসর নিয়ে থাকেন বা মারা যান তা হলে তো সূত্রটা কাজে লাগবে না। যিনি তদন্ত করেছিলেন, তাঁর সঙ্গে আপনার বাবার যোগাযোগ ছিল। নইলে আমরা যাওয়ার কিছু পরেই ভ্যারাইটি স্টোর্সের মালিককে খুন করার চেষ্টা হত না এবং অফিসার কলকাতার ট্রেন ধরার জন্যে মরিয়া হতেন না। আমার মনে হয়, এই দু'জনকেই আপনার বাবা টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছিলেন সত্যি কথাটা চেপে যাওয়ার জন্যে।"

চুপচাপ শুনছিল অঞ্জন, "তার মানে বাবা স্বাভাবিক মানুষ? ক্রাচটা অভিনয়ের জন্যে ব্যবহার করেন?"

"সেটাই হওয়া উচিত। ওঁর ক্রাচ একেবারে নতুন। রবার ক্ষয়ে যায়নি। অবশ্য উনি সদ্য একটা নতুন ক্রাচ কিনে থাকতে পারেন।"

"তা হলে উনি আপনাকে জলপাইগুড়ি থেকে ডেকে আনবেন কেন?"

"আপনার দাদার উধাও হওয়ার ঘটনাটা ওঁকে সত্যিই ধাঁধায় ফেলেছিল। বড় ছেলে এত অনুগত, কিছু না বলে নিরুদ্দেশে যাবে উনি ভাবতে পারেননি। আর বউমার পরামর্শ মেনে উনি পুলিশের কাছেও যেতে চাননি। উনি নিশ্চয়ই ভাবতে পারেননি আমি দুর্গাপুরে যাব ওই দুর্ঘটনার ব্যাপারে খোঁজখবর করতে। কারণ ওর সঙ্গে ছেলের নিরুদ্দিষ্ট হওয়ার কোনও সম্পর্ক নেই। আপনি যে আমাকে দুর্ঘটনার কথা বলবেন তাও উনি কল্পনা করেননি। যদিও আপনার সঙ্গে কথা বলতে আমাকে নিষেধ করেছেন। এখন উনি নিশ্চয়ই

বুঝে গিয়েছেন যে, আপনার কাছ থেকে সূত্র পেয়েই আমি দুর্গাপুরে গিয়েছিলাম। সেই ঘটনার সাক্ষী দু'জন, একজনকে সরাবার চেষ্টা হয়েছে, আপনাকেও হবে। সবচেয়ে অবাক করা ব্যাপার, আপনার দাদা এসব জানলেন কী করে? আপনার দাদা আর বউদি প্ল্যান করে ওই উধাও হওয়ার কেস সাজিয়েছেন। আমার মনে হয় আপনার বউদি কোনও সূত্র থেকে প্রথম সন্দেহ করেন। তারপর আপনার দাদাকে বলেন।"

"হ্যাঁ। তাই হবে। বউদি আমাকে ফোনে ওই দুর্ঘটনার কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমি বাবাকে জিজ্ঞেস করতে বলায় বলেছিলেন যে স্মৃতি বাবা ভুলে আছেন তা খুঁচিয়ে ঘা করতে চান না।" অঞ্জন বলল।

"অর্থাৎ আপনার বউদি ব্যাপারটা সন্দেহ করেছেন।"

"আপনি কলকাতায় কোথায় উঠেছেন?" অঞ্জন জানতে চাইল।

"ভবানীপুরে। আপনার বাবা অবশ্য আমার জন্যে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের ড্যাফোডিল হোটেলে ঘর ঠিক করে রেখেছেন।"

"হ্যাঁ। ওখানে বাবা চাইলেই দুটো ঘর সব সময় পেতে পারেন। তার জন্যে কোনও টাকা দিতে হয় না। ওই হোটেলে ওঁর শেয়ার আছে।"

"তাই?" কথাটা শুনেই মনে হল সীতানাথবাবু জানেন সে ওই হোটেলে ওঠেনি। এমন তো হতে পারে বিনা পয়সায় পাওয়া যাচ্ছে বলে কর্মকারবাবুকে তিনি ওই হোটেলেই রাখবেন। কথাটা অঞ্জনকে জানাতে সে মাথা নাড়ল।

চা খেয়ে অঞ্জন বলল, "আমি ভাবছি একবার বাড়িতে যাব।"

"কেন?"

"বাঃ, আমার নিজের বাড়িতে যাওয়ার অধিকার নিশ্চয়ই আছে। আর সেখানে নিশ্চয়ই বাবার লোক আমাকে খুন করার সাহস পাবে না।"

"তা ঠিক। তবে তার আগে আমাকে একটু সময় দিন।" অর্জুন উঠল। রেস্টুরেন্ট থেকেই ফোন করতে সীতানাথবাবুকে পেয়ে গেল। সীতানাথবাবু বললেন, "গুডমর্নিং। নতুন কোনও খবর আছে?"

"হ্যাঁ। মনে হচ্ছে আপনার ছেলে এখন কলকাতায় রয়েছেন।"

"তাই? কোথায়?" সীতানাথ যেন চমকে উঠলেন।

"কনফার্ম হলেই জানিয়ে দেব।" অর্জুন বলল।

"গুড। তা হলে তো আপনার কাজ শেষ হয়ে এল!"

"মনে হচ্ছে তাই। আচ্ছা, রাখছি।"

pathagar.net

অঞ্জনের কাছে ফিরে এসে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কলকাতা পুলিশের কোনও বড়কর্তাকে আপনি কি চেনেন? র‍্যালির সূত্রে যদি কারও সঙ্গে আলাপ হয়ে থাকে—!"

অঞ্জন মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ, ডি সি র‍্যাঙ্কের একজন অফিসার আমাকে স্নেহ করেন।"

"বাঃ, তাঁর কাছে চলুন।"

"এখন, এই সকালে?"

"সকাল আর নেই। ন'টা বেজে গেছে।"

অঞ্জনকে নিয়ে যখন লালবাজারে এল তখনও ডি সি সাহেব অফিসে পৌঁছননি। আধঘণ্টা অপেক্ষার পর তাঁর দেখা পাওয়া গেল। ঘরে ঢোকামাত্র তিনি বললেন, "আরে! কী ব্যাপার? এবার র‍্যালি কোথায় হচ্ছে?"

"র‍্যালি নয়। আপনার কাছে অন্য প্রয়োজনে এসেছি।" অঞ্জন বলল।

"বেশ তো।" হাত নেড়ে বসতে বললেন ভদ্রলোক।

"এঁর নাম অর্জুন। জলপাইগুড়িতে থাকেন। কী যেন বলেছিলেন, হ্যাঁ, সত্য সন্ধান, উনি তাই করেন।" অঞ্জন পরিচয় করিয়ে দিল।

"অর্জুন! দাঁড়ান দাঁড়ান। আপনার নাম আমি অনেক শুনেছি। জলপাইগুড়ির এস পি এই সেদিনও আপনার কথা বলছিলেন।" ডি সি হাত বাড়ালেন। করমর্দন করার পর জিজ্ঞেস করলেন, "ব্যাপারটা কী?"

অর্জুন সংক্ষেপে ব্যাপারটা বলার পর ডি সি নিজেই ওদের নিয়ে আর একজন অফিসারের কাছে গেলেন। দুই অফিসার কথাবার্তা বলে অঞ্জনের দিকে তাকালেন। ডি সি বললেন, "যা শুনলাম তাতে তোমাদের পরিবারের ওপর বিশাল বদনামের ছাপ পড়বে। এটা জেনেও তুমি এলে?"

"হ্যাঁ। যা সত্যি তাই মেনে নেওয়া উচিত।"

"বেশ, অ্যাকশন নেওয়া হোক।" ডি সি বললেন।

অর্জুন বলল, "তার আগে আমি একটা টেলিফোন করতে পারি?"

"নিশ্চয়ই।" অফিসার টেলিফোন দেখিয়ে দিলেন।

পকেট থেকে কাগজটা বের করে সর্বেশ্বরবাবুর নম্বরটা ডায়াল করল অর্জুন। তৃতীয়বার রিং হওয়ার পর সর্বেশ্বরবাবুর গলা পাওয়া গেল, "হ্যালো?"

pathagar.net

"ফিরে এসেছেন?"

"ও হ্যাঁ। আরে মশাই, আপনার জন্যে হাঁ করে বসে আছি।"

"খবরটা কী?"

"আর এক মিনিট দেরি হলে ভদ্রমহিলাকে মিস করতাম। উনি গাড়ি নিয়ে বেরোতেই আমি ট্যাক্সিতে ফলো করলাম। নিউ মার্কেটে গিয়ে গাড়ি থেকে নেমে আবার ট্যাক্সিতে উঠলেন তিনি। আমিও তাই করলাম। শেষে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের একটা হোটেলের সামনে ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে ভেতরে চলে গেলেন। মিনিট দশেক। ভদ্রমহিলা আবার ওই ট্যাক্সি নিয়েই নিউ মার্কেটে ফিরে এসে নিজের গাড়িতে উঠে বাড়ি ফিরে যান।" সর্বেশ্বরবাবু উত্তেজিত।

"ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের হোটেলটার নাম কী?"

"ব্লু হেভেন। সাধারণ মানের হোটেল।"

লাইনটা কেটে দিয়ে অর্জুন অঞ্জনকে বলল, "আপনার দাদা ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের ব্লু হেভেন হোটেলে আছেন। খানিক আগে আপনার বউদি গিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করে এসেছেন।"

লালবাজার থেকে পুলিশের জিপে ওঁরা প্রথমে ড্যাফোডিল হোটেলে পৌঁছলেন। রিসেপশনিস্ট জানাল, কর্মকার নয়, মিস্টার এস কে গুপ্তা বলে একজন আজ ভোরে হোটেলে এসেছেন। তবে তিনি এই হোটেলের এক শেয়ার হোল্ডারের গেস্ট হয়ে আছেন। ভদ্রলোক আধঘণ্টা আগে বেরিয়ে গেছেন ঘরে জিনিস রেখে। বলেছেন আজ বিকেলেই ফিরে যাবেন।

কোথায় গেছেন বলে না যাওয়ায় অফিসার প্রস্তাব দিলেন ওখানেই অপেক্ষা করতে। অর্জুন হাসল, "হোটেলের বাইরে আপনার জিপ দাঁড়িয়ে আছে। কর্মকারবাবু নিজে একজন পুলিশ অফিসার ছিলেন। উনি কখনওই এখানে ঢুকবেন না। আমার মনে হয় একবার পার্ক স্ট্রিটে অঞ্জনবাবুর ফ্ল্যাটে গেলে হয়।"

অঞ্জন অবাক হল, "আমার ফ্ল্যাটে?"

অর্জুন বলল, "আমার অনুমান, আপনার ওখানে এর মধ্যে কেউ-না-কেউ পৌঁছে গেছেন।"

গাড়ি ছুটল। দূরত্বটা বেশি নয়। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে দরজায় চাপ দিতেই সেটা খুলে গেল। অর্জুন অঞ্জনের দিকে তাকাল। অঞ্জন খুব অবাক হয়ে গেছে। বেরোবার সময় সে দরজাটা টেনে দেখে গিয়েছিল ল্যাচ-কি লেগেছে কিনা।

Pathagar.net

সমস্ত ঘর লণ্ডভণ্ড। যেন ঝড় বয়ে গিয়েছে এখানে। অঞ্জন স্তম্ভিত। ওরা দেখল, এই ফ্ল্যাটে কেউ নেই। অফিসার বললেন, "অর্জুনবাবুর অনুমানই ঠিক। আপনাকে না পেয়ে রাগ মেটানোর চেষ্টা হয়েছে।"

অঞ্জন কোনওমতে বলতে পারল, "কে? কে করেছে?"

হঠাৎ অর্জুনের নজর পড়ল অ্যাশট্রের ওপর। সে কি ভুল দেখল? দ্রুত কাছে গিয়ে ওটাকে তুলে বুঝতে পারল ভুল হয়নি। সে চিৎকার করে অফিসারকে বলল, "তাড়াতাড়ি নীচে চলুন। যে এসেছিল সে এখনই এখান থেকে বেরিয়েছে। এখনও সিগারেটের ধোঁয়া নেভেনি।"

সবাই বাইরে বেরিয়ে এল। সিঁড়িটা ওপরে চলে গিয়েছে। এমন হতে পারে তাদের আসতে দেখে লোকটা ওপরে উঠে গিয়ে অপেক্ষা করেছে। দ্রুত নীচে নেমে এল অর্জুন। নীচে কেউ নেই।

পুলিশের জিপ আবার ছুটল ড্যাফোডিল হোটেলের উদ্দেশে। যেতে যেতেই কথা হল, জিপ দূরে দাঁড়াবে। ওরা হোটেলে ঢুকে শুনল তখনও মিস্টার গুপ্তা ফেরেননি। ব্যাপারটা গোপন রাখতে বলে অফিসার অর্জুনের সঙ্গে একটা থামের আড়ালে চেয়ার টেনে বসলেন। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে কর্মকারবাবু ঢুকলেন। রিসেপশনিস্টের কাছে চাবি চাইলেন।

অর্জুন এগিয়ে গেল, "মিস্টার কর্মকার?"

সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়ে যেন ভূত দেখলেন ভদ্রলোক। তারপরেই ছিটকে পালাবার চেষ্টা করে বিফল হলেন। অফিসার তাঁকে ধরে ফেলেছেন। অর্জুন ওঁর কোমর থেকে রিভলভারটা বের করল। ওটা একটা সার্ভিস রিভলভার, ভদ্রলোক কী করে ম্যানেজ করেছিলেন তা তিনিই জানেন।

মিস্টার কর্মকারকে তাঁর ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। প্রথমে উনি সব অস্বীকার করে যাচ্ছিলেন। এই সময় ফোন বাজল। অর্জুন বলল, "কথা বলুন। কোনও চালাকির চেষ্টা করবেন না।" সে স্পিক ফোনটা অন করতেই শোনা গেল "হ্যালো।"

অর্জুন ইঙ্গিত করতে কর্মকার বললেন, "হ্যালো!"

"তোমার আর এই শহরে থাকার দরকার নেই। দুর্গাপুরেই ফিরে যাও। তুমি এতবড় ইডিয়ট, আমি ভাবিনি। স্টেশনারি দোকানের লোকটা এখন আমার হবে ভেঞ্জার। শুনতে পাচ্ছ?"

হুঁ।

pathagar.net

অর্জুন লাইনটা কেটে দিতেই কর্মকার ভেঙে পড়লেন। তিনি স্বীকার করলেন, শুধু টাকার লোভে মিস্টার রায়চৌধুরীর সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন। অফিসার তাঁকে লালবাজারে পাঠিয়ে দিলেন বিস্তারিত রিপোর্টের জন্যে।

ওরা ব্লু হেভেন হোটেলে পৌঁছলে জানতে পারল আজ সকালে যে ভদ্রলোক ঘর নিয়েছেন তিনি তিনশো তিন নম্বরে আছেন। বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অর্জুন বলল, "অঞ্জনবাবু, আপনি নক করুন।"

অঞ্জন নক করতেই ভেতর থেকে গলা ভেসে এল, "কে?"

"আমি অঞ্জন।"

দরজা খুলে গেল, "তুই! তুই এখানে! কে বলল তোকে এখানে আসতে?"

অর্জুন এগিয়ে গেল। সামনে দাঁড়িয়ে হেসে ফেলল সে, "নমস্কার দেবাঞ্জনবাবু, আপনি যে বড় অভিনেতা, তা স্বীকার না করে উপায় নেই। স্টেশনে খুব বোকা বানিয়েছিলেন আমায়। আমার নাম অর্জুন। আপনার বাবা আমাকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন আপনাকে খুঁজে বের করতে। অন্যের আইডেনটিটি কার্ড কী করে পেলেন? ছবিটাও মিলল কী করে?"

"আপনারা কী চান?" দেবাঞ্জন জানতে চাইলেন।

"মিস্টার সীতানাথ রায়চৌধুরী তাঁর স্ত্রীকে খুন করেছিলেন। সেই খুনের প্রমাণ না রাখতে তিনি একজন ডাক্তার আর পুলিশ অফিসারের সাহায্য নিয়েছিলেন টাকার বিনিময়ে। পুলিশ অফিসার তাঁর অপরাধ স্বীকার করেছেন। আমি জানি না সেই ডাক্তার এখন কোথায়! আপনি জানেন?"

"জানি। তিনি এখন হরিদ্বারে। দিন কুড়ি আগে হঠাৎ তাঁর ফোন পাই। এখন তিনি সাধুর জীবন যাপন করছেন। বিবেকের দংশন হওয়ায় তিনি আমাকে ঘটনাটা জানান। আমি কাউকে না জানিয়ে হরিদ্বারে চলে যাই।"

"সরি। একটা ভুল হল, আপনার স্ত্রীকে জানিয়ে যান।"

"আপনি কী করে জানলেন?"

"জানি। তারপর?"

"সেই ডাক্তার আমাকে সব ঘটনা বলেন। বাবা তাঁকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। বাবার সঙ্গে মায়ের সম্পর্ক ভাল ছিল না। দুর্ঘটনাটা বাবা ইচ্ছে করেই ঘটিয়েছিলেন। নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। তারপর নীচে নেমে গাছের পাশে পড়ে থাকা মায়ের ফেটে যাওয়া মাথায় এমন চাপ

Pathagar.net

দিয়েছিলেন যে ওঁর প্রাণ বেরিয়ে গিয়েছিল। তিনি আবার স্টিয়ারিংয়ে ফিরে এসে অজ্ঞান হওয়ার ভান করেন এবং পরে ডাক্তারকে দিয়ে ঘোষণা করান যে তিনি পঙ্গু হয়ে গিয়েছেন। ডাক্তার নিজের বিবেক পরিষ্কার করতে এসব কথা আমায় বলেন। আপনাকে যে আইডেনটিটি কার্ড দেখিয়েছিলাম সেটা আমার মতো দেখতে ওই ডাক্তারের। যদি কখনও প্রয়োজন হয় তাই আমায় দিয়েছিলেন। আপনি নামটা পড়েননি। আমি এবং আমার স্ত্রী চাই বাবার বিরুদ্ধে মামলা করতে। কিন্তু কীভাবে এগোব বুঝতে পারছি না। দুর্গাপুর থানায় কোনও প্রমাণ পাইনি।" দেবাঞ্জন বললেন।

অর্জুন অফিসারের দিকে ঘুরে দাঁড়াল, "এখন আপনার কাজ। দুই ছেলেকে নিয়ে তাদের বাবার কাছে যান। যিনি পঙ্গু নন তাঁকে দাঁড় করাতে কোনও অসুবিধে হবে না। আর এখন প্রমাণ তো হাতের মুঠোয়।"

অর্জুন টেলিফোন তুলে বোতাম টিপল, "হ্যালো। মিস্টার রায়চৌধুরী, আপনার ছেলেকে নিয়ে আমি আসছি। আমার কাজ শেষ। পারিশ্রমিকটা—!"

"নিশ্চয়ই। হাজার পাঁচেক হলে চলবে?"

"আপনার ছেলের দাম কি মাত্র পাঁচ হাজার?"

"কী বলতে চাইছেন? আপনি নিশ্চয়ই পাঁচ লাখ টাকা আশা করেন না?"

"আশা করতে তো দোষ নেই।"

"ঠিক আছে। আসুন। বউমা, বউমা!" ফোন রেখে দিলেন ভদ্রলোক।

দেবাঞ্জন বললেন, "উনি আপনাকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, কিন্তু ওঁর কাছ থেকে আপনাকে টাকা না নিতে অনুরোধ করছি। ওটা আমরাই আপনাকে দেব। কী বলিস অঞ্জন।"

অঞ্জন বলল, "নিশ্চয়ই।"

অফিসার বললেন, "আপনি যাবেন না ওখানে?"

অর্জুন বলল, "আর আমার যাওয়ার প্রয়োজন নেই।"

সে সর্বেশ্বরের ঠিকানা এবং ফোন নম্বর ওদের দিয়ে দিল।

pathagar.net

সব শুনে সর্বেশ্বর হাঁ হাঁ করে উঠলেন, "আরে মশাই, আপনি কী? ওরকম ক্লাইম্যাক্স দৃশ্যে না থেকে চলে এলেন? উঃ! আমি কল্পনা করছি, সব যখন

সীতানাথ রায়চৌধুরীর সামনে পরিষ্কার হয়ে যাবে তখন তিনি হুইলচেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াবেন। দুটো হাত বাড়িয়ে দেবেন হাতকড়ার জন্যে, অফিসার সেই হাতে হাতকড়া পরিয়ে দেবেন। উঃ। এই দৃশ্যটা দেখার জন্যে ওখানে যাওয়া আপনার উচিত ছিল।"

ঠিক তখনই ফোন বাজল। রিসিভার তুলে সর্বেশ্বরবাবু বেশ বড় করে 'হ্যালো' বলেই যেন চুপসে গেলেন। "ঠিক আছে, ঠিক আছে" বলে ফোনটা ধরে রেখে অর্জুনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "সীতানাথ রায়চৌধুরী একটু আগে আত্মহত্যা করেছেন।"

pathagar.net

শমনন্দন যমনন্দন

pathagar.net

এই শহরে ওই লোকটাকে এর আগে কেউ দ্যাখেনি।

লম্বা, নির্মেদ শরীর, মুখে কাঁচাপাকা দাড়ি, চুল কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে, কপালে লাল পট্টি শক্ত করে বাঁধা, কাঁধে একটা গেরুয়া ঝোলা, পরনে লুঙ্গি এবং তালিদেওয়া আলখাল্লা। লোকটির হাতে একটি একতারা তুলে দিলে বাউল বলে ভাবতে অসুবিধে হয় না।

লোকটি সম্পন্ন মানুষের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে হাঁক দেয়, "বাবা বা মা, কেউ কি কথা বলবেন?"

ঠিক ভিক্ষে চাওয়ার গলা না বলে লোক অবাক হয়। গৃহকর্তা দরজা খোলেনও, "কী চাই ভাই?"

"নমস্কার। আপনি কি আপনার পরলোকগত আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে চান?" খুব সবিনয়ে প্রশ্নটি করে লোকটি।

গৃহকর্তা হকচকিয়ে যান। এরকম প্রস্তাব জীবনে তিনি শোনেননি। তারপরেই তাঁর মনে হয় লোকটি রসিকতা করছে, নয় পাগল! তিনি ধমক দেন, "বাড়ি বয়ে এসে ফাজলামি করা হচ্ছে?"

"না বাবা। আমি অত্যন্ত দায়িত্ব নিয়ে কথা বলছি। আপনার যাঁরা প্রিয় মানুষ ছিলেন, একদা যাঁদের সঙ্গ পেয়েছেন, তাঁরা কে কেমন আছেন যদি জানতে চান তা হলে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি। অবশ্য আপনার আগ্রহ না থাকলে—" লোকটি হাসল।

এই সময় গৃহকর্ত্রীর গলা পাওয়া গেল, "কী বলছে?"

"পাগল। বলছে মৃত মানুষদের সঙ্গে কথা বলিয়ে দেবে।"

"যাঃ।"

pathagar.net

"তা হলে আর শুনছ কী? অনেকরকম হুকার দেখেছি, কিন্তু ভূত-প্রেতের সঙ্গে কথা বলাতে কেউ এর আগে এসেছে বলে শুনিনি।" তারপর গলা তুলে বললেন, "যাও ভাই, অন্য জায়গায় দ্যাখো, এখানে হবে না।" দরজা বন্ধ করে দিলেন ভদ্রলোক।

কিন্তু রায়কতপাড়ার চৌধুরীবাবু প্রস্তাবটা শুনে চোখ পিটপিট করলেন। তাঁর বয়স এখন বাহাত্তর। রক্তে চিনির পরিমাণ বিশ্রী রকমের বেড়ে গেছে, নাড়ির গতি স্বাভাবিক নয়, প্রেশার ভাল রকমের খারাপ। তার ওপর দুটো পা ফুলছে। চব্বিশ ঘণ্টা ওষুধের ওপর থাকতে হচ্ছে। বাইরে বের হওয়া নিষেধ। পৃথিবীর সুখাদ্যগুলো তাঁর আওতার বাইরে। কেবল সকালবেলায় বাড়ির সামনের বাগানে মিনিটদশেক হাঁটতে পারেন। কাজের লোক সঙ্গে থাকে।

লোহার গেটের বাইরে ওই পোশাকের লোকটিকে দেখে মনে করেছিলেন বাউলবেশী কোনও লোক গান শুনিয়ে টাকা নিতে চাইছে। প্রস্তাবটা শুনে হকচকিয়ে গেলেন। তাঁর মনে হল, পৃথিবীতে তিনি আর বেশিদিন নেই। বাপ-ঠাকুর্দারা যেখানে চলে গেছেন সেখানে তাঁকেও যেতে হবে। স্ত্রী গত হয়েছেন তাঁর পঞ্চাশ বছর বয়সে, দুই মেয়েকে তাঁর কাছে রেখে। তাদের বিয়েথা দিয়েছেন তিনি, লোকটি যদি ফেরেব্বাজ না হয় তখন যেখানে যেতেই হবে সেখানকার সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া যেতে পারে। তিনি ভৃত্যকে গেট খুলতে বললেন। লোকটি বাগানে ঢুকে হাতজোড় করল।

চৌধুরীবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় থাকা হয়?"

"যত্রতত্র।"

"তার মানে কোনও নির্দিষ্ট ঠিকানা নেই?"

"না বাবা। সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হতে চেয়েছিলাম। তা সবার তো সব হয় না।"

"নাম কী?"

"শমননন্দন।"

"অ্যাঁ! এরকম নাম তো জীবনে শুনিনি।"

"কী করব বলুন। আমার গুরুদেব দিয়েছেন।"

"তিনি কোথায়?"

"গুরুদেব দেহ রেখেছেন। মানস সরোবরের হিমজলে শায়িত আছে সেই দেহ।"

"মানস সরোবর? বাপ্‌স। সেখানে যাওয়া হয়েছিল নাকি?"

pathagar.net

"হ্যাঁ বাবা। তারই তীরে ছিল গুরুদেবের গুহা। দীর্ঘ বারো বছর সেখানে থেকে তাঁর পদসেবা করেছি।"

"শমননন্দন।"

"হ্যাঁ বাবা।"

"শমন মানে তো, ইয়ে" চৌধুরীবাবু তাকালেন, "শমন শব্দের মানে তো যম।"

"আপনি বিদ্বান ব্যক্তি। বাস্তব জগৎ সম্পর্কে অনেক কিছু জানেন।"

"হুঁ। তা কী বলা হচ্ছিল যেন—!"

"আপনার প্রিয়জনেরা, যাঁরা এই পৃথিবীর মায়া ছেড়ে চলে গিয়েছেন, তাঁদের সম্পর্কে যদি আগ্রহ থাকে তা হলে আমি যোগাযোগের ব্যবস্থা করে দিতে পারি।"

"কী করে?"

"মনঃসংযোগের মাধ্যমে। শুনেছি আলোর থেকে শব্দের গতি বেশি। কিন্তু সব কিছুর থেকে মনের গতি অনেক বেশি। ভাবামাত্রই আপনার মন যে-কোনও জায়গায় চলে যেতে পারে। সাধারণ মানুষ এই পৃথিবীতে মানস ভ্রমণ করতে পারে। গুরুদেবের কৃপায় আমি আপনাকে ইহলোক থেকে পরলোক নিয়ে যেতে পারব না। কিন্তু পরলোকের মানুষকে ইহলোকে আপনার কাছে এনে দিতে পারি।" সুন্দর হাসি হাসল শমননন্দন।

"একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?"

"আমার বিশ্বাস থেকে কথা বলছি বাবা।"

"ভূত-প্রেত যে শুধু গল্পে বেঁচে আছে, তা আজকালকার ছেলেমেয়েরা মানতে চায় না। বিজ্ঞান তাদের ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছে। আর তুমি তাদের টেনে আনবে আমার কাছে?"

"বাবা, আপনি কি বিশ্বাস করেন ভগবান আছেন?"

"অ্যাঁ?"

"করেন তো? যে-সব বিজ্ঞানী ভূতে বিশ্বাস করেন না, তাঁরা তো চার্চ মন্দির মসজিদে প্রার্থনা করতে যান। কিন্তু তাঁরা কি প্রমাণ করেছেন ভগবান আছেন?"

"ভগবান থাকলে ভূতও থাকবে?"

"অবশ্যই। শরীর থাকলে তার ছায়া পড়বে। ভাল থাকা মানে খারাপ থাকা। খারাপ না থাকলে ভালকে কী করে বুঝব? যারা ভূত-প্রেতকে ঝেঁটিয়ে

pathagar.net

বিদায় করেছে তারা ভগবানকেও তাই করুক। দেখবেন, পারবে না। ব্যাপারটা একচোখামি হয়ে যাচ্ছে না!"

চৌধুরীবাবু যুক্তিটা মানতে বাধ্য হলেন, "বলছ?"

"আপনার অনেক সময় নষ্ট করলাম বাবা।"

"আচ্ছা, তখন থেকে লক্ষ করছি তুমি আমাকে বাবা বলছ। কেন?"

"গুরুদেব বলেছেন, যে-কোনও পুরুষকে বাবা বলে সম্বোধন করতে, যে-কোনও নারীকে মা বলতে। আমি তাঁর আদেশ পালন করছি মাত্র।"

"হুঁ। তা তুমি কীভাবে তাঁদের আমার কাছে নিয়ে আসবে?"

"আপনি সম্মত হলে আমি প্রক্রিয়ার কথা জানাব।"

"প্ল্যানচেট?"

"সেটা কী জিনিস বাবা?"

"আমার ঠিক ভাল ধারণা নেই। তবে শুনেছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাকি করতেন।"

"রবীন্দ্রনাথ? ওরে বাবা। তিনি তো মহৎ মানুষ। তিনিও ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করতেন?"

চৌধুরীবাবু একটি বড় শ্বাস নিলেন। মনে ছিল না। সত্যি তো, রবীন্দ্রনাথ যদি বিশ্বাস করতে পারেন তা হলে তিনি কেন করতে পারবেন না? কিন্তু শমননন্দনের মতলব ঠিক বোঝা যাচ্ছে না বলেই মনে কু-ভাবনা আসছে। তাঁকে চুপ করে থাকতে দেখে শমননন্দন জিজ্ঞেস করল, "বাবা, মনে হচ্ছে আপনি আরও কিছু জানতে চাইছেন!"

চৌধুরীবাবু বলেই ফেললেন, "তুমি যে এত পরিশ্রম করবে তার বদলে কী নেবে?"

শমননন্দন চোখ বন্ধ করল। তারপর সলজ্জ হেসে বলল, "বড্ড নোলা বাড়ছে আজকাল। নাঃ, বলেই ফেলি। গুরুদেবের আদেশ, স্বপাকে শরীর ধারণ করবে। ওই দু'বেলা আড়াইশো-আড়াইশো পাঁচশো গ্রাম চাল। তা ধরুন, একটু ভাল চাল হলে দশটা টাকা পড়ে, দু'বেলায় আলু পটল হলুদ নুন তেল নিয়ে ধরুন আরও দশ টাকা। মোট বিশ টাকায় দিব্যি এই শরীর টিকে থাকে। তবে হ্যাঁ, পাক করতে হবে খোলা আকাশের নীচে। সেটা কাঠের আগুনেই শ্রেয়, অন্যথায় কয়লার উনুন!"

চৌধুরীবাবু হতভম্ব হয়ে শুনছিলেন। বললেন, "ব্যস?"

"হ্যাঁ বাবা। ওতেই শরীর সুস্থ হয়ে পরের দিন দেখবে।"

"তার মানে বিশ, অর্থাৎ কুড়ি টাকা তোমাকে দিলেই মিটে যাবে?"

"হ্যাঁ বাবা। আর সঙ্গে একটু হাঁড়ি পাতিল।"

"বেশ, আমি রাজি। তা আমাকে কী কী করতে হবে?"

"একটু শুদ্ধ হয়ে থাকবেন বাবা। বাসি জামাকাপড় পরবেন না। মাছ মাংস ডিম এদিন না খাওয়াই ভাল। তা কখন যোগাযোগ করতে চান?"

"তার নিশ্চয়ই সময় ঠিক করা আছে!"

"না, না। সময় আবার কীসের। যখনই মন চাইবে তখনই সময় হবে।"

"এই যে শুনেছিলাম রাত্রে ওসব হয়, অন্ধকার ভাগে।"

"না, না বাবা। আমাদের এখানে যখন দিনের আলো তখন ওনারা তো আকাশের নানান স্তরে রয়ে গেছেন। দিনরাত ওঁদের কাছে একাকার।" হাসল শমননন্দন।

"অ।" মাথা নাড়লেন চৌধুরীবাবু, "কিন্তু আমি তো এখন তৈরি নই। বাথরুম করা হয়নি। আচ্ছা, দুপুরের পর হয় না? ওইসময় আমার শরীরটা একটু ভাল থাকে।"

"নিশ্চয়ই হয়।"

"তা ভাই শমননন্দন, তোমার বাড়ি কোথায়?"

"পথই আমার ঘর বাবা।" শমননন্দন বলল, "এ নিয়ে আপনি ভাববেন না। আমি ঠিক চলে আসব। যান, আপনি বিশ্রাম নিন।" শমননন্দন নমস্কার করল।

"দাঁড়াও, দাঁড়াও। আমি বলি কী, এ-বেলাটা তুমি এখানে থেকে রান্নাবান্না করে খাওয়াদাওয়া করো। তারপর ধরো, এই তিনটে নাগাদ। বুঝলে তো?"

"সে তো অতি উত্তম কথা। কিন্তু, এত সুন্দর সাজানো বাগান, এখানে রান্না করতে তো সৌন্দর্যের হানি হবে বাবা।"

"না, না। এখানে কেন? খোলা আকাশ চাই তো? বাড়ির ছাদে গিয়ে রান্না করো। ওখানে কল পায়খানাও আছে। ঘর আছে বিশ্রাম নেওয়ার। অসুবিধে হবে?"

"বিন্দুমাত্র নয়।"

চৌধুরীবাবু ধীরে ধীরে বারান্দায় এসে চেয়ারে বসলেন। কাজের লোককে পাঠালেন বনমালীকে ডেকে আনতে। বনমালী তাঁর স্ত্রীর আমলের মানুষ। ভারী কর্মঠ এবং বিশ্বস্ত। মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর সে-ই এই বাড়ি দেখাশোনা করে।

বনমালী এল। ছোটখাটো প্রৌঢ় মানুষ। "ডেকেছেন?"

pathagar.net

"হ্যাঁ। বনমালী, এর নাম শমননন্দন। একে ছাদের ঘরে নিয়ে যাও। পাঁচশো গ্রাম চাল, তেল নুন আলু যা যা চায় সব দাও। একটা কয়লার উনুন ধরিয়ে দিয়ো।" চৌধুরীবাবু গম্ভীর গলায় আদেশ দিলেন।

বনমালী শমননন্দনের আপাদমস্তক দেখল। দেখে জিজ্ঞেস করল, "কী হবে?"

"কী হবে মানে? চাল ডাল দিয়ে মানুষ কী করে?"

"বাড়িতে তো বিরাট রান্নাঘর আছে। ঠাকুরকে বললেই তো হয়।" বনমালী বলল।

"ইনি ঠাকুরের হাতের রান্না খাবেন না।"

বনমালী আবার শমননন্দনের দিকে তাকাল। তারপর জিজ্ঞেস করল। "কী নাম বললেন?"

"শমননন্দন বাবা।" জবাবটা শমননন্দনই দিল।

"এরকম নাম তো বাপের জন্মে শুনিনি। আসুন।"

উত্তেজনায় ঠিকমতো পা পড়ছিল না চৌধুরীমশাইয়ের। বাথরুম থেকে বেরিয়ে একটু টাল খেয়ে শোয়ার ঘরের টেবিলের সামনে চলে এলেন। শমননন্দন যদি গুলবাজ না হয় তা হলে তাঁর অনেকদিনের একটা কৌতূহলের আজ নিবৃত্তি হবে। আয়নার সামনে বসে চুলে চিরুনি বোলালেন। তারপর খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। আয়নায় এ কে? তিনি? প্রায় আশিভাগ চুল খসে গেছে। চোখের তলা ফুলেছে। চিবুকের নীচে তিনটে ভাঁজ। যাকে বলে কদাকার মুখ, এখন তাঁর প্রায় তাই। এই মুখ ওরা চিনতে পারবে? মা গত হয়েছিলেন তাঁর কুড়ি বছর বয়সে। তখন ঝকঝকে যুবক। ওই চেহারা দেখে মা গিয়েছেন। এই চেহারা দেখে যদি মুখ খুলতে না চান! স্ত্রী বলতেন তাঁর চেহারা বয়স বাড়ার পর থেকে নাকি বাবার আদল পাচ্ছে। তাই যদি হয় তা হলে চিনতে বাবার অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। স্ত্রী চিনতে পারবেন বলে তাঁর বিশ্বাস আছে।

"খেয়ে নিন।" বনমালীর গলা।

চৌধুরীবাবু তাকালেন। এক বাটি শুকনো মুড়ি আর এক প্লেট শশা। আজ সকালে এটাই তাঁর জন্য বরাদ্দ। ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে বড় মেয়ে চার্ট বানিয়ে দিয়ে গিয়েছে বনমালীকে। আজ হঠাৎ মনে হয় বনমালী মাইনে নেয়

Pathagar.net

তাঁর কাছ থেকে আর হুকুম শোনে মেয়েদের কাছ থেকে। এ কেমন কথা!

চৌধুরীমশাই বললেন, "বনমালী। একটা কথা রাখবি?"

"কী কথা?"

"চারটে ফুলকো ঘিয়ে ভাজা লুচি আর দুটো সরষের তেলে বেগুন ভেজে দিবি।" করুণ গলায় বললেন চৌধুরীবাবু, "কতকাল খাইনি।"

"আচ্ছা, আপনি কী?"

"কেন?"

"যা আপনার শরীরের পক্ষে বিষ তাই খেয়ে আত্মহত্যা করতে চাইছেন?"

"একদিন তো। একদিন খেলে তেমন কোনও ক্ষতি হবে না।"

"বেশ, বড়দিকে টেলিফোন করি, তিনি কী বলেন দেখি!"

"থাক।"

"একটা কথা জিজ্ঞেস করব বাবু?"

"বল।"

"লোকটা কে?"

"ও, ও একজন সাধু।"

"কীরকম সাধু?"

"খুব বড়। ভগবানের সঙ্গে কথা বলে।"

"আমি কিন্তু ছাদের দরজায় শেকল দিয়ে এসেছি।"

"অ্যাঁ! কেন?"

"যদি চোর-ডাকাত হয়। দিনকাল খারাপ। কিছু বলা যায় না।"

"টের পাবে না তো?"

"না, না।"

অগত্যা মুড়িতে হাত দিলেন তিনি। বনমালী মুড়ি কেনে দেখেশুনে। যাতে একটুও নোনতা না হয়। কী বিস্বাদ। হঠাৎ মনে হল, আত্মারা তো তাঁর শরীরের রোগ দূর করে দিতে পারে!

ব্যাপারটা ভাবতেই বেশ রোমাঞ্চ লাগল। মুড়ি চিবুতে চিবুতে চোখ বন্ধ করলেন তিনি। কাদের ডাকবেন? খুব ছেলেবেলায় ঠাকুর্দাকে দেখেছিলেন। তাঁর হাত ধরে বিকেলে বেড়াতে নিয়ে যেতেন। তারপর বাবা, মা, স্ত্রী, বিনয়। বিনয়ের কথা খুব মনে পড়ে। তাঁর বন্ধু বিনয় ছিল সংসারে প্রায় সন্ন্যাসী। কারও সঙ্গে ওর বিবাদ ছিল না। সেই বিনয় এক রাত্রে তাঁর কাছে এসে একটা সুটকেস দিয়ে বলল, "এটা তোমার কাছে রেখে দাও। হিমালয়ে যাচ্ছি। ফিরে

এসে নেব।" কোনও প্রশ্ন করেননি তিনি। পঁচিশ বছর হয়ে গেল বিনয় ফিরে আসেনি। পাঁচ বছরের মাথায় সুটকেস খুলেছিলেন তিনি। দশ আর একশো টাকার নোটে ঠিক দেড় লক্ষ টাকা ছিল ওতে। বিনয়ের ভাইপোরা ছিল। তারা কাকার কোনও খবর পায়নি। শেষবার তার কথা মনে হয়েছিল একটা খবর পড়ে। কুম্ভমেলায় বাঙালি সাধুর মৃত্যু। বর্ণনা পড়ে মনে হয়েছিল এ বিনয়। আর খোঁজ নেওয়া হয়নি। বিনয় যদি মৃত হয় তা হলে তার সঙ্গে কথা বলা দরকার। সেই দেড় লক্ষ টাকা কবে ফুটকড়াই হয়ে গিয়েছে, কিন্তু বিনয় যদি কাউকে দিতে বলে তা হলে ব্যাঙ্ক থেকে তুলে স্বচ্ছন্দে দিয়ে দিতে পারেন। পরের টাকা ভোগ করার জন্য মনে বেশ খুঁতখুঁতুনি আছে। কাউকে বলাও হয়নি এ-কথা। বিনয়কে যদি লোকটা এনে দিতে পারে তা হলে তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে ওই টাকা কাকে দিতে হবে!

এগারোটার কিছু আগে বনমালী এসে জানাল, "ছাদে উনুন ধরেছে।"

"তাই? স্বপাক আহার। বোধ হয় এই সময় রান্না শুরু করতে হয়। তা এতক্ষণ কী করছিল?"

"জানি না। ঘরেই ছিল। নজর রাখব?"

"কেন?"

"বাইরের লোক। বড়দি বললেন, এমনি করেই বাড়িতে চোর-ডাকাত ঢোকে!"

"এর মধ্যেই বড়কে ফোন করা হয়ে গেছে? তোর আক্কেল বলে কিছু কি নেই?"

"বড়দির হুকুম, দিনে তিনবার ফোন করতে হবে।"

"তা সে কী বলল?"

"বললেন বিকেলে আসবেন।"

"ফোনটা দে। আজ কারও আসার দরকার নেই। নিয়ে আয় রিসিভারটা।"

বনমালী রিসিভার এনে দিল। বোতাম টিপলেন চৌধুরীমশাই। জামাইয়ের গলা। অতএব নিজেকে সংযত করতে হল, "কেমন আছ বাবা?"

"ভাল। আপনার শরীর ঠিক আছে?"

"হ্যাঁ। আজ বেশ ভাল।"

"আমরা অর্জুনকে আপনার কথা বলছিলাম।"

"কে অর্জুন?" জিজ্ঞেস করেই মনে পড়ল, "ওহো! সেই সত্যান্বেষী? সে

pathagar.net

তো তোমাদের বাড়িতে মাঝেমধ্যে আসে। তা আজ এসেছে নাকি?" ভাল লাগছিল না চৌধুরীমশাইয়ের।

"হ্যাঁ। আপনার মেয়ে কথা বলবে।" জামাইয়ের পরে মেয়ের গলা কানে এল, "বাবা, তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে? একটা ধাপ্পাবাজ উটকো লোককে বাড়ির ছাদে তুলেছ?"

"লোকটা যে ধাপ্পাবাজ তা তোকে কে বলল?"

"নইলে তোমাকে পেত্নির সঙ্গে কথা বলিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব করে?"

"পেত্নি! কী যা-তা বলছিস?"

"বাঃ। সে তো মহিলা। মরে গিয়েও যদি আসে তা হলে তো পেত্নি হবে।"

"ছিঃ ছিঃ। নিজের মাকে কেউ পেত্নি বলে? তোর কী অবনতি হয়েছে রে!"

"হোক। বাবা। তুমিও জানো ভূত-পেত্নি, দৈত্য বা রাক্ষস বলে কিছু নেই। বিজ্ঞান এইসব কুসংস্কারকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছে। অথচ ওই লোকটা বিকট সাজগোজ করে তাদের হয়ে হকারি করতে এল। মতলবটা তো বোঝাই যাচ্ছে। ওকে বিদায় করো।" মেয়ে বলল।

"কী করে করব? ও যে এখন রান্না শুরু করেছে। একেবারে সেদ্ধ। অভুক্ত মানুষকে বিদায় করা যায় না। আর এসব নিয়ে তোমরা চিন্তা কোরো না।"

"কিন্তু একবার দেখতে যাব ভাবছি!"

"দেখতে আসবে?"

"হ্যাঁ। তোমার জামাইয়ের আগ্রহ নেই, আমি অর্জুনকে নিয়ে যাব।"

"আশ্চর্য! নিজে আসতে চাইছ এসো, আবার অর্জুনকে আনার কী দরকার!"

"ও বলছিল ওর কীসব দরকার আছে!" বড় মেয়ে বলল।

"কার সঙ্গে?"

"ভূতেদের সঙ্গে।"

Pathagar.net

বনমালীর ওপর খুব রেগে গিয়েছিলেন, আবার বনমালী ছাড়াও তাঁর চলে না। বুকের অসুখের জন্যে তাঁর চারতলা দূরের কথা, তিনতলাতেও ওঠা নিষেধ। সেখানে কী হচ্ছে না হচ্ছে তার খবর তিনি পান বনমালীর মুখে। বনমালী মিথ্যে বললে সেটাই বিশ্বাস করতে হয়। তা ছাড়া তাঁর কখন কী লাগবে সেটা বনমালীর মুখস্থ। ঠিক খেয়াল রাখে। অতএব—।

বেলা বারোটার সময় তিনি দোতলার খাওয়ার টেবিলে এসে বসতেই খাবার নিয়ে এল বনমালী, "ওপরে খাওয়া শুরু হয়ে গেছে।"

"ঠিক দেখেছিস তো?"

"কেন?"

"আহা, অতিথি অভুক্ত থাকলে আমার কি অন্ন গ্রহণ করা উচিত?"

"এক পো চালের ভাত। ফুলেফেঁপে পাহাড়। সব তৈরি করে নিয়ে গেল ঘরের মধ্যে। সেখানেই ছায়ায় বসে তৃপ্তি করে খাবে।" বনমালী বলল।

"খাক। খাক।"

নিজের খাবারে মন দিলেন চৌধুরীবাবু। সেই জলটলটলে ডাল, উচ্ছে সেদ্ধ, আলু ছাড়া একটা তরকারি আর মাছের স্টু। সঙ্গে তিনটি হাতরুটি। এই খেয়ে পৃথিবীতে থাকতে হবে তাঁকে। একটু বাড়তি কিছু চাইলে পাবেন না। মাঝে-মাঝে মনে হয় বাইরের কোনও রেস্টুরেন্টে গিয়ে সাধ মিটিয়ে খেয়ে এলে হয়। কিন্তু সাহস পান না।

খাওয়াদাওয়ার পর ওষুধ খেয়ে বিছানায় এলেন তিনি। চোখ বন্ধ করে ভাবতে চেষ্টা করলেন। ওঃ, কত লোক যে এর মধ্যে মরে গেছে! ঝন্টু, খুব ভাল সেন্টার ফরওয়ার্ড ছিল স্কুলে। রোজ গোল করত। ইন্টারস্কুল খেলতে গিয়ে পেনাল্টি বক্সে ঢুকে হেড করার সময় পড়ে গেল, আর উঠল না। স্কুলের সবাই ওর মৃতদেহ নিয়ে মিছিল করে শ্মশানে গিয়েছিল। শমননন্দন কি সেই ঝন্টুকে ডেকে দিতে পারবে? ঝন্টু এলে বলতে পারত বিপক্ষদলের মারকুটে ব্যাক লুকিয়ে কনুই চালিয়েছিল কিনা। হঠাৎ ঝন্টুর জন্যে তাঁর কষ্ট হল। অথচ পঞ্চাশ বছরের বেশি ছেলেটাকে তাঁর মনেই পড়েনি।

একটু তন্দ্রা এসেছিল, বনমালী ঘুম ভাঙাল।

"কী চাই?"

"আমার কিছু চাই না। ভূতের ছেলে আপনাকে খুঁজছে।"

"ভূতের ছেলে?"

"বড়দি বলল শমননন্দন মানে ভূতের ছেলে!"

"অ। এ কথাটাও বলে দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ রে, তোর পেটে কি কিছুই চাপা থাকে না?"

"মা বলেছিলেন।"

"চুপ কর!"

pathagar.net

"বেশ। আমি গিয়ে বলছি আপনি বিশ্রাম করছেন, এখন দেখা করতে পারবেন না।"

চৌধুরীমশাই ঘড়ি দেখলেন। পৌনে তিনটে বাজে। সময় এসে গেছে। বললেন, "তুই ওপরে গিয়ে ওকে সসম্ভ্রমে এখানে নিয়ে আয়। বলবি ডাক্তারের নির্দেশে আমি ওপরে যেতে পারছি না।"

অনিচ্ছা নিয়ে বেরিয়ে গেল বনমালী। চৌধুরীমশাই উঠলেন। এখন তিনি গেঞ্জি পাজামা পরে রয়েছেন। এই পোশাকে মৃত আত্মাদের সঙ্গে কথা বলা ঠিক হবে না। আলমারি খুলে ভাল ধুতি পাঞ্জাবি বের করে পাশের বাথরুমে ঢুকলেন তিনি। সিল্কের পাঞ্জাবি পরতে গিয়ে একটু লজ্জা করছিল। যাক, মেয়েরা তো এখানে নেই। কাজের লোকজন কে কী ভাবল তাতে কিছুই এসে যায় না।

তার পরেই মনে পড়ল বড় মেয়ের কথা। সে অর্জুনকে নিয়ে আসবে। এই শহরের মানুষ অর্জুনকে নিয়ে বেশ মাতামাতি করে। ছেলেটা মন্দ নয়, কিন্তু বড্ড কৌতূহলী। অন্যের ব্যাপারে নাক গলানো ওর স্বভাব। বড় মেয়ের মুখের ওপর না বলতে তিনি কখনও পারেননি। আসুক সে অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে। তিনি তো আজ কোনও অন্যায় করছেন না।

অর্জুন প্রথমে আসতে চায়নি। দীপকদা তাকে ডেকে খবরটা দিয়েছিলেন। শুনে একটু অবাক হয়েছিল সে। তবে রোজগারের ধান্দায় মানুষ কত নতুন পথে হাঁটছে, যা আগে ভাবা যেত না। দীপকদা বলেছিলেন, "এ দেখছি প্রেতলোকের হকার। বাড়ি বাড়ি ঘুরে হকারি করছে।"

অঞ্জনা বউদির এই ব্যঙ্গ ভাল লাগল না। তাঁর বাবা ওই লোকটাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন যখন, তখন—। তিনি গম্ভীর মুখে বললেন, "তোমাদের স্বভাব হল কোনও বিষয় ভাল করে না জেনেই মন্তব্য করা। কেউ মিথ্যে কথা বলে বাবাকে বুঝিয়ে দেবে আর বাবা সেটা বুঝবে? আমার বাবাকে কী ভাবো তুমি?"

অর্জুন হেসে ফেলল, "বউদির কথায় যুক্তি আছে।"

দীপকদা চোখ বড় করলেন, "এ কী হে! তুমিও ভূতপ্রেতে বিশ্বাস করো নাকি?"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ বললে আমাকে অশিক্ষিত ভাববেন। ভূত আছে

pathagar.net

এমন কোনও প্রমাণ এখনও পাইনি। আবার ভূত নেই এটাও কেউ প্রমাণ করতে পারেনি। মনে আছে একবার একজন একটা কানা কাক, খোঁড়া শকুন আর কালো বেড়াল দিয়ে ভেলকি দেখিয়ে দিয়েছিল।"

অঞ্জনাদি স্বামীকে বলেছিলেন, "অত কথা কী! চলো, আজ বিকেলে ও বাড়িতে যাবে।"

"অসম্ভব। আজ বিন্নাগুড়ি থেকে বিপিনবাবু আসবেন। তুমি ঘুরে এসো।"

"যাবই তো। অর্জুন, তুমি আমার সঙ্গে চলো।"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "আমাকে ছেড়ে দিন। এটা আপনাদের পারিবারিক ব্যাপার।"

"পারিবারিক ব্যাপার মানে?" অঞ্জনাদি ফোঁস করে উঠলেন।

দীপকদা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, "ওই যে আজ যে সব ভূত-পেত্নি তোমাদের বাড়িতে আমন্ত্রিত হয়ে আসবেন তাঁরা হয় তোমার পূর্বপুরুষ, নয় পূর্বমহিলা। সেই অর্থে পারিবারিক ব্যাপার তো বটেই।"

অঞ্জনা বউদির ঠোঁট ফুলে উঠল, "আমি ভেবেছিলাম তুমি যখন সত্যসন্ধানী তখন নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে কৌতূহলী হবে। যাকগে, আমি একাই যাব।"

অর্জুন হেসে ফেলল, "কখন যাবেন?"

"মানে?"

"কিছু কাজ তো নেই, ঘুরেই আসা যাক।"

খুশি হলেন অঞ্জনা বউদি, "যাবে, বাঃ। এই ধরো চারটে নাগাদ।"

"বেশ। চলে আসব। আচ্ছা, লোকটার নাম কী, জানেন?"

"অদ্ভুত নাম। বনমালী অবশ্য ভুলও বলতে পারে। শমনানন্দ।"

"শমনানন্দ?" অর্জুন আওড়াল।

"নামটার মধ্যে সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী গন্ধ আছে।" দীপকদা ফুট কাটলেন।

"ঠিক আছে। আমি একটু খোঁজখবর নিই। দেখি কেউ কোনও হদিস দিতে পারে কিনা।" অর্জুন উঠে পড়েছিল।

মেঝের ওপর গুছিয়ে বসে ছিল শমননন্দন। তার সঙ্গে সম্ভবত দ্বিতীয় পোশাক না থাকায় সে আগের পোশাকেই রয়েছে। উলটোদিকের আসনে বসেছেন চৌধুরীমশাই। তাঁর শরীরে রোমাঞ্চ। শমননন্দন জিজ্ঞেস করল, "যাঁর সঙ্গে কথা বলতে চান তাঁর ছবি সঙ্গে এনেছেন?"

পাশে রাখা অ্যালবাম তুলে ধরলেন চৌধুরীমশাই, "এতে আছে।"

pathagar.net

"কার সঙ্গে কথা বলতে চান এখন?"

"আমার বাল্যবন্ধু বিনয়।"

"কতদিন দেখেননি তাঁকে?"

"পঁচিশ বছর।"

"কীভাবে মারা গিয়েছেন তিনি?"

"আমি ঠিক জানি না। তবে শুনেছি কুম্ভমেলায় মৃত্যু হয়েছিল। তখন তিনি সাধু হয়ে গিয়েছিলেন।"

"স্বাভাবিক মৃত্যু, না অপঘাতে মৃত্যু?"

"আমি ঠিক জানি না।"

"ওঁর ছবি আপনার কাছে আছে?"

"ওঁর একার নেই, ছবিতে আমিও আছি।"

"বেশ, সেটাই বের করুন।"

চৌধুরীমশাই অ্যালবাম খুলে ছবি বের করলেন। সাদা-কালো ছবি, হলদেটে হয়ে এসেছে। দু'জন তরুণ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। নিজের ছবি দেখে তাঁর বেশ ভাল লাগল। তখন খুব স্মার্ট ছিলেন। যদিও এখন তিনি যা হয়েছেন তাতে ছবির সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়।

"এই যে, এটা আমি আর এইটে বিনয়।"

শমননন্দন বিনয়ের ছবি দেখল। তারপর সেটা নীচে রেখে তার ঝুলিতে হাত দিল। ঘরের সবক'টা দরজা বন্ধ, জানলা খোলা। চৌধুরীমশাই দেখলেন একটা জুতোর বাক্সের সমান থার্মোকলের বাক্স বের করল শমননন্দন। সেটাকে সামনে রেখে সে বলল, "আমাদের মাথার ওপর আকাশটা এখন আর মুক্ত নেই এ কথা নিশ্চয়ই জানেন!"

"মুক্ত নেই মানে?"

"চোখে দেখা যায় না কিন্তু সমস্ত আকাশে জাল বিছিয়ে দিয়েছে বিজ্ঞান। সেই জাল ভেদ করে মাটিতে নেমে আসতে খুব অসুবিধে হয় তাঁদের।"

"তোমার কথা আমার বোধগম্য হচ্ছে না।"

শমননন্দন জবাব দেওয়ার আগে বাইরে গাড়ির শব্দ হল। চৌধুরীমশাই বলে ফেললেন, "এই রে! এসে গেছে!"

"কে?" শমননন্দন জিজ্ঞেস করল।

"আমার বড় মেয়ে। খুব কড়া ধাতের। আমাকে প্রচণ্ড শাসন করে।"

"তিনি হয়তো তাঁর মায়ের সঙ্গে কথা বলতে চাইবেন।"

"তোমার মুন্ডু। জামাইটা ঘোর নাস্তিক। তার প্রভাব তো মেয়ের ওপর পড়েছে। ভূতপ্রেতে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই। শোনো, তোমাকে যদি দু'-একটা কটু কথা বলে কিছু মনে কোরো না।"

"যদি চলে যেতে বলেন?"

"যেয়ো। তবে বেশিদূরে নয়। কাছাকাছি ঘাপটি মেরে থেকো। মেয়ে তো বেশিক্ষণ থাকবে না, ওরা চলে গেলেই ফিরে এসো।" চৌধুরীমশাই মাথা নাড়লেন।

"এ তো প্রবঞ্চনা। গুরুদেব এটা করতে আমাকে শেখাননি। অপমানিত হয়ে বেরিয়ে গেলে অগস্ত্যযাত্রা করাই আমাদের নিয়ম।" শমনন্দন বলল।

"অগস্ত্যযাত্রা!"

"মহামুনি অগস্ত্য সেই যে গিয়েছিলেন, আর ফিরে আসেননি।"

শমনন্দনের কথার মধ্যেই বড় মেয়ে অঞ্জনার গলা পাওয়া গেল, "বাবা, বাবাগো, কোথায় গেলে? ও বনমালীদা, বাবা কোথায়?"

চৌধুরীমশাই চাপা গলায় বললেন, "তোমাকে অগস্ত্যযাত্রা করতে হবে না। খারাপ লাগলে ছাদের ঘরে চলে যেয়ো।"

দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। চৌধুরীমশাই উঠে সেটা খুললেন, "আয় মা! জামাই কোথায়?"

"তোমার কি কিছু মনে থাকে না? টেলিফোনে বললাম না?"

"ও। হ্যাঁ। আয়, ঘরে আয়।"

অঞ্জনা ঘরে ঢুকতেই শমনন্দন মুখ তুলে তাকাল। চৌধুরীমশাই দেখলেন দু'জনের চোখ পরস্পরকে দেখছে। নজর সরাচ্ছে না কেউ। যেন সাপে আর বেজিতে লড়াইয়ের আগে মুখোমুখি। শেষপর্যন্ত অঞ্জনার গলা থেকে হালকা শব্দ বের হল, "ইনি?"

"তুই চিনিস না। এখানে থাকিস না তো, চিনবি কী করে? ও শমনন্দন।"

বলামাত্র শমনন্দন হাতজোড় করল, "আসুন মা জননী, আপনাকে দেখে মন পবিত্র হল।"

"কেন? এতক্ষণ কি অপবিত্র ছিল?"

"তা কেন! আমার গুরুদেব মানস সরোবরে স্নান সেরে উঠে বলতেন, আঃ, পবিত্র হলাম। তিনি কি তার আগে অপবিত্র ছিলেন? রোজই তো স্নান করতেন। ওটা মনের আনন্দের প্রকাশ।"

"মানস সরোবর? সেখানে তো মাইনাস ডিগ্রি!" অঞ্জনা আঁতকে উঠল।

pathagar.net

"মৃত্যুর পরে সেখানকার জলে শুয়ে আছেন।" চৌধুরীমশাই ভক্তিভরে বললেন।

"জল সমাধি।"

"চিনারা কিছু বলে না? ওটা তো চাইনিজ টেরিটরি।"

"সাধুদের জন্যে দেবতাত্মা হিমালয়ে কোনও ভাগাভাগি নেই মা।"

"তুই বসে কথা বল, দাঁড়িয়ে আছিস কেন?"

"তোমরা কীসব করছ, বিরক্ত করা কি ঠিক হবে?"

"কোনও অসুবিধে নেই মা জননী। আমার তো কোনও লুকোছাপা নেই।"

অঞ্জনা চিন্তায় পড়ল। তারপর বলল, "কিন্তু নীচে তো অর্জুন বসে আছে।"

"অ। তাকে নিয়ে আসার—, যাক গে, দ্যাখ সে এখানে আসবে কি না।"

বনমালী দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল। অঞ্জনা তাকে বলল অর্জুনকে খবর দিয়ে নিয়ে আসতে।

চৌধুরীমশাই বনমালীর চলে যাওয়া দেখে বললেন, "শমননন্দন। অঞ্জনা যাকে ডাকতে বলল তার সম্পর্কে কিছু কথা বলি—।"

"কেন?" থামিয়ে দিল অঞ্জনা। "আগ বাড়িয়ে কথা বলার দরকার কী তোমার?" তারপর শমননন্দনের দিকে তাকিয়ে বলল, "ও আমার ভাই।"

"বেশ তো। আসুক। মেয়ে থাকলে ছেলে থাকার কী অসুবিধে!"

"ছেলে? না, না। অর্জুন আমার ছেলে নয়।" প্রতিবাদ করলেন চৌধুরীমশাই।

"ঠিক। তোমার ছেলে না হলেও আমার ভাই তো হতে পারে।"

এই সময় অর্জুন উঠে এল ওপরে। দরজায় দাঁড়িয়ে সে শমননন্দনকে দেখল। শমননন্দন হাসল, "এসো বাবা। ওইখানে বোসো। মা, আপনিও বসুন।"

অর্জুন নিঃশব্দে বসে পড়ে জিজ্ঞেস করল, "ভাল আছেন মেসোমশাই?"

"ওই আর কী! এই বয়সে যেটুকু ভাল থাকা যায়। তুমি?"

"আমি ভাল আছি।"

"চাকরিবাকরি?"

"নাঃ, চাকরি করার আর ইচ্ছে নেই। প্র্যাকটিস করে যা পাচ্ছি তাতে তো দিব্যি চলে যাচ্ছে। আপনার নাম শমনানন্দ?"

"আজ্ঞে, না বাবা। শমননন্দন। এবার দরজাটা বন্ধ করে দিলে ভাল হয়।"

pathagar.net

শোনামাত্র বনমালী দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে বিরক্ত মুখে সরে গেল।

শমননন্দন চোখ বন্ধ করল, "এখন থেকে আমার সংকেত না পাওয়া পর্যন্ত আপনারা কেউ কথা বলবেন না, শব্দ করবেন না। বাবা, এই বিনয়বাবু ছাড়া আর কার কার ছবি এনেছেন?"

চৌধুরীমশাই অ্যালবাম থেকে একটা ছবি বের করে সামনে রাখলেন।

ছবিটির দিকে তাকিয়ে শমননন্দন জিজ্ঞেস করল, "এই মা-টি কে?"

"ইনি আমার স্ত্রী, ওঁদের মা।"

"বাঃ। এঁকেই আমরা প্রথম স্মরণ করি। মনে হয় উনি এখানে আসতে আগ্রহী হবেন।" ঝুলি থেকে একটা খাতা আর পেনসিল বের করল শমননন্দন।

"তখন যে-কথা বলছিলাম। বিজ্ঞান এখন আকাশটাকে প্রায় বেঁধে ফেলেছে। কী করে? না, স্যাটেলাইটের মাধ্যমে। হাজার হাজার স্যাটেলাইট প্রতিমুহূর্তে বিজ্ঞানীদের কাছে পৃথিবীর কোথায় কী হচ্ছে তো বটেই, মহাকাশের খবরাখবরও পৌঁছে দিচ্ছে। কোথায় বিলেতে খেলা হচ্ছে আর আমরা তার ছবি টিভিতে দেখছি ওই স্যাটেলাইটের মাধ্যমে। এই জটিলতার মধ্য দিয়ে আত্মাদের পৃথিবীতে নেমে আসতে খুব অসুবিধে হয়। তা ছাড়া সময় যত চলে যায় তত তাঁরা আরও ওপরের স্তরে চলে যান।" থার্মোকলের বাক্সটি সযত্নে সামনে আনল শমননন্দন। এনে বলল, "এর ভেতর একটি ছোট্ট যন্ত্র আছে। আমার এক গুরুভ্রাতা চিনের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। স্যাটেলাইট সংক্রান্ত সমস্ত জ্ঞান তাঁর আয়ত্তে। গুরুদেবের নির্দেশে তিনি এই যন্ত্রটি তৈরি করে তাঁর চরণে নিবেদন করেছিলেন।" শমননন্দন থামল।

অঞ্জনা মুখ ফসকে জিজ্ঞেস করে ফেলল, "চিনে বৈজ্ঞানিক মানস সরোবরে আসতেন?"

"হ্যাঁ মা জননী। প্রতি বছর গ্রীষ্মে তিনি গুরুদেবের আশ্রমে উপস্থিত হতেন। এলাকাটা চিনের বলে তাঁর ভিসা লাগত না। তিনি জন্মসূত্রে বৌদ্ধ হলেও তন্ত্রমতের অনুসারী ছিলেন। বৌদ্ধদের সঙ্গে তন্ত্রের বেশ যোগাযোগ ছিল। এই যন্ত্রটির মাধ্যমে আমরা একটি স্যাটেলাইটের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে পারি।" ঢাকনা খুলল শমননন্দন।

অর্জুন একটু ঝুঁকে দেখল কর্ডলেস টেলিফোনের সাইজের একটা যন্ত্র রয়েছে ভেতরে। তার অ্যান্টেনা টেনে বের করল শমননন্দন। তারপর সুইচ অন করে নব ঘোরাতে লাগল। যেমন করে লোকে রেডিয়োর স্টেশন ধরে, তেমনই করে চলল সে মিনিট আড়াই।

Pathagar.net

শেষপর্যন্ত শমননন্দনের মুখে হাসি ফুটল, "পেয়েছি।"

চৌধুরীমশাই ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন, "ওখানে কোনও প্রাণী নেই?"

বিরক্ত হয়েও সেটা চেপে গেল লোকটা, "আকাশ আর মহাকাশের বর্ডারে ওর অবস্থান, সেখানে প্রাণী থাকার জায়গা কোথায়?"

হঠাৎ যন্ত্র থেকে বিপ বিপ শব্দ বেরোনো শুরু হল।

"যোগাযোগ সম্পন্ন। বাবা, এবার মায়ের কথা ভাবুন, তাঁর মুখ স্মরণ করুন।"

চৌধুরীমশাইয়ের সর্বাঙ্গে যেন কাঁটা ফুটল। তিনি চোখ বন্ধ করে স্ত্রীর মুখ স্মরণ করতে লাগলেন। বিপ বিপ শব্দটা তাঁকে বেশ আরামদায়ক ছন্দ দিচ্ছিল। হঠাৎ যেন মনে হল কেউ, অন্য কেউ ঘরে এসেছে। তিনি দ্রুত জিজ্ঞেস করলেন, "কে?"

সঙ্গে সঙ্গে শমননন্দনের হাতে ধরা পেনসিল চালু হল, খস খস।

"আমি।"

"কে তুমি? নাম বলো!"

"আমি যেতে পারছি না। আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি।"

শমননন্দন হাত তুলে চৌধুরীমশাইকে থামতে বলল, "তুমি এই শব্দ ধরে চলে যাও। ঠিক পৌঁছে যাবে। আমাদের আর বিরক্ত কোরো না।"

কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ। তারপর শমননন্দনের ইশারা দেখে চৌধুরীমশাই আবার স্ত্রীকে প্রশ্ন করলেন, "কে? কে এখানে?"

শমননন্দনের পেনসিল চালু হল, "আমি।"

"কে তুমি?"

"চণ্ড!"

"বুঝতে পেরেছি। সত্যি তুমি এসেছ? আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?"

"আমাদের কোনও অবয়ব থাকে না, তাই দেখতে পাচ্ছ না?"

"ও। এই ঘরে তোমার চেনা আর কাউকে দেখতে পাচ্ছ?"

একটু নীরবতা, তারপর উত্তর এল, "বড় খুকি। খুব মুখ হয়েছে আজকাল।"

অঞ্জনা কিছু বলতে গেলে অর্জুন ইশারা করল চুপ করে থাকতে। চৌধুরীমশাই খুশি হলেন, "এ কথা ঠিক বলেছ।"

pathagar.net

"অবশ্য মুখ না হলে তোমাকে নিয়মে রাখা যেত না।"

"ওখানে বাবা মায়ের সঙ্গে দেখা হয়?"

"তোমার বাবা কোথায় আছেন জানি না, তোমার মাকে দেখতে চাই না।"

"সে কী! কেন?"

"ওঁর ধারণা, আমরা এখনও শাশুড়ি-বউমা। দেখা হলেই গঞ্জনা করেন।"

"এভাবে ডাকলে আবার আসবে তো?"

"বোধহয় না। এবার আমি ওপরের স্তরে চলে যাব। সেখান থেকে নীচে নামতে খুব কষ্ট হবে। আমি আর কষ্ট করতে পারি না।"

"আমাকে কিছু বলার নেই?"

"শরীরে তো অনেক রোগ তোমার, এখন কামনা-বাসনা ত্যাগ করো।"

"বুঝলাম। কিন্তু তুমি যে আমার স্ত্রী, তার কোনও প্রমাণ দিতে পারো?"

"ছিঃ, এত সন্দেহ তোমার? আমি ছাড়া আর কেউ তোমাকে ঢঙ বলেছে?"

"না, বলেনি। তবু—।"

"আমার আলমারির ওপরের তাকের বাঁ দিকে একটা চোরা কুঠুরি আছে। তাতে দু' জোড়া সোনার দুল রেখেছিলাম। বের করে না থাকলে ওই মেয়েকে দিয়ে দিয়ো। এলাম।"

হঠাৎ শমননন্দনের হাত থেকে পেনসিল পড়ে গেল। তাঁর মাথা বুকের ওপর ঝুঁকে পড়ল কিছুক্ষণ। চৌধুরীমশাই বললেন, "তোর মা চলে গেল।"

"আমি বিশ্বাস করি না।" অঞ্জনা বলল, "অর্জুন, তোমার বিশ্বাস হচ্ছে?"

"ভাবছি।" অর্জুন বলল।

"প্রথম কথা, মায়ের গলা আমরা শুনতে পাইনি। এই শমনানন্দ নিজে যা খাতায় লিখেছে তাই বলে গিয়েছে। আমি বাগড়া দেব বলে বলেছে আমার বড় মুখ হয়েছে।" অঞ্জনা বেশ তেতে উঠেছিল।

শমননন্দন ক্রমশ সোজা হল। যন্ত্রটা শব্দ করেই চলছিল। হাত বাড়িয়ে সেটা বন্ধ করল। তারপর খাতাটা চৌধুরীমশাইয়ের দিকে বাড়িয়ে দিল।

চৌধুরীমশাই সাগ্রহে সেটা টেনে নিয়ে পড়তে লাগলেন। কয়েক লাইন পড়ার পর তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, "এ কী! এ তো তোর মায়ের হাতের লেখা। হুবহু এক।"

"বাঃ, লিখলেন তো উনি, মা লেখেননি।" অঞ্জনা প্রতিবাদ করল।

pathagar.net

"কিন্তু তার লেখা, আমি হলফ করে বলতে পারি।" চৌধুরীমশাই উত্তেজিত।

"তা হলে ইনি মায়ের হাতের লেখা জোগাড় করে লেখা প্র্যাকটিস করে এসেছেন। এই বিজ্ঞানের জগতে এসব কথা বললে লোকে হাসবে বাবা।"

শমননন্দন এতক্ষণে কথা বলল, "মা জননী, এই যন্ত্রটা তো বিজ্ঞানেরই দান।"

"হ্যাঁ, যন্ত্র দিয়ে স্যাটেলাইটের সঙ্গে কানেকশন করে আত্মাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার মতো কষ্টকল্পনা আপনার আগে কেউ করেনি।"

"কেন মা জননী? স্যাটেলাইটের মাধ্যমে যদি মঙ্গলগ্রহের ছবি তুলে আনা সম্ভব হয়, তা হলে তার অনেক কাছের আত্মাদের কাছে কেন পৌঁছনো যাবে না?"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনার যন্ত্রটি একবার দেখতে পারি?"

"নিশ্চয়ই বাবা। তবে এখনই ওকে চালু করবেন না।" এগিয়ে দিল বাক্সটা শমননন্দন।

অর্জুন দেখল যন্ত্রটিকে। হালকা প্লাস্টিকের বাক্সের মধ্যে মিনি টিভির মতো সাউন্ডবক্স এবং ডিশ অ্যান্টেনা রয়েছে। জিনিসটা মহাকাশ গবেষণাকেন্দ্রে পাঠালে তারা বিশ্লেষণ করে বলতে পারত। আর যাই হোক এটা নেহাতই খেলনা নয়, যথেষ্ট দামি এবং ব্যবহার করার জন্যে সরকারের অনুমতি প্রয়োজন হবেই। নইলে এর মাধ্যমে প্রতিবেশী শত্রু রাষ্ট্রের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে খবরাখবর বিনিময় করা মোটেই অসম্ভব নয়।

অর্জুনকে মনোযোগের সঙ্গে যন্ত্রটি দেখতে দেখে বিরক্ত হলেন চৌধুরীমশাই। তাঁর মনে হল, এখানেও গোয়েন্দাগিরি করছে ছোকরা। বড় মেয়ে যে কেন ওকে নিয়ে এল! তিনি বললেন, "ভাই শমননন্দন, ও এত কম কথা বলে গেল যে, মন ভরল না। আমি আমার মায়ের সঙ্গে কথা বলতে পারি?"

"আপনি তা হলে বিশ্বাস করছেন যে আত্মার সঙ্গে কথা বলা যায়?"

"আমি কে? আমি তো ছার, স্বয়ং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্ল্যানচেটে বসতেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে মৃত আত্মীয়রা আসতেন। তুমি কি এ-কথা জানো অর্জুন?" প্রশ্নটার মধ্যে একটু ঠেস দিলেন চৌধুরীমশাই।

"হ্যাঁ, আমি পড়েছি।" যন্ত্রটা ফিরিয়ে দিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, "মাসিমার আলমারি এখন কী অবস্থায় আছে?"

অঞ্জনা বলল, "যেমন ছিল তেমনই পড়ে আছে। আমরা কোনও জিনিস নিইনি।"

"আপনি খুলেছিলেন?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"না। তিনি বেঁচে থাকতেই খুলিনি, মারা যাওয়ার পর খোলার ইচ্ছে হয়নি।"

"তা হলে অঞ্জনাদি, একবার দেখে আসতে পারো, তোমার মা এসে যা বলে গেলেন তা সঠিক কি না। ওখানে দুল থাকলে তা এঁর পক্ষে জানা সম্ভব নয়।" অর্জুন বলল।

অঞ্জনা জিজ্ঞেস করল, "মায়ের আলমারির চাবি কোথায় আছে?"

"যেখানে থাকে।" চৌধুরীমশাই বললেন।

অঞ্জনা অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। চৌধুরীমশাই বললেন, "তা হলে—?"

"না। এই তো, হয়ে গেল। আমি বলেছিলাম কথা বলিয়ে দেব, দিয়েছি।"

"আহা, তুমি রাগ করছ কেন? আমার তো অনেকের সঙ্গে কথা বলা দরকার।"

"না বাবামশাই, অবিশ্বাসী আর প্রতিকূল আবহাওয়ায় তাঁদের আসতে খুব অসুবিধে হয়। তা ছাড়া ওঁদের যাওয়া-আসার কারণে আমার শরীর মনে খুব চাপ পড়ে। একদিনে বেশি চাপ নেওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।" শমননন্দন বলল।

"তা হলে অবশ্য—! এ কথা কিন্তু তুমি আগে বলোনি।"

"বেশ। দ্বিতীয়জনের কথা ভাবুন। তিনি এলে বেশিক্ষণ ধরে রাখবেন না। আর চলে যাওয়ার পর আমার সঙ্গে কথা বলবেন না। আপনারা আমাকে এই ঘরে একা রেখে চলে যাবেন। আমার আচ্ছন্ন ভাব কাটতে অনেক সময় লাগবে।" শমননন্দন বলল।

"তা হলে শুরু করি। আমি আমার মায়ের কথা ভাবছি।" ছবিটার দিকে তাকিয়ে চোখ বন্ধ করলেন চৌধুরীমশাই। সুইচ অন করে যন্ত্রের নব ঘোরাতে লাগল শমননন্দন। কিছুক্ষণ বাদে বিপ বিপ শব্দ শুরু হল। চৌধুরীমশাইয়ের মনে হল কেউ এসেছেন। তিনি ব্যাকুল গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "কে? কে এসেছ?"

"তোর বউ তো এখানে এসেছিল! আগে বউকে ডাকলি?"

"মা, মা তুমি এসেছ।" চৌধুরীমশাই একেবারে ছেলেমানুষ হয়ে গেলেন।

"তা কী বলে গেল সে?"

"কিছুই তেমন বলেনি, আর হয়তো আসতে পারবে না।"

"তা আসবে কেন? ওপরে ওঠার জন্যে ছটফট করছে। আমার নিন্দে করেনি?"

"মা, তুমি যেখানে গিয়েছ সেখানেও কি পৃথিবীর নিয়ম চলে?"

"না। ওখানে অন্য নিয়ম।"

"তা হলে তুমি এ নিয়ে চিন্তা কোরো না। বাবার সঙ্গে দেখা হয়?"

"না।"

"আমাদের কথা কি তোমার মনে পড়ে মা?"

"পড়ে।"

"বড়মাসি মেজোমাসির সঙ্গে খুব গল্প করো, না?"

"না। তুই যখন আসবি তখন তোর কাছে থাকার চেষ্টা করব। আচ্ছা, চলি।"

"মা, কিছু বলে যাও।"

"তোর ছোট মেয়ে খুব অসুখে ভুগছে, তাকে এখানে নিয়ে আয়।"

শমননন্দনের মুখ থেকে কথাটা বের হওয়ামাত্র তার হাতের পেনসিল পড়ে গেল। মাথা ঝুঁকে পড়ল বুকের ওপর। কোনওমতে ডান হাত কাঁপতে কাঁপতে সুইচ টিপে শব্দ বন্ধ করতেই তার শরীর একপাশে পড়ে গেল।

চৌধুরীমশাই উঠে দাঁড়ালেন, "এ কী হল?"

অর্জুন এগিয়ে এসে নাড়ি দেখল, "খুব দুর্বল। উনি তো বলেছেন, এখন ওঁকে বিরক্ত না করতে। আপনি আপনার মায়ের হাতের লেখা চেনেন?"

"না, ঠিক মনে নেই।"

"চলুন, আমরা অন্য ঘরে যাই।"

"মরে যাবে না তো বাবা?"

"মনে হয় না। আপনার শরীর ঠিক আছে?"

"হ্যাঁ। আমি ভাল আছি। উঃ, আমি ভাবতেই পারছি না যে, মায়ের সঙ্গে কথা বললাম।"

"কিন্তু গলার স্বর শমননন্দনের, হাতের লেখাও তার। মানে, আপনার মায়ের আসার কোনও প্রমাণ আপনি পাননি।" বলতে বলতে বাইরে বেরিয়ে এল অর্জুন।

চৌধুরীমশাই দরজা বাইরে থেকে ভেজিয়ে দিয়ে বললেন, "কিন্তু কথা

pathagar.net

বলার ধরন তো অবিকল মায়ের মতো। মা ওইরকম ঠুকে ঠুকে কথা বলতেন।"

এই সময় অঞ্জনাকে বেশ বিপর্যস্ত অবস্থায় আসতে দেখা গেল, "আমি আলমারির আগাপাস্তলা খুঁজে দেখলাম। অনেক অদ্ভুত জিনিস পেয়েছি কিন্তু দু' জোড়া তো দূরের কথা, একটাও দুল পাইনি।"

"সে কী।" চৌধুরীমশাই চমকে উঠলেন।

"হ্যাঁ বাবা, লোকটা বুজরুক। তোমাকে ঠকিয়ে টাকা রোজগার করতে এসেছে।"

"কিন্তু টাকার কথা তো এখনও একবারও বলেনি।"

"বলবে। তোমার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েই বলবে।"

"কিন্তু তোর ঠাকুমাকে যে একটু আগে এনে দিল—।"

"আবার ঠাকুমা? ওঃ বাবা, তুমি বুঝতে পারছ না কেন যে, লোকটা প্রতারক। ওকে এখনই ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বের করে দাও।" অঞ্জনা খুব উত্তেজিত।

অর্জুন হেসে ফেলল, "এই মুহূর্তে সেটা সম্ভব নয়, কারণ লোকটি অজ্ঞান হয়ে রয়েছে। ঠিক অজ্ঞান হয়তো বলা যায় না, কিন্তু ওঁর শরীরে কোনও শক্তি নেই।"

ওরা বসার ঘরে এল। অঞ্জনা বনমালীকে ডেকে শমননন্দনের বন্ধ দরজায় পাহারায় বসিয়ে দিল। সোফায় বসে অঞ্জনা বলল, "তোমার মাথা একদম খারাপ হয়ে গিয়েছে বাবা।"

"কেন?" চৌধুরীমশাইয়ের মেজাজ গরম হল।

"একটা অশিক্ষিত লোক স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ধরে ধরে আত্মা আনছে। তুমি এটা বিশ্বাস করছ। ভেবে দ্যাখো তো, সেই আদম-ইভের আমল থেকে যত মানুষ মরেছে, তাদের আত্মারা যদি আকাশে ঘুরে বেড়ায় তা হলে আকাশের অবস্থা কী হবে?"

"বিশ্বাস মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর। যিশু খ্রিস্টকে কবর দেওয়ার সময় তাঁর শরীরে প্রাণ ছিল না। তবু তিনি কবর থেকে উঠে এসেছিলেন। খ্রিস্টানরা নিশ্চয়ই অশিক্ষিত নয়? কেউ মারা গেলে তার শ্রাদ্ধ করা হয়। কেন করা হয়? না, আত্মার সদ্গতির জন্যে। তার মানে আত্মা আছে, নইলে সদ্গতির কথা ভাবা হবে কেন?" চৌধুরীমশাই বললেন।

"তোমাকে সত্যি লোকটা সম্মোহিত করেছে বাবা। অর্জুন, তুমি কিছু বলো!" অঞ্জনা বলল।

অর্জুন বলল, "এখন পর্যন্ত মাসিমার হাতের লেখা ছাড়া কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অনেক মানুষ আছেন যাঁরা ভূতপ্রেতে বিশ্বাস করেন না কিন্তু আত্মায় করেন। তা হলে সাধুসন্ন্যাসীদের ব্যাপারটাকে ভণ্ডামি বলে উড়িয়ে দিতে হয়। কিন্তু আমরা, সাধারণ মানুষরা প্রমাণ চাই। আচ্ছা, তুমি তোমার বোনকে একটা ফোন করো তো! উনি কোথায় আছেন?"

"এখন আদ্রাতে আছে। ওর বর রেলের বড় অফিসার।"

"ওঁকে টেলিফোনে জিজ্ঞেস করো এখন কেমন আছেন?"

"ওমা, হঠাৎ ওকে জিজ্ঞেস করব কেন?"

"তোমার সঙ্গে ওঁর শেষ কবে কথা হয়েছে?"

"মাসতিনেক আগে।"

"তা হলে তো করতেই পারো।"

অঞ্জনা উঠে দাঁড়াল, "কী যেন কোড নাম্বারটা—!"

চৌধুরীমশাই বললেন, "জিরো থ্রি টু ফাইভ ওয়ান—"

অঞ্জনা ডায়াল করল, "হ্যালো, কে? রঞ্জনা আছে? ও, ওকে ফোনটা দাও।" একটু চুপচাপ, তারপরে, "কী রে, এই অসময়ে শুয়ে আছিস। অ্যাঁ? কবে থেকে? আমাদের জানাসনি কেন?"

চৌধুরীমশাই উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে?"

"ওর জন্ডিস হয়েছে।" অঞ্জনা রিসিভার থেকে মুখ সরিয়ে জবাব দিল।

"দাও, রিসিভারটা আমাকে দাও।" হাত বাড়ালেন চৌধুরীমশাই। কর্ডলেস রিসিভারটা এনে দিল অঞ্জনা। চৌধুরীমশাই ব্যস্ত গলায় বললেন, "মা, তুমি কেমন আছ এখন? ওহো! তা আমাকে একটা ফোন করবে তো! আরে, আমার শরীর খারাপ মানে কি বিছানায় পড়ে আছি! স্বপন কোথায়? বাড়িতে নেই? ওহো! ওকে বলবে আজই রাতের ট্রেন ধরে তোমাকে নিয়ে যেন চলে আসে। আমি কোনও অজুহাত শুনতে চাই না। সে বাড়িতে ফিরলেই যেন আমাকে ফোন করে। রাখছি।"

টেলিফোন অফ করে বিড়বিড় করলেন তিনি, "আশ্চর্য! বউ অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে, আর উনি অফিসে গিয়েছেন।"

অঞ্জনা বলল, "চাকরিটা বাঁচাতে হবে তো!"

অর্জুন চুপচাপ শুনছিল। এবার বলল, "সমস্যা বাড়ল।"

অঞ্জনা জিজ্ঞেস করল, "কেন?"

pathagar.net

"শমনন্দনের আনা আত্মা বলেছেন যে, তোমার বোন অসুস্থ। তাকে নিয়ে আসতে।"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "ব্যাপারটা কাকতালীয় হতে পারে।"

"অথবা লোকটা ওর অসুস্থতার খবর নিয়েই এই বাড়িতে এসেছে।"

"হয়তো। মেসোমশাই, আপনি মাসিমার আলমারিটা একবার দেখুন তো। অঞ্জনাদির ভুল হতে পারে।"

অঞ্জনাদি অবাক, "কী বলছ তুমি! আমি তন্নতন্ন করে খুঁজলাম, পেলাম না। আর বাবা পেয়ে যাবে?

"হয়তো পাবেন না। কিন্তু আর একবার চেক করে নিলে দোষ কী!" অর্জুন বলল।

"তার মানে তোমার মনে ওই লোকটার ওপর অনেকটা আস্থা এসে গিয়েছে!"

"কীরকম?"

"যেহেতু রঞ্জনার ব্যাপারটা ও মিলিয়ে দিয়েছে, তাই তোমার মনে হচ্ছে আলমারিতে ওই দু' জোড়া দুল থাকা দরকার। তাই না?"

"থাকলে শমনন্দনের বিরুদ্ধে যুক্তি দাঁড় করানো মুশকিল হবে।"

"ঠিক আছে, তুমি গিয়ে দ্যাখো।" অঞ্জনা তার বাবাকে বলল।

চৌধুরীমশাই মাথা নাড়লেন, "তুইও চল।"

অঞ্জনা বলল, "অর্জুন, তা হলে তুমি একটু অপেক্ষা করো।"

ওরা চলে গেল। সোফায় বসে অর্জুন সামনের দেওয়ালের দিকে তাকাতে একটা বাংলা ক্যালেন্ডার দেখতে পেল। আজকাল কেউ এই ক্যালেন্ডারের দিকে তাকায় না। মা-মাসিরা এককালে অমাবস্যা পূর্ণিমা দেখতেন। সে উঠে ক্যালেন্ডারটার কাছে গেল। গোল গোল দাগের মধ্যে বিশিষ্ট দিন নির্দিষ্ট করা আছে। একটা দিন প্রেত-চতুর্দশী। মানে কী? ওই চতুর্দশীতে ভূতেরা আসা-যাওয়া করে নাকি? হিন্দুরা অজান্তেই আত্মা মেনে নিয়েছে। ক্যালেন্ডারেও তাকে জায়গা দিয়েছে।

কিন্তু অমল সোমকে সে যদি এসব কথা বলে, তা হলে তিনি যে খুব অবাক হয়ে তাকাবেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। হয়তো বলেই বসবেন তোমার আর এ বাড়িতে আসার দরকার নেই। রবীন্দ্রনাথের দোহাই দিয়ে পার পাওয়া যেত না। অলৌকিক বলে কিছু নেই বলে প্রায় আন্দোলন চালাচ্ছেন যাঁরা, তাঁরা তাকে অশিক্ষিত ভাববেন। সেটাই স্বাভাবিক। এই যে আফগানিস্তানে

pathagar.net

মার্কিন আর ব্রিটিশ সেনাবাহিনী মিলে অজস্র বোমা বর্ষণ করে গেল, তাতে সাধারণ মানুষের সঙ্গে তালিবানরা মারা গিয়েছে প্রচুর। কিন্তু বোমাগুলো, নানান ধরনের শক্তিশালী বোমা যখন আকাশ থেকে পড়ছিল তখন সেখানে যেসব আত্মা ঘুরছিল তারাও ধ্বংস হতে বাধ্য। আফগান মানুষ যে বোমা এড়াতে পারেনি আফগানি আত্মা তা কী করে এড়াবে!

এখন শমননন্দন লোকটিকে নিয়ে ভাবা যাক। এই শহরে এরকম মানুষকে কেউ আগে দেখেনি। সে দরজায় দরজায় গিয়ে প্রস্তাব দিয়েছে আত্মার সঙ্গে কথা বলিয়ে দিতে পারে। কেন? এতে ওর লাভ কী? শমননন্দন কোনও টাকাপয়সা চায়নি! শুধু আজকের দিনটার জন্যে তাকে আতিথ্য দিয়েছেন চৌধুরীমশাই। এই সামান্য পাওয়ার বিনিময়ে লোকটা এত বড় প্রস্তাব করবে কেন? যদি ওর কথা ভাঁওতা না হয়, তা হলে কেউ করে? আর এই কাজের জন্যে লোকটা যে কী পরিমাণে অসুস্থ হয়ে পড়েছে সেটা তো চোখের ওপর দেখে এল।

দ্বিতীয়ত, বাড়ি বাড়ি ঘুরে প্রস্তাব দেওয়ার ব্যাপারটা কতটা সত্য? এর আগে কোন বাড়ির মানুষ ওর সাহায্য নিয়েছে তা জানা দরকার।

উলটোদিকে, শমননন্দনের পক্ষে চৌধুরীমশাইয়ের বহু আগে মৃত স্ত্রীর হাতের লেখা জোগাড় করে মনে রাখা কি সম্ভব? সেটা না দেখে কি অত লাইন কেউ লিখতে পারে? রঞ্জনার ব্যাপারটা না হয় সে খোঁজখবর নিয়ে আসতে পারে। ধন্দটা এখানেই। অবশ্য আলমারিতে দুল পাওয়া যায়নি। এটা অলৌকিকত্বের দাবি নস্যাৎ করার পক্ষে যথেষ্ট।

ওঁরা ফিরে এলেন। বিজয়িনীর মতো অঞ্জনা বলল, "নেই। ওপরের দিকে একটা গোপন লকার ছিল, যা আমি বুঝতে পারিনি, বাবা দেখল সেখানেও নেই। আমি গোড়া থেকেই বলে আসছি লোকটা বুজরুক। বাবা, ওকে চলে যেতে বলো।"

চৌধুরীমশাইয়ের হাতে একটা খাম ছিল। সেটা থেকে একটা ভাঁজ করা পাতা বের করে খুলে বললেন, "তোর মা যখন শেষবার বাপের বাড়িতে যায় তখন আমাকে এই চিঠি লিখেছিল। ওঁর আজকের হাতের লেখার খাম মিলিয়ে দ্যাখ, একটা অক্ষরও আলাদা বলে মনে হবে না। আমার শুধু আর-একটা কথা জানার ইচ্ছে আছে—।"

"কিন্তু মেসোমশাই, এখন ওর শরীরের যা অবস্থা, ওর পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়। তা ছাড়া ওই শরীর নিয়ে ওকে বাইরে বের করে দেওয়াও উচিত

pathagar.net

নয়। আপনার যখন আর-একটা প্রশ্নের উত্তর জানার আগ্রহ আছে, তা হলে প্রেত-চতুর্দশী পর্যন্ত ওকে এখানে আটকে রাখুন।"

"ভূত-চতুর্দশী?" অঞ্জনা অবাক!

"হ্যাঁ, ওইদিন নাকি প্রেতলোকে বেশ হইচই পড়ে যায়।"

"অর্জুন।" চিৎকার করে উঠল অঞ্জনা।

"বলো।"

"তুমি, তুমি, তুমি নিজেকে সত্যসন্ধানী বলো, কী কথা তোমার মুখে! ছি!"

অর্জুন হাসল, "আমাদের কয়েকটা প্রাথমিক উপদেশ মনে রাখতে হয়। কেউ যেমন সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়, তেমনই প্রথম থেকেই কারও সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পোষণ করবে না।"

এই সময় বনমালী এসে ফিসফিস করে জানাল, "শুয়ে পড়েছে। একেবারে চিত হয়ে শুয়ে পড়েছে।"

চৌধুরীমশাই বললেন, "ডাক্তারকে একবার টেলিফোন করা উচিত।"

অর্জুন বলল, "আমি একবার দেখে আসতে পারি?"

"নিশ্চয়ই। তোমার কুণ্ঠার কোনও কারণ নেই। আচ্ছা, প্রেত-চতুর্দশী কবে?"

"ওই তো, ক্যালেন্ডার দেখুন। আর দু'দিন পরেই।"

চৌধুরীমশাই ক্যালেন্ডারের দিকে এগিয়ে যেতে অর্জুন অঞ্জনার দিকে তাকাল। ভদ্রমহিলা খুব রেগে গেছেন তার ওপর। সে আর একটু তাতাবার জন্যে বলল, "তুমি রামকৃষ্ণদেবকে মানো অঞ্জনাদি?"

"আশ্চর্য! বোকা বোকা কথা না এটা?"

"সেই রামকৃষ্ণদেব বিবেকানন্দকে মা কালীর সামনে স্পর্শ করা মাত্রই বিবেকানন্দের শরীরে বিদ্যুৎতরঙ্গ প্রবাহিত হয়েছিল। এটা কী করে সম্ভব?"

"ঠাকুর দেবতাদের সেই ক্ষমতা ছিল। কার সঙ্গে কার তুলনা করছ?"

"আমি তুলনা করছি না। বিজ্ঞানের কর্তব্য হল দুটোকেই সমানভাবে বিচার করা। আমাদের ঠাকুরদেবতাদের বিচার করতে বিজ্ঞান এগিয়েছে কি না তা আমি জানি না।"

হঠাৎ চৌধুরীমশাইয়ের খেয়াল হল। তিনি বললেন, "আশ্চর্য! তুই তখন থেকে কথাই বলে যাচ্ছিস। অর্জুনকে কিছু খেতে দিলি না?"

"না, না। আমার একটুও খিদে পাচ্ছে না। আমি আসছি।"

অর্জুন বনমালীকে ইশারায় চলে যেতে বলে দরজা খুলে ঘরে ঢুকল।

Pathagar.net

শমননন্দন তখনও পাশ ফিরে শুয়ে আছে, চোখ বন্ধ। নিশ্বাস প্রায় স্বাভাবিক। অর্জুন তার পাশে হাঁটু মুড়ে বসল। থার্মোকলের বাক্সে রাখা যন্ত্রটা যদি কোনও বিশেষজ্ঞকে দেখানো যেত!

বনমালী তখনও দরজায় দাঁড়িয়ে এদিকে তাকিয়ে আছে। অর্জুন বলল, "এক গ্লাস জল এনে দাও।"

জল এল। অর্জুন একটু একটু করে শমননন্দনের মুখে ছড়িয়ে দিতে লাগল। একটু পরেই চোখের পাতা কাঁপতে লাগল। লোকটার চৈতন্য ফিরে আসছে। শেষতক চোখ খুলেই উঠে বসল সে, "আমি, আমি—।"

"আপনি আর-একটু শুয়ে থাকুন। আপনি অসুস্থ।"

"হ্যাঁ। মাথাটা—।"

হঠাৎ বনমালী বলল, "ছাদের ঘরে গেলে হয়। ওখানেই তো সারা দুপুর ছিল।"

সঙ্গে সঙ্গে শমননন্দন মাথা নাড়ল, "সেই ভাল। খোলা আকাশের নীচে শুলে শরীর ঠিক হয়ে যাবে। আচ্ছা, এখন ক'টা বাজে?"

"সন্ধে হয়ে গেছে।" অর্জুন জবাব দিল।

"তা হলে কি আর ওপরে ওঠা ঠিক হবে?"

অর্জুন বলল, "হবে। কারণ এই বাড়ির কর্তা আরও কিছু জানতে চান। উঠুন। আপনাকে আমরা দু'দিকে ধরছি।" ওঠার আগে শমননন্দন তার ঝোলায় যন্ত্রটি ঢুকিয়ে নিতে ভুলল না।

অঞ্জনা তার বাবাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিল যে, তিনি তাদের অনুপস্থিতিতে শমননন্দনের মাধ্যমে আত্মার সঙ্গে কথা বলবেন না। লোকটা যখন সত্যি সত্যি অসুস্থ তখন আজকের রাতটা না হয় ছাদের ঘরে থাক। কাল চলে যেতে হবে ওকে।

চৌধুরীমশাই মুখ শুকিয়ে বললেন, "কিন্তু গোটা রাত লোকটা না খেয়ে থাকবে? ও তো নিজের হাতের রান্না ছাড়া খায় না। আজ তো সেটা পারবে না।"

অঞ্জনা গম্ভীর গলায় বলল, "একটা রাত না খেলে কোনও মানুষ মারা যায় না।"

অঞ্জনাকে নামিয়ে দিয়ে অর্জুন যখন কদমতলায় এল, তখন সন্ধে সাতটা। জলপাইগুড়ি শহরের রাস্তাঘাট এখন বেশ চওড়া হয়েছে। মোড়ে মোড়ে লাল-সবুজ-হলুদ বাতি বসেছে। মানুষজন আর আগের মতো সাততাড়াতাড়ি

pathagar.net

বাড়ি ফিরে যাচ্ছে না। ফলে মোড়ে বেশ ভিড়। অর্জুনের নজর পড়ল ফুলের দোকানের ওপর। মানিব্যাগ খুলে টাকা দিচ্ছেন সৌমেনবাবু। দু'-একবার এসেছেন অমল সোমের কাছে, তখন আলাপ হয়েছিল। ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বললে ভাল লাগে।

সে এগিয়ে গেল। সৌমেনবাবু ঘুরে দাঁড়াতেই তাকে দেখতে পেলেন, "আরে। কী খবর?"

"আপনি ভাল আছেন?" অর্জুন হাসল।

"ওই আর কী। তোমার দাদার মতো স্বাধীনতা তো আমার নেই, তাই সংসারের কর্তব্য করছি।"

"ফুলের দোকানে কেন?"

"ভাইয়ের মেয়ের বিয়ে। তাই অ্যাডভান্স দিয়ে গেলাম। দাদার কোনও খবর আছে?"

"না।"

"আমি একটা চিঠি পেয়েছিলাম মাসছয়েক আগে। আলমোড়া থেকে লেখা।"

"অনেকে বলেন অমলদা সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন।"

"না হে। ওঁর মতো যুক্তিবাদী মানুষ সন্ন্যাসী হতে পারেন না।"

"কেন?"

"সন্ন্যাসী হতে হলে মনের সবরকম ধন্দ চুকিয়ে ফেলে ঈশ্বরে সমর্পিত হতে হয়।"

"আপনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন?"

"প্রকৃতিকে যদি ঈশ্বরের সৃষ্টি ভাবি, তা হলে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করি।"

"কিন্তু সেই ঈশ্বর তো নিরাকার।"

"তাতে কী এসে গেল। একজন কেউ আছেন যিনি আমার মঙ্গল চান, এটা ভাবতে মনে বেশ তৃপ্তি আসে।" সৌমেনবাবু হাসলেন।

"আপনি আত্মায় বিশ্বাস করেন?"

"করতে ইচ্ছে হয় না।"

"কেন?"

"আত্মা মানুষকে তৃপ্তি দেয় না, তাই।"

"কিন্তু কোনও প্রমাণ পেয়েছেন?"

"না। অভেদানন্দের একটি বই পড়ে মনে হয়েছিল আত্মা আছে।

pathagar.net

রবীন্দ্রনাথও পরলোকে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু মানুষের সভ্যতার যে ক্রমবিবর্তন তাতে এইসব পারলৌকিক অস্তিত্বের কোনও প্রমাণ নেই। রবীন্দ্রনাথ নিজে সারাজীবনে যে বিপুল লেখা লিখে গিয়েছেন, তাতে মানুষের কথাই বলেছেন। ভূতপ্রেত নিয়ে গল্প তো দু'-চারটে। বিশ্বাস প্রবল হলে তো অনেক বেশি লেখা তাঁর কলম থেকে বের হত। আচ্ছা, চলি।" সৌমেনবাবু চলে গেলেন।

কথাটা ঠিক। কিন্তু ওই শমননন্দন সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে হবে। এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করতে পারে একজনই।

রূপমায়া সিনেমার পেছন দিকে চায়ের দোকান করেছে হাত-কাটা গদাই। লোকটা একসময় সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক করত। অর্জুনের সংস্পর্শে এসে ওর মধ্যে পরিবর্তন এলেও অপরাধ জগতের সঙ্গে সম্পর্কটা একেবারে ছিন্ন হয়ে গেছে বলে মনে হয় না। তবে নিজে আর দুষ্কর্ম করে না সে, এ ব্যাপারে অর্জুন নিশ্চিত।

তাকে দেখতে পেয়ে আকর্ণ হাসল হাত-কাটা গদাই, "আরিব্বাস, আপনি?"

"কেমন চলছে ব্যবসা?"

"মিথ্যে বললে পাপ হবে, তাই মিথ্যে বলব না।"

"তার মানে ভালই চলছে।"

"একটা স্পেশ্যাল চা বানাই?"

"স্পেশ্যাল নয়, অর্ডিনারি।" বেঞ্চিতে বসল অর্জুন। ফুটপাতের ওপর বেঞ্চি রাখা আছে। তবে বেশিদিন এভাবে চলবে না। নতুন পুরপিতা ফুটপাত পরিষ্কার রাখতে চান। কাটা গদাইয়ের দোকানে এখন জনাপাঁচেক খদ্দের। সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ সব। এখানে ওদের সঙ্গে বসে অর্জুনকে চা খেতে দেখে ওরাই যেন সংকোচে পড়েছে।

চায়ে চুমুক দিয়ে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "বন্ধুর খবর কী?"

"ওর কথা আর বলবেন না। ওকে আমি বন্ধু বলে ভাবছি না।"

"কেন? কী অন্যায় করল সে?" অর্জুন তাকাল।

"ছেড়ে দিন ওর কথা। আমার ভাল লাগে না।"

"কেন?"

"এই শহরে কি কাজকর্ম কম আছে? তোর কী দরকার রোজ ভোরে শিলিগুড়ি যাওয়ার? ওখানে গিয়ে মারুতিভ্যানের হেল্পারের কাজ করে। প্যাসেঞ্জার ডেকে ডেকে গাড়িতে বসায়।"

Pathagar.net

"ভালই তো, খেটে খাচ্ছে।"

কাটা গদাই কথা বলল না। অর্জুন বুঝতে পারল পোড়া গদাই সম্পর্কে কোনও অপ্রিয় কথা কাটা গদাই বলতে চায় না। ভিড় একটু ফাঁকা হলে অর্জুন বলল, "তোমার সঙ্গে কথা ছিল।"

কাটা গদাই সামনে এসে দাঁড়াল, "বলুন।"

"এই শহরে একটি নতুন মানুষ এসেছে। লোকটি লম্বা, আলখাল্লা পরা। মাথায় লাল ফেট্টি বাঁধা, কাঁধে ঝোলা। দেখলে ফকির বা বাউল মনে হবে। এর সম্পর্কে কোনও খবর জানো?"

কাটা গদাই মাথা নাড়ল, "না।"

"খোঁজ নিতে পারো?"

"তা পারব না কেন? কী করে লোকটা?"

"সন্ন্যাসী হয়ে গুরুর সঙ্গে হিমালয়ে ছিল এতদিন।"

"হুঁ। কী নাম জানেন?"

"শমননন্দন।"

"বাপ রে। এরকম নাম জন্মেও শুনিনি। দাদা, লোকটা কি বাঙালি?"

"হ্যাঁ।" অর্জুন উঠে দাঁড়াল। পকেট থেকে টাকা বের করতেই হাঁ হাঁ করে উঠল কাটা গদাই, "ছি ছি ছি। আপনার কাছে যা ঋণ তা এই জীবনে শোধ করতে পারব না, তার ওপর আর বোঝা বাড়াবেন না।"

অর্জুন বলল, "তা হলে তো আর কখনও তোমার হাতের চা খাওয়া যাবে না। ব্যবসা আর ব্যক্তিগত সম্পর্ক এক করে ফেলো না। নাও রাখো।" জোর করে টাকা গুঁজে দিল অর্জুন। তারপর বলল, "লোকটা সম্পর্কে খবর নাও।"

"নিশ্চয়ই। আমি এখনই লাগিয়ে দিচ্ছি।"

অর্জুন পা বাড়াতেই কাটা গদাই পেছনে ডাকল, "দাদা।"

অর্জুন ঘুরে দাঁড়াল, "আপনি একবার তার সঙ্গে কথা বলবেন?"

"পোড়া গদাইয়ের সঙ্গে? কেন?"

"মহাপাপী তো, সাধুসন্ন্যাসীদের খবর রাখে। একবার এক সাধুর ঝোলা ঝেড়ে দিয়ে দামি দামি রুদ্রাক্ষ পেয়েছিল। যদি বলেন তো ওকে খবর পাঠাতে পারি।" হাত-কাটা গদাই বলল।

অর্জুন হেসে ফেলল, বলল, "বেশ তো।"

pathagar.net

রাত এগারোটা নাগাদ বাইরের দরজায় কেউ ঠুক ঠুক শব্দ করছে বুঝতে পেরে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কে? কে ওখানে?"

"আজ্ঞে, আমি আজ্ঞে।" চিনচিনে গলায় উত্তর এল।

অর্জুন দরজা খুলতেই পোড়া গদাইকে দেখতে পেল। তাকে দেখামাত্র পোড়া গদাই ঝুঁকে পড়ে নমস্কার করল, "আপনি আমাকে দেখা করতে বলেছেন বলে শুনলাম।"

"এসো। ভেতরে এসো।" দরজা থেকে সরে এসে চেয়ারে বসে অর্জুন বলল "বোসো।"

"তা হয় না।"

"মানে?"

"আপনার সামনে আমি বসতে পারব না।"

"আঃ। ঝামেলা কোরো না তো, বোসো বলছি।"

অতএব পোড়া গদাই একটা চেয়ারের কোনায় শরীর ঠেকাল।

অর্জুন তাকাল। লোকটার পরিবর্তন হয়েছে। পরনে জিন্স, চকরা-বকরা টি-শার্ট, পায়ে নর্থ স্টার জুতো। কাটা গদাইয়ের সঙ্গে কোথাও এর মিল নেই।

"তুমি এইমাত্র শিলিগুড়ি থেকে এলে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"ওখানে কেমন চলছে কাজকর্ম?"

"আপনার আশীর্বাদে ছেলেমেয়ে বউ ভালমন্দ খাচ্ছে।"

"বাঃ। আজ কেমন হল?"

"রোজ কি হয়? এক-একদিন চার ফেলতেই শেষ হয়ে যায়। আজ যে চার ফেলেছি তাতে মাছ বঁড়শি গিলেছে, কাল দিনভর লাগবে তাকে ডাঙায় তুলতে।" হাসল পোড়া গদাই।

"বুঝলাম না।"

"আজ্ঞে, এয়ার ভিউ এয়ারপোর্ট, এয়ারভিউ কালিম্পং তো রোজ করি। কদিন থেকে মন বলছিল বড় দাঁও মারলে কেমন হয়। আজ সকাল থেকে প্যাসেঞ্জার নিচ্ছিলাম না। ড্রাইভার শেষ পর্যন্ত রেগেই গেল আমার ওপর। বিকেলে পেয়ে গেলাম। একজন অগ্রিম দিয়ে গেল, কাল পাঙ্খাবাড়ি হয়ে কার্শিয়াং দিয়ে কালিম্পং যেতে হবে। সেখান থেকে গোরুবাথান হয়ে ফেরা। দু হাজার টাকায় রাজি হয়েছে। এটা তো রুটের যাওয়া নয়।" পোড়া গদাই হাসল।

pathagar.net

"তোমার কত থাকবে?"

"আজ্ঞে, চার আনা টাকায়। পাঁচশো।"

"বাঃ, খুব ভাল। তা এত জায়গা একদিনে ঘুরবে, ব্যবসার কাজে নাকি?"

"জানি না। তা আমাকে ডেকেছেন।"

"হ্যাঁ। আচ্ছা, তোমার তো সাধু-সন্ন্যাসীতে খুব ভক্তি আছে। এরকম কাউকে দেখেছ, যে বেশ লম্বা, আলখাল্লা পরে, মাথায় লাল ফেট্টি বাঁধে, কাঁধে ঝোলা, দেখলে ফকির বা বাউল বলে মনে হয়। মনে পড়ছে?"

শোনামাত্র পোড়া গদাই চোখ বন্ধ করল। তারপর জিজ্ঞেস করল, "কোন শ্মশানের?"

"শ্মশানের নয় হে। হিমালয় থেকে আসছে। এখন এই শহরে আছে।"

"নাম কী তাঁর?"

"শমননন্দন।"

"পবননন্দন, বরুণনন্দন, ইন্দ্রনন্দন, নাঃ, এরকম নাম, হ্যাঁ, হ্যাঁ, একবার এরকম নাম শুনেছিলাম। সে-বার কালীপুজোর আগে ভূত-চতুর্দশীতে একজন সাধু এসেছিলেন হিমালয় থেকে ধূপগুড়ির শ্মশানে। তাঁর নাম ছিল যমনন্দন।" পোড়া গদাই বলল।

"যমনন্দন?" অর্জুন সোজা হল।

"হ্যাঁ। হিমালয়ের সাধু তো, ওখানে অনেক দামি দামি রুদ্রাক্ষ হয়।"

"বুঝলাম। সেই রুদ্রাক্ষ বিক্রি করে কত টাকা পেয়েছিলে?"

সঙ্গে সঙ্গে জিভ বের করল পোড়া গদাই। তারপর বলল, "সে-সব অনেক আগের কথা। আপনার কাছে কথা দেওয়ার পর আর ওই লাইনে নেই আমি।"

"সেই যমনন্দনের মাথায় কি লাল ফেট্টি বাঁধা ছিল?"

চোখ বন্ধ করে ভাবল পোড়া গদাই। তারপর বলল, "আলখাল্লা পরা ছিল, তবে ফেট্টি বাঁধা ছিল কি না মনে নেই আমার।"

শমননন্দন আর যমনন্দনের অর্থ এক। এই শমননন্দন ওই যমনন্দন নাও হতে পারে। তবু—। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "এই শমননন্দনকে দেখলে তুমি মনে করতে পারবে?"

"নিশ্চয়ই। পোড়া গদাই একবার যাকে দেখেছে তাকে কখনও ভোলেনি।"

"তা হলে কাল সকাল ন'টায় চলে এসো।"

"সকাল ন'টা? কী করে হবে দাদা! আমি তো ভোর পাঁচটায় বেরিয়ে

pathagar.net

যাব। শিলিগুড়ি থেকে সাড়ে ছ'টায় গাড়ি ছাড়তে হবে।" পোড়া গদাই বলল।

"ও, তাই তো। তুমি ফিরবে কাল রাত্রে?"

"কাল শিলিগুড়িতে ফিরতেই রাত হয়ে যাবে। ধরে নিন পরশু।"

"বড্ড দেরি হবে।" অর্জুন ঘড়ি দেখল, "তুমি এখন বাড়ি যাবে?"

"হ্যাঁ। একটু পরেই বারোটা বেজে যাবে—।"

"ঠিক আছে। একটা চান্স নিই। দাঁড়াও।" অর্জুন উঠল। ঘরের কোণে গিয়ে গাইড দেখে নম্বর বের করে ডায়াল করল। চৌধুরীমশাই নিশ্চয়ই এখন ঘুমোচ্ছেন। অসুস্থ মানুষ, যদি টেলিফোনের শব্দে ঘুম ভেঙে যায় তা হলে মুশকিল হবে। চারবার রিং হতেই বনমালীর গলা শুনতে পেল অর্জুন। যাক, এটাই চাইছিল সে, "বনমালী, আমি অর্জুন বলছি।"

"অর্জুন? মানে— মানে—।"

"আজকে অঞ্জনাদির সঙ্গে তোমাদের বাড়িতে গিয়েছিলাম।"

"ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ।"

"মেসোমশাই কি জেগে আছেন?"

"না, না। তিনি ন'টার সময় ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন।"

"শমননন্দন?"

"আর বলবেন না। বড়বাবুর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল! লোকটাকে ছাদে তুলছেন? সেই সন্ধে থেকে কীসব অং বং করে যাচ্ছে।"

"তার মানে সুস্থ হয়ে গেছে।"

"ওসব ভান বাবু। কিসসু হয়নি তখন।"

"শোনো বনমালী, আমি একজনকে নিয়ে তোমাদের বাড়িতে যাচ্ছি। যাকে নিয়ে যাচ্ছি সে শমননন্দনকে চিনলেও চিনতে পারে। তুমি আমার বাইকের আওয়াজ পেলেই বাইরের দরজা খুলে দেবে। দেখবে, মেসোমশাইয়ের ঘুম যেন না ভাঙে।"

"আপনার কি লোকটাকে সন্দেহ হচ্ছে?" বনমালী খুব খুশি।

"একটু একটু হচ্ছে বলেই যেতে চাইছি।"

"ঠিক আছে। আপনারা আসুন।"

আধ ঘণ্টার মধ্যে পোড়া গদাইকে তার বাড়িতে পৌঁছে দেবে কথা দিয়ে অর্জুন তার লাল মোটরবাইকের পেছনে ওকে বসিয়ে নির্জন রাতের রাস্তা দিয়ে চলে এল চৌধুরীমশাইয়ের বাড়ির সামনে। পুরো বাড়িটা অন্ধকার।

Pathagar.net

বাইক গেটের ভেতর ঢুকিয়ে পোড়া গদাইকে সঙ্গে নিয়ে বারান্দায় উঠতেই দরজা খুলে গেল। বনমালী বলল, "আসুন।"

অর্জুন পোড়া গদাইকে চাপা গলায় বলল, "চুপচাপ আমার পেছন পেছন এসো। লোকটা আছে ছাদের ঘরে।"

বনমালী ইতস্তত করল, "বাবু জানলে আমার চাকরি চলে যাবে।"

"উনি জানবেন না। তা ছাড়া আমরা ওঁর ভাল চাই বলেই তো এসেছি। যাকে নিতে এসেছি সে সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে ওঠাবসা করত। শমননন্দনকে দেখে যদি চিনতে পারে তা হলে তোমার বাবুর উপকার হবে। তোমার বাবুর কাছে অনুমতি চাইলে উনি রাজি হতেন না বলেই এভাবে আসতে হল।"

অর্জুনের যুক্তি খুশি করল বনমালীকে। দরজা বন্ধ করে সে টর্চ জ্বালাল। বোঝা যাচ্ছে আলো জ্বালবার ঝুঁকি সে নিতে চাইছে না। ক্রমশ তিনতলায় উঠে এল ওরা। এবার ছাদে যাওয়ার সিঁড়ি সামনে। ছাদের দরজা বন্ধ। বনমালী সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে দরজাটা খুলে ছাদে উঁকি মারল। তারপর ফিসফিস করে বলল, "ছাদে নেই, মনে হয় ঘরে আছে।"

ওরা ছাদে পা রাখল। সামনেই চিলেকোঠা, তার জানলা দিয়ে আলো বেরিয়ে পড়েছে ছাদে। অর্জুন জানলার গায়ে এসে দাঁড়াতেই শমননন্দনকে দেখতে পেল। চোখ বন্ধ করে পদ্মাসনে বসে আছে সোজা হয়ে। মুখ দেখা যাচ্ছে না, কারণ তার পিঠ জানলার দিকে ফেরানো। অর্জুন ইশারায় পোড়া গদাইকে ডাকল কাছে যেতে। পোড়া গদাই উঁকি মেরে অনেকক্ষণ দেখল। তারপর নীরবে মাথা নাড়ল। অর্থাৎ সে ঠিক বুঝতে পারছে না।

বনমালীকে অপেক্ষা করতে বলে অর্জুন সটান চলে গেল চিলেকোঠার দরজায়। দরজা ভেজানো। মৃদু শব্দ করল সে। দ্বিতীয়বারে গলা ভেসে এল, "খোলাই আছে।"

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল অর্জুন, পেছনে পোড়া গদাই। নমস্কার করে অর্জুন বলল, "যদিও রাত হয়েছে, বিশ্রামের সময়, তবু ভাবলাম আপনার সঙ্গে একটু কথা বলে আসি।"

"ভালই তো। বসুন বাবামশাইরা। এখানে চেয়ার নেই, শতরঞ্চির ওপরই বসতে হবে।" হেসে বলল শমননন্দন। তার মুখে একটুও বিস্ময় নেই। যেন এত রাত্রে ওদের আসা অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়।

অর্জুন বসল। পাশে বসতে দ্বিধা হল পোড়া গদাইয়ের। সে বসল একটু পিছিয়ে।

pathagar.net

শমনন্দন হেসে বলল, "প্রশ্ন করুন।"

"একটাই জানতে চাই, আপনি তো মৃত মানুষের আত্মার সঙ্গে কথা বলিয়ে দিতে পারেন।"

তাকে থামিয়ে শমননন্দন মাথা নেড়ে বলল, "আমি পারি না, সবই গুরুর কৃপায়।"

"হ্যাঁ, তাঁর কৃপা আপনি পেয়েছেন, আপনি ধন্য। আচ্ছা, মৃত্যুর পরে ওনারা কি পৃথিবীতে যেমন ছিলেন তার থেকে ভাল আছেন?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"যার পৃথিবীর ওপর বেশি টান, সে কী করে ভাল থাকে? বাড়ি ছেড়ে দূর প্রবাসে কাজে গিয়ে কেউ কেউ মানিয়ে নেয়, কেউ-বা কাতর হয়ে পড়ে। এও তেমনই।" শমননন্দন বলল।

"বাঃ। খুব সুন্দর বললেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে বলেছেন, এ পরবাসে রবে কে? তার মানে পৃথিবীতে থাকাটা হল প্রবাসে থাকা, আসল বাস ওই লোকে। আপনিও তাই মনে করেন?"

"ঠিক, ঠিক। তাই তো আমার গুরুদেব দুই জগতের মধ্যে যোগসূত্র তৈরি করিয়ে দিতে চান। জন্মিলেই মরিতে হবে, এটাই তো শেষ কথা।"

"তা হলে তো আপনি মানুষের আরও উপকার করতে পারেন?" অর্জুন বলল।

"যথা?"

"এই পৃথিবীতে অনেক অপরাধ সংগঠিত হয়, অনেক মানুষ আততায়ীর হাতে খুন হন কিন্তু পুলিশ কোনও ক্লু না পাওয়ায় অপরাধীকে ধরতে পারে না। আপনি সেই খুন হয়ে যাওয়া মানুষের আত্মাকে এনে জিজ্ঞেস করতে পারেন কে তাকে খুন করল? উত্তরটা পুলিশকে জানিয়ে দিলেই অপরাধী ধরা পড়বে। আর এই ঘটনার প্রচার হয়ে গেলে কেউ আর ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে কাউকে খুন করবে না। মানুষের খুব উপকার হবে। তাই না?" অর্জুন বলল।

"ঠিক কথা। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। অপঘাতে মারা যাওয়া মানুষের আত্মাদের পৃথিবীতে ডেকে আনা খুব দুরূহ ব্যাপার। তাদের খুঁজেই পাওয়া যায় না। আমার গুরুদেব অনেক চেষ্টা করেও হিটলারের আত্মার সন্ধান পাননি।" শমননন্দন মাথা নাড়ল।

"নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু?"

pathagar.net

"তিনি মহামানব ছিলেন। মহামানবদের বিরক্ত করা নিষিদ্ধ।" শমননন্দনের খেয়াল হল। "ইনি কে?"

পোড়া গদাই নড়েচড়ে বসল।

অর্জুন বলল, "এঁর নাম গদাই। এখন পরিশ্রম করে রোজগার করছে। একসময় এর দুর্মতি হয়েছিল। তার জন্যে অল্পস্বল্প জেলও খেটেছে। সেটা এখন অতীত। তবে গদাই অনেক সাধুসঙ্গ করেছে।"

"সাধুসঙ্গ?" শমননন্দন তাকাল।

"হ্যাঁ। তবে সে-সময় মনে পাপ ছিল। এক সাধুর ঝোলা চুরি করেছিল।"

"ছিঃ।"

"তাই তো ও জ্বলেপুড়ে মরছে। মনে শান্তি নেই। সেই চুরির জন্যে ধরা পড়েনি তো।"

"কী ছিল ঝোলাতে?" শমননন্দন জিজ্ঞেস করল।

"আজ্ঞে, রুদ্রাক্ষ।"

"রুদ্রাক্ষ?" শমননন্দন অবাক!

"হ্যাঁ বাবা। শিলিগুড়ির রামলগনজি আমাকে ঠকিয়ে নিয়েছে। মাত্র পাঁচ টাকা করে দাম দিয়েছে। কুড়িটা রুদ্রাক্ষ ছিল। পরে শুনেছি বিদেশে নাকি ওর এক-একটার দাম হাজার টাকা।"

"সেই সাধু অত রুদ্রাক্ষ নিয়ে এসেছিলেন কেন?"

"জানি না বাবা। চুরি করে আমি ওখান থেকে হাওয়া হয়ে গিয়েছিলাম।" গদাই বলল।

"সেই সাধুর মূল আশ্রম কোথায়?"

এবার অর্জুন জবাব দিল, "বলেছিলেন তো হিমালয়ে।"

"আহা, হিমালয় তো এতটুকু জায়গা নয়।"

"যদ্দূর মনে পড়ছে গদাই তখন বলেছিল সাধু নাকি মানস সরোবর থেকে এসেছেন।"

"মানস সরোবর? সে কী! সেখানকার সব সাধুকে আমি চিনি। বয়স কত?"

"সাধুবাবাদের বয়স তো দেখে বোঝা যায় না। তবে আপনার চেয়ে বড়।"

হঠাৎ গদাই বলল, "আপনার সঙ্গে তার চেহারার খুব মিল আছে বাবা।"

হেসে ফেলল শমননন্দন, "আমার সঙ্গে? তোমাদের এই শহরে আমি প্রথমবার এলাম।"

pathagar.net

শমননন্দন জিজ্ঞেস করল, "তা সাধুকে কি নামটা জিজ্ঞেস করা হয়েছিল?"

"হ্যাঁ বাবা। তিনি নাম বলেছিলেন, যমনন্দন।"

"সর্বনাশ! তুমি যমনন্দনের রুদ্রাক্ষ চুরি করেছ?" উত্তেজিত হল শমননন্দন।

"আজ্ঞে খুব অন্যায় হয়ে গেছে।" পোড়া গদাই হাতজোড় করল।

"আপনি যমনন্দনকে চিনতেন?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

শমননন্দনের শরীর তখন উত্তেজনায় থরথর করছে। সেই অবস্থায় বলল, "বিলক্ষণ। একসময় সে আমার গুরুভ্রাতা ছিল। অত্যন্ত বুদ্ধিমান, মেধাবী কিন্তু প্রকৃত সাধকের গুণাবলী তার মধ্যে ছিল না। আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের বশীভূত করে সে ক্ষমতা অর্জনের পথ ধরেছিল। গুরুদেব তাকে বারংবার সতর্ক করেছিলেন। শেষপর্যন্ত তিনি তাকে আশ্রম থেকে বিতাড়িত করতে বাধ্য হন। কিন্তু চলে আসার আগে সে আশ্রমে সযত্নে রক্ষিত রুদ্রাক্ষগুলো আত্মসাৎ করে নিয়ে এল। অনেক সন্ধান করেও কোনও হদিস পাওয়া যায়নি।"

অর্জুন গদাইকে বলল, "এবার শান্ত হও। তুমি চোরের ওপর বাটপাড়ি করেছ। বাটপাড়দের বেশি পাপ লাগে না।"

"তা হলে সে এখানে এসেছিল। সে কি আত্মার সঙ্গে এখানকার কাউকে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিল?" শমননন্দন জিজ্ঞেস করল।

পোড়া গদাই বলল, "এ কথা তিনি বলেছিলেন, কিন্তু করে দেখাননি।"

"হুঁ। শোনো বাবা, যে করেই হোক ওই রুদ্রাক্ষগুলো আমার চাই। কারণ ওগুলো সাধারণ রুদ্রাক্ষ নয়। প্রতিটি রুদ্রাক্ষ অতীব তেজসম্পন্ন। অসতের হাতে থাকা উচিত নয়।"

অর্জুন বলল, "নিশ্চয়ই চেষ্টা করব। তবে আপনি যা বললেন তাতে মনে হচ্ছে যমনন্দনের জিনিস শিলিগুড়ির রামলগনজির কাছে গিয়ে ভালই হয়েছে। তিনি তো জানেন না ওগুলো দিয়ে কীভাবে মানুষের ক্ষতি করতে হয়।"

শমননন্দন ততক্ষণে চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় শুরু করেছে, "যমনন্দন এসেছিল। তার মানে সে এই অঞ্চলে আছে। আছে যখন তাকে এই বাড়িতে আসতেই হবে। এখানে আসাই তার উদ্দেশ্য।"

"আপনি কিছু বলছেন?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

Pathagar.net

"যমনন্দনকে কবে এখানে শেষ দেখা গিয়েছে?" শমননন্দন জিজ্ঞেস করল।

"বেশ কয়েক বছর হয়ে গেল।" অর্জুন বলল।

"হুম।" পোড়া গদাইয়ের দিকে তাকাল শমননন্দন, "এই যে, তুমি যেটুকু পাপ করেছ সেটুকু স্খলন করার সুযোগ পাচ্ছ। এদিকে এসো। উঠে এসো।"

পোড়া গদাই উঠে নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে বসল। ঝোলা থেকে কাগজ পেনসিল বের করে ওর সামনে রাখল শমননন্দন। পোড়া গদাই আঁতকে উঠল, "এ কী! আমি লেখাপড়া জানি না।"

"তোমাকে কিছু করতে হবে না। পেনসিলটা কাগজের ওপর ধরো।"

পোড়া গদাই আদেশ মান্য করতে সেই থার্মোকলের বাক্সটা বের করে সুইচ অন করল শমননন্দন। সঙ্গে সঙ্গে বিপ বিপ আওয়াজ শুরু হল। নব ঘুরিয়ে শব্দটাকে ঠিক জায়গায় নিয়ে এসে চোখ বন্ধ করল শমননন্দন। এক মিনিট, দু' মিনিট, তিন মিনিট। হঠাৎ শমননন্দন বলতে লাগল, "প্রভু, আমি ক্ষমাপ্রার্থী। উপায় না থাকায় আপনাকে বিরক্ত করলাম। যমনন্দন এই শহরে এসেছিল। তার ঝোলা থেকে অবশ্য রুদ্রাক্ষগুলো চুরি হয়ে গেছে। কিন্তু সে কোথায় আছে জানা দরকার। নইলে সে মহাক্ষতি করবে।"

পোড়া গদাই এবার ফসফস করে লিখতে লাগল। লেখা শেষ হতে-না-হতেই তার হাত থেকে পেনসিল পড়ে গেল। মাথাটা ঝুঁকে পড়ল বুকের ওপর। প্রায় ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে কাগজটার ওপর চোখ রাখল শমননন্দন। তারপর দু' হাত জোড় করে কপালে ঠেকাল, "গুরুদেব দয়া করো দীনজনে।"

"পেয়েছেন?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

এগিয়ে দিল কাগজটা শমননন্দন। অর্জুন দেখল তাতে স্পষ্ট লেখা আছে, "বিদেশিনী নদী যেথা স্বদেশিতে মেশে, সেথা সে ঘুরে মরে ছদ্মবেশে।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "এর মানে কী?"

"বুঝলাম না। ভাবতে হবে। খুব ভাবতে হবে।"

অর্জুন পোড়া গদাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, "এ যে অসুস্থ হয়ে পড়ল।"

"না, না। প্রথম ধকল, এখনই সামলে উঠবে। আচ্ছা, এদিকে বিদেশিনী নদী কিছু আছে?"

"এখানকার সব নদী হয় ভুটান নয় নেপাল থেকে এসেছে। সেক্ষেত্রে সবই বিদেশিনী নদী। আচ্ছা, আপনি বিশ্বাস করেন এই লেখা গদাই নিজে লেখেনি?"

Pathagar.net

"ও তো সুস্থ হয়ে উঠেছে, ওকে জিজ্ঞেস করুন এরকম পদ্য আর লিখতে পারবে কি না!"

অর্জুন বিশ্বাস করতে পারছিল না। সম্মোহন করে কোনও মানুষকে কিছুক্ষণ পরিচালনা করা যায়, কিন্তু তাকে দিয়ে কি লেখানো যায়? স্বীকার করলে বিজ্ঞানের উলটো পথে হাঁটতে হয়।

গদাই মুখ তুলে তাকাল। তারপর বলল, "মাথাটা ঝিমঝিম করছে।"

"ঠিক হয়ে যাবে বাবা। তুমি এখন ওই রামলগনজির সন্ধান এনে দাও।"

উঠে দাঁড়াল অর্জুন, "আপনি এখান থেকে কবে যাবেন?"

"কেন?"

"জিজ্ঞেস করছি। যমনন্দনের সন্ধান করবেন তো!"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।"

"তা হলে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি।"

"নিজের কাজকর্ম ফেলে আমাকে সাহায্য করা কি ঠিক হবে?"

"এটাই আমার কাজ। সত্যসন্ধান করা।" অর্জুন হাসল।

তখন অনেক রাত। গদাইকে তার বাড়ির সামনে পৌঁছে দিয়ে অর্জুন বলল, "চললাম হে।"

"বাবু।" পোড়া গদাই ডাকল। অর্জুন মোটরবাইকে বসেই তাকাল।

"আমি একটা সত্যি কথা বলিনি।" হাত জোড় করল গদাই।

"আমাকে?" অর্জুন অবাক!

"না, না। তেনাকে। সাধু-সন্ন্যাসীদের সহজে বিশ্বাস করতে মন চায় না।"

"কথাটা কী?"

"ওই যমনন্দনজির খবর আমি রাখি।"

"আচ্ছা!"

"যার জিনিস চুরি করেছি সে কোথায় থাকছে তা জানা চোরেদের ডিউটির মধ্যে পড়ে। কোনওদিন যেন ওর সামনে না পড়ি তাই খবর রাখি।"

"কোথায় আছেন তিনি?"

"বাজারহাট ছাড়িয়ে ডায়না নদীর ধারে একটা শ্মশানে।"

"শ্মশানটার নাম কী?"

"বাঘের হাট।"

"দারুণ নাম তো। আচ্ছা, এলাম।"

pathagar.net

রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি। সকালে বিছানা ছাড়তে দেরি হয়ে গেল। মা জিজ্ঞেস করলেন, "তোর কি শরীর খারাপ?"

"না। ভোরের আগে ঘুম এল, তাই—।"

"কী যে এত রাত পর্যন্ত কাজ থাকে তোর!" মা অখুশি।

"আচ্ছা মা, তুমি ভূতপ্রেতে বিশ্বাস করো?"

মা হাসলেন, "যদি আমি হিন্দু হই এবং কেউ মারা গেলে শ্রাদ্ধ করি, তা হলে বলতে বাধ্য আমি ভূতে বিশ্বাস করি।"

"কীরকম?"

"তোর বাবার শ্রাদ্ধের সময়ে যে মন্ত্র পড়তে হয়েছিল তাতে বলতে হয়েছে, তুমি এখন প্রেত, এই পিণ্ড গ্রহণ করে এই জায়গা ছেড়ে চলে যাও। মৃত্যুর পরে আত্মাকে স্বীকার করা মানেই তো ভূতপ্রেতে বিশ্বাস করা।"

"কিন্তু বিজ্ঞানীরা তো তোমার কথা শুনলে হাসবে।"

"আগে তারা এইসব শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান বন্ধ করুক, তারপর নাহয় হাসুক।"

"তুমি চোখে দেখেছ?"

"নাঃ। আত্মার শরীর নেই, দেখব কী করে!"

"মা, এখানে একজন সাধু এসেছেন যিনি মৃত মানুষের সঙ্গে কথা বলাতে পারেন।"

"সেখানে তুই গিয়েছিলি নাকি?"

"দেখতে গিয়েছিলাম।"

"খবরদার বলছি, আর যাবি না। এইসব তন্ত্রমন্ত্র মানুষের উপকার করে বলে শুনিনি। কী দরকার তোর তান্ত্রিকদের আশপাশে ঘুর ঘুর করার?" মা সরে গিয়েছিলেন বিরক্ত মুখে।

কিন্তু একটু বাদেই দীপকদার গলা পাওয়া গেল, "অর্জুন, আছ নাকি হে?"

দরজা খুলল অর্জুন, "আসুন দীপকদা।"

চেয়ারে বসে দীপকদা জিজ্ঞেস করলেন, "ব্যাপারটা কী হে?"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "এখনও বুঝতে পারছি না।"

"এসব গালগল্প দু' হাজার দুই সালে কেউ বিশ্বাস করে?"

"করছে তো। মেসোমশাই করছেন।"

"ওঁর মস্তিষ্ক ঠিক আছে তো?"

অর্জুন হেসে ফেলল, "তবে দু' হাজার দুই সালের সঙ্গে মানিয়ে এই সাধু

pathagar.net

একটি যন্ত্রের সাহায্যে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে আত্মাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।"

"যত্ত বুজরুকি। স্যাটেলাইট কখনও আত্মাকে ধরতে পারে?"

"এটা নিয়ে বোধ হয় এখনও গবেষণা হয়নি।"

"আমার মনে হচ্ছে লোকটা একটা বিশেষ ধান্দা নিয়ে এসেছে।" দীপকদা মাথা নাড়লেন, "তুমি ভেবে দ্যাখো, বেছে বেছে নাম নিয়েছে শমননন্দন। শুনলেই কীরকম লাগে।"

"ওর এক ভাইও এই অঞ্চলে আছে। তার নাম যমনন্দন।"

"ভাই?"

"হ্যাঁ। গুরুভাই। তবে ওর শত্রু।"

"শোনো, আমি তোমার কাছে এলাম, কারণ আমার মনে হচ্ছে পুলিশকে জানানো দরকার।"

"জানলে পুলিশ কি কিছু করতে পারবে?"

"হোয়াই নট? ভণ্ডামি করে মানুষ ঠকানোর অভিযোগে গ্রেফতার করবে ওকে।"

"এই অভিযোগটা কে করবে?"

"আমি! তুমি সঙ্গে থেকো।"

"কিন্তু শমননন্দন তো আপনাকে ঠকায়নি। চিটিং কেস হবে কী করে। হ্যাঁ, মেসোমশাই যদি এই অভিযোগ আনেন তা হলে আলাদা কথা।"

"উনি তো হিপনোটাইজ্‌ড হয়ে আছেন।"

"ঠিক কি না জানি না, তবে আর-একটু দেখা যেতে পারে।"

"অর্জুন, তোমাকে কেসটা দিচ্ছি। তোমার সম্মানদক্ষিণা তুমি পাবে। অঞ্জনার বাবাকে রাহুমুক্ত করো। ওই ফোরটুয়েন্টি লোকটাকে বিদায় করো।"

"ওইখানেই তো মুশকিল হয়ে যাচ্ছে দীপকদা।"

"মানে?"

"লোকটাকে এখনও ফোরটুয়েন্টি বলে প্রমাণ করতে পারছি না। আচ্ছা, আপনি পোড়া গদাইকে চেনেন? আগে রূপমায়াতে টিকিট ব্ল্যাক করত।"

দীপক মাথা নেড়ে না বলল।

"যাকগে, সে এখন ভদ্র হওয়ার চেষ্টা করছে। ক্লাস টু অবধি বিদ্যে। জীবনে দশটা লাইন লিখেছে কি না সন্দেহ। সেই পোড়া গদাই আমার সামনে বসে ফস্ ফস্ করে লিখল, 'বিদেশিনী নদী যেথা স্বদেশিতে মেশে,

pathagar.net

সেথা সে ঘুরে মরে ছদ্মবেশে।' এরকম ঠিকঠাক কবিতার মতো লাইন কী করে লিখল পোড়া গদাই?"

"এই কথা? মালদায় যাও, বীরভূমে যাও, যাঁরা লোকসঙ্গীত গান তাঁরা নিরক্ষর হয়েও অনবদ্য লাইন মুখে মুখে রচনা করে থাকেন। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।" দীপকদা হেসে বললেন। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "বেশ, মুখে মুখে গান বানানো এক কথা আর ঠিকঠাক বানান লেখা, সেটা কী করে শিক্ষা ছাড়া সম্ভব। বিদেশিনী, স্বদেশি, ছদ্মবেশ, সব শব্দ ক্লাস এইটের ছেলেকে লিখতে দিলে সবাই পারবে লিখতে?"

"তুমি কী বলতে চাইছ?"

"যখনই বুঝতে পারছি এটা পোড়া গদাইয়ের বিদ্যেয় সম্ভব নয়, তখনই ধন্দে পড়ছি। আর, একটা জিনিস, আগেকার বাঙালিরা যখন বাংলা শব্দ লিখতেন তখন অন্যরকম ছাঁচে লেখা হত। মনে হয় রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখা থেকেই এখনকার বাঙালির হস্তাক্ষর তৈরি হয়েছে। এসব পোড়া গদাইয়ের জানা নেই। তবু তার ওই দু' লাইন লেখাটা দেখলে মনে হবে আমার ঠাকুর্দার আমলের কেউ লিখেছেন। আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত ওই লেখা পোড়া গদাই জ্ঞানত কখনওই লিখতে পারবে না, আর সে আমার চোখের সামনে বসে লিখেছে।" অর্জুন বলল।

দীপকদা কিছুক্ষণ অর্জুনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন, "তোমার কি মাথাখারাপ হয়ে গেল?"

"না। আমি যা দেখেছি তাই বলছি।"

"তা হলে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি তুমি কিছুই দ্যাখোনি। ওই লোকটা সম্মোহনবিদ্যা জানে। তোমাকে সম্মোহিত করে রেখেছিল সে। তাই ও যা চেয়েছে তাই তুমি দেখেছ। পি সি সরকার সিনিয়ারও এটা পারতেন। শুনেছি ওঁর ইচ্ছেমতো দর্শক তাদের ঘড়িতে সময় দেখত। তোমার ক্ষেত্রেও এটা হয়েছে।" দীপকদা উঠে দাঁড়ালেন, "তুমি কি অঞ্জনার বাবার কাছে আজ যাবে?"

"নিশ্চয়ই।"

"তুমি নিজেকে সত্যসন্ধানী বলো। বিজ্ঞান শেষ সত্যি বলে। আশা করি তুমি ধর্মচ্যুত হবে না। আমরা সবাই চাইছি লোকটাকে ওই বাড়ি থেকে বিদেয় করতে। প্লিজ হেল্প আস।" দীপকদা চলে গেলেন। আশ্চর্য ধন্দ। অর্জুন নিশ্চিত যে, সে সম্মোহিত ছিল না।

pathagar.net

আমাদের চারপাশে এমন অনেক ঘটনা আছে, যা নিয়ে বিজ্ঞানীরা কথা বলেন না। মুখে মুখে চলে আসা এমন অনেক অলৌকিক ঘটনা, যা মানুষ বিশ্বাস করে, বিজ্ঞানীরা তার অসারত্ব প্রমাণ করতে এগিয়ে আসেন না। এই যেমন জল্পেশের মন্দির। অনেকের বিশ্বাস ওখানকার শিব খুব জাগ্রত। বিশাল মেলা হয়। এলাকার সবাই জানে রাজা শেষ রাতে স্বপ্ন দেখেছিলেন, শিব বলছেন তাঁকে মাটির তলা থেকে উদ্ধার করতে। কোন জায়গায় মাটির নীচে তিনি আছেন তারও আভাস দিয়ে দিলেন। রাজা লোকলশকর নিয়ে ছুটে এলেন। খুঁড়তে খুঁড়তে শেষপর্যন্ত অখণ্ড শিবলিঙ্গের সন্ধান পাওয়া গেল যার অবস্থান মাটির অনেক নীচে, যার শেষ পাওয়া গেল না। রাজা সেই অবস্থা বজায় রেখে মাটির নীচ থেকে মন্দির তুললেন। এখন এই ঘটনাকে যাঁরা অবিশ্বাস করেন তাঁরা করতেই পারেন। কিন্তু শিবভক্তরা করেন না। রাজপরিবারের যে-ইতিহাস লেখা হয়েছে দিনের পর দিন, তাতেও ওই স্বপ্নাদেশের কথা বলা হয়েছে। গোলমালটা এখানেই।

এগারোটা নাগাদ অর্জুন চৌধুরীবাড়িতে পৌঁছে গেল। বনমালী দরজা খুলল। তার মুখে হাসি, "এসে গেছেন!"

"তোমাকে বেশ খুশি খুশি দেখাচ্ছে।" অর্জুন বলল।

"সকাল থেকে সাধুবাবা চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে।"

"কেন? অসুস্থ নাকি?"

ঠোঁট বেঁকাল বনমালী, "কী জানি!"

চৌধুরীমশাই বসে ছিলেন দোতলার বসার ঘরে। অর্জুনকে দেখে বললেন, "এসো। বেশ চিন্তায় পড়ে গেছি হে। সাধুজি সকাল থেকেই শুয়ে আছেন। শরীর নিশ্চয়ই ভাল নয়। কিন্তু ডাক্তার ডাকতে পারছি না। ডাক্তারদের ওষুধ ওঁরা খান কি না তা তো জানা নেই।"

"আমি একবার দেখব?"

"দ্যাখো। তবে ওঁকে বিরক্ত কোরো না। আমার বড় মেয়ে-জামাই তো ওঁকে তাড়াবার জন্যে এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছে যে, তাদের নিষেধ করেছি উনি থাকা পর্যন্ত এ ব্যাপারে কথা না বলতে।"

অর্জুন নিরীহ ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে ছাদের দিকে এগোল।

দরজা ভেজানো ছিল, বন্ধ নয়। শব্দ করল অর্জুন। সাড়া এল না।

pathagar.net

শেষপর্যন্ত সামান্য ঠেলতেই ওটা খুলে গেল। চিত হয়ে শুয়ে আছে শমননন্দন। চোখ খোলা। পরনের পোশাক একই।

অর্জুন ডাকল, "শুনছেন?"

শমননন্দন চোখ ফেরাল, দেখল, একটু হাসার চেষ্টা করল।

"আপনার কী হয়েছে?"

"ভাবছি।" একটুও নড়ল না শমননন্দন।

"ভাবছেন?"

"আমি কি মূর্খ! লাইন দুটোর অর্থ সেই মাঝরাত থেকে ভেবে যাচ্ছি কিন্তু কিছুতেই মাথায় আসছে না। বিদেশিনী নদী যেথা স্বদেশিতে মেশে, সেথা সে ঘুরে মরে ছদ্মবেশে। মানে কী?"

"এই ভাবনাটা আপনি আমার ওপর ছেড়ে দিন।"

"আপনি কথাটার রহস্য ভেদ করতে পারবেন?"

"মনে হয় পারব।" অর্জুন মাথা নাড়ল, "কিন্তু আপনি এভাবে শুয়ে আছেন দেখে চৌধুরীমশাই খুব দুশ্চিন্তা করছেন। এমনিতেই ওঁর শরীর খারাপ। চিন্তা করা ঠিক নয়।"

উঠে বসল শমননন্দন, "তা হলে আপনি বলছেন ধাঁধাটার সমাধান করতে পারবেন?"

"দেখুন, এই অঞ্চলের সব নদী বিদেশ থেকে এসেছে। হয় ভুটান নয় নেপাল, সেই অর্থে এখানে জন্ম নিয়েছে এমন কোনও নদী নেই।"

"তা হলে?" শমননন্দন হতাশ হল।

"এখন দেখতে হবে উনি কী কারণে বিদেশি এবং স্বদেশি শব্দ দুটো ব্যবহার করেছেন?"

"আমি কিছু বুঝতে পারছি না বাবা।" শমননন্দনকে অসহায় দেখাচ্ছিল।

"বিদেশিনী নদী, বিদেশিনী নামের নদীর কথা যদি বলে থাকেন—।" বলামাত্রই মাথার ভেতর পোড়া গদাইয়ের কথাগুলো কিলবিল করে উঠল। বিদেশিনী নদী। ডায়না তো বিদেশিনী নাম। ডায়না নদী। ভুটান থেকে নেমে এসে জলঢাকা বা তিস্তায় গিয়ে মিশেছে। জলঢাকা বা তিস্তা তো স্বদেশি নামের নদী। আর কী নদী আছে এই অঞ্চলে? করলা, ধরধরা, লিস্, ঘিস্, তোর্সা, ডুডুয়া, আংরাভাসা। লিস্, ঘিস্ কি বিদেশি নামের নদী? সন্দেহ থাকছে। বেণুদার কাছে গেলে জানা যেত। কবি বেণু দত্তরায় জলপাইগুড়ির মন্দির এবং নদী নিয়ে অনেক পড়াশোনা করেছেন। আর তখনই তার বাঘের

হাট শ্মশানের কথা মনে পড়ল। পোড়া গদাইয়ের কথা যদি সত্যি হয় তা হলে যমনন্দন বাঘের হাট শ্মশানে রয়েছে। আর ওই শ্মশান ঠিক ডায়না নদীর পাশে। কিন্তু বাঘের হাট শ্মশানের কাছে কি ডায়না, তিস্তা বা জলঢাকা এসে মিশেছে? না মিশলে তো ধাঁধাটা সহজ হচ্ছে না।

আর ধাঁধাটা যদি সত্যি একটা তথ্য পরিবেশন করে তা হলে প্ল্যানচেটে বিশ্বাস করতেই হয়। অর্জুন এই ব্যাপারটা নিয়ে এখনই মাথা ঘামাতে চাইছিল না। এই সময় বনমালী এসে দাঁড়াল দরজায়, "কর্তা জানতে চাইছেন উনি কেমন আছেন?"

"ভাল আছেন। তুমি ওঁকে বলো কয়েক মিনিটের মধ্যে নীচে নামবেন।" অর্জুন বলল।

বনমালী চলে গেলে অর্জুন বলল, "আমার মনে হয় আমি সমাধান করতে পেরেছি।"

"এর মধ্যেই পেরে গেলেন? আমি এত সময় চেষ্টা করলাম কিন্তু পারিনি।"

"হঠাৎই পেরে গেলাম। বিদেশিনী নদীর নাম ডায়না।"

"ডায়না? কোথায়?"

"বেশি দূরে নয়। গাড়িতে এখান থেকে ঘণ্টাদুয়েক হবে।"

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল শমননন্দন, "আমি এখনই সেখানে যাব।"

"ব্যস্ত হবেন না। ডায়না একরত্তি নদী নয়। ঠিক কোনখানে গেলে আপনি ওই যমনন্দনকে খুঁজে পাবেন তা আপনার জানা নেই।"

"কেন? ডায়না যেখানে গিয়ে আর একটি স্বদেশি নদীতে মিশছে, নিশ্চয়ই সেই সঙ্গমস্থল খুঁজে পাওয়া যাবে!" শমননন্দন বলল।

"আপনি আমার ওপর ভরসা রাখুন।"

"মানে?"

"আমি আপনার সঙ্গে যাব।"

"যাবেন? বাঃ। খুব ভাল হয়। তা হলে আর বৃথা দেরি করে লাভ কী।"

"আমার একটু খবরাখবর নেওয়া দরকার। আচ্ছা, আপনি তো আত্মার সঙ্গে কথা বলিয়ে দিতে পারেন। কোনও আত্মাকে ডেকে এনে তাকে জিজ্ঞেস করে ঠিক জায়গাটার খোঁজ নিলে কেমন হয়?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"বলতে হলে গুরুদেবই সরাসরি বলতেন। অন্যরা কি কেউ বলবে?"

"চেষ্টা করে দেখুন না!"

শমননন্দন ধন্দে পড়েছে বলে মনে হল। তারপর ঘাড় নেড়ে না বলল।

"কেন?"

"ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্যে কোনও প্রশ্ন করা চলবে না। গুরুদেবের আদেশ।"

"ঠিক আছে। আমি তো করতে পারি।"

"আপনি?"

"হ্যাঁ। চলুন নীচে যাই। চৌধুরীমশাই বোধহয় বেশ ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।"

শমননন্দন সুস্থ আছে জেনে চৌধুরীমশাই খুব খুশি হলেন। তিনি তখনই তাঁর মনের অভিলাষ ব্যক্ত করলেন। এক মৃত বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে চান তিনি। দীর্ঘকাল ধরে একটা দায় বহন করে চলেছেন, তা থেকে মুক্তি চান।

শমননন্দন রাজি হচ্ছিল না। অনেক অনুরোধের পরেও বলল, "দেখুন, আপনার মা এবং স্ত্রীর সঙ্গে আপনার কথা হয়েছে। এই তো অনেক। এবার আমাকে যেতে দিন।"

হাতজোড় করলেন চৌধুরীমশাই, "ঠিক। কিন্তু বিনয়ের সঙ্গে কথা না বলতে পারলে তো মরেও শান্তি পাব না বাবা। চিরকাল বোঝা বয়ে বেড়াতে হবে।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "বিনয় কে?"

"আমার বন্ধু। তার বেশি জানতে চেয়ো না।" চৌধুরীমশাই বললেন।

"বেশ।" সে শমননন্দনকে বলল, "আপনি শেষবার রাজি হয়ে যান। বিনয়বাবু যদি আসেন তা হলে তাঁকে আমি ধাঁধাটার কথা জিজ্ঞেস করতে পারি।"

"অ্যাঁ?" হাঁ হয়ে গেল শমননন্দন।

"তিনি তো পরলোকে থাকেন। নিশ্চয়ই সব জানেন।"

"বেশ। কবে দেহ রেখেছেন তিনি?" শমননন্দন জিজ্ঞেস করল।

চৌধুরীমশাই একটু কুঁকড়ে গেলেন। তারপর বললেন, "কয়েকবছর আগে কুম্ভমেলায় এক বাঙালি সাধুর মৃত্যুর খবর কাগজে পড়েছিলাম। তাঁর বর্ণনার সঙ্গে বিনয়ের মিল আছে।"

"ও। আপনি সঠিক জানেন না?"

"না।"

"তা হলে কী করে ভাবছেন তিনি মৃত? তিনি তো ইহলোকেই থাকতে পারেন।"

pathagar.net

"থাকলে বিনয় আমার সঙ্গে যোগাযোগ করত। পঁচিশ বছর অদৃশ্য হয়ে থাকত না।"

শমননন্দন মাথা নাড়ল, "একেবারে নিশ্চিত না হয়ে ডাকলে বিপত্তি ঘটতে পারে।"

অর্জুন বলল, "ডেকে দেখুন না। না মারা গেলে তো আসবেন না।"

অনেক দ্বিধার পর শমননন্দন রাজি হল।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আমি মিডিয়াম হতে পারি?"

"নিজের মনকে চিন্তাশূন্য করতে পারলে হতে পারেন।"

"বেশ, চেষ্টা করছি।"

"কিন্তু মিডিয়াম হলে আপনি কোনও প্রশ্ন করবেন না। করার ক্ষমতাও থাকবে না।"

"আচ্ছা! তা হলে আপনিই হন। আমাকে তো প্রশ্ন করতে হবে।"

এবার ঝোলা থেকে যন্ত্র বের হল। শমননন্দন জিজ্ঞেস করলেন, "বিনয়ের কোনও ছবি আপনার কাছে কি আছে?"

চৌধুরীমশাই তৎক্ষণাৎ অ্যালবাম খুলে একটা ফোটোগ্রাফ বের করে দিলেন। অর্জুন দেখল একটি কিশোরের হাসি-হাসি মুখ। শমননন্দন বলল, "চোখ বন্ধ করে ওর মুখ স্মরণ করুন। আর কিছু না, শুধু ওর মুখ। মনে মনে ওর নাম জপুন।" যন্ত্রটি চালু করে নব ঘোরাতে বিপ বিপ আওয়াজ শুরু হল। ঈষৎ চোখ খুলে অর্জুন দেখল শমননন্দনের হাতে পেনসিল, সেটা খাতার ওপর সোজা করে ধরা।

মিনিটপাঁচেক বাদে মনে হল ঘরে কেউ এসেছে। একটু যেন বাতাস বয়ে গেল। চৌধুরীমশাই জিজ্ঞেস করলেন, "কে? কে এসেছে?"

"তোর বাপ।" খাতায় লেখা হল। চৌধুরীমশাই ঝুঁকে লেখাটা পড়ে সোজা হলেন।

"বাবা! বাবা, তুমি এসেছ?"

"তুই একটা শুয়োর।"

"কী? বাবা তুমি কী বলছ?"

"তুই একটা বেল্লিক। ছুঁচো। বদমাশ।" খসখস করে লেখা হচ্ছিল।

এবার অর্জুন বলল, "আপনি চৌধুরী-মেসোমশায়ের বাবা নন। কেন এসেছেন?"

"বেশ করেছি। হি হি হি।"

pathagar.net

তারপর পেনসিল স্থির হয়ে গেল। অর্থাৎ যে এসেছিল সে চলে গেছে। একটু বাদেই পেনসিল রেখে দিল শমননন্দন। মাথাটা ঈষৎ ঝুঁকল বুকের ওপর। তারপর সোজা হয়ে বসল।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কী হল?"

শমননন্দন খাতায় যে লেখা হয়েছিল সেটা পড়ল। একটু আগে তার নিজের হাত দিয়ে যে লেখা বেরিয়েছে তা যেন সে নিজেই জানে না। পড়ার পর বলল, "দুষ্ট আত্মা। আবার—আবার।"

অনেকক্ষণ পরে মনে হল ঘরে কেউ এসেছে। কীরকম একটা অস্বস্তি হল অর্জুনের। অথচ চোখে কিছু দেখা যাচ্ছে না। সে লক্ষ রেখেছিল শমননন্দনের দিকে। সম্মোহন করার কোনও চেষ্টাই লোকটা করছে না। অস্বস্তি তার একার হয়নি তা বোঝা গেল চৌধুরীমশাইয়ের কথায়, "কে?"

সঙ্গে সঙ্গে পেনসিলে লেখা হল, "চিনবে না। যাঁকে ডাকছ তার পক্ষে আসা সম্ভব নয়।"

"কেন?" চৌধুরীমশাইয়ের গলা কেঁপে উঠল।

"তোমরা ওঁর পূর্বাশ্রমের নাম ধরে ডাকছ। সে-জীবন তিনি মুছে ফেলেছেন। মৃত্যুর আগের জীবনই তাঁর শেষ জীবন। তখন তিনি সন্ন্যাসী।"

"তার সন্ন্যাসী-জীবনের নাম তো আমি জানি না।

"তা হলে আশা ছেড়ে দাও।"

"কিন্তু তাঁকে আমার খুব দরকার। পঁচিশ বছর আগে তিনি আমাকে দেড় লক্ষ টাকা দিয়ে বলেছিলেন রেখে দিতে, তিনি হিমালয়ে যাচ্ছেন। সেই থেকে টাকাটা আমার কাছে আছে, কিন্তু তিনি ফিরে আসেননি। তাঁর টাকা আমি স্পর্শ করিনি। মৃত্যুর আগে ওগুলোর কী গতি করে যাব সেটাই ওঁর কাছ থেকে জানতে চাই।" চৌধুরীমশাই একনিশ্বাসে বলে গেলেন।

"এসব নিয়ে ভাবার কোনও কারণ আর তাঁর নেই। তিনি অনেক ঊর্ধ্বে চলে গেছেন।"

লেখা শেষ হওয়ামাত্র অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "যমনন্দন কোথায় আছে?"

কোনও উত্তর লেখা হল না। পেনসিল পড়ে গেল খাতার ওপরে। মাথা ঝুঁকে গেল শমননন্দনের। কোনওমতে যন্ত্র বন্ধ করে সে ওই ভঙ্গিতেই বসে রইল।

"সর্বনাশ হয়ে গেল।" ওপাশ থেকে চৌধুরীমশাই বললেন।

"কেন?" অর্জুন তাকাল।

pathagar.net

"কাল থেকে খুব আশা করেছিলাম বিনয়ের সঙ্গে কথা বলতে পারব। সে আমাকে বলে দেবে টাকাটার কী ব্যবস্থা করব!" নিশ্বাস ফেললেন বেশ জোরেই।

"এক কাজ করুন। ওঁর নাম করে ভারত সেবাশ্রমে দান করে দিন।"

"ভারত সেবাশ্রমে?"

"হ্যাঁ। অসহায় মানুষের পাশে ওঁরা সবসময় আছেন।"

"হুম। একটা কথা বলব বাবা। এই টাকাটার কথা যেহেতু কেউ জানে না তাই তুমি যদি মুখ বন্ধ রাখো তা হলে ভাল হয়।" চৌধুরীমশাই অনুরোধ করলেন।

"আপনি চিন্তা করবেন না। তবে আর একজন সাক্ষী থেকে গেল।" অর্জুন বলল।

"ওঁর তো চৈতন্য ছিল না। কিছুই কানে যায়নি।"

শমননন্দনের নাড়ি খুব দুর্বল। তাকে ওখানেই শুইয়ে দেওয়া হল। ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে আসামাত্র বনমালী উৎফুল্ল গলায় জানাল, "ছোটদিদি এসে পড়েছেন।"

দোতলার বসার ঘরে ওরা বসে ছিল। মধ্যবয়সি এক ভদ্রলোক, শীর্ণ চেহারার এক মহিলা যাকে দেখলেই বোঝা যায় অঞ্জনাদির বোন, একটি বছর চারেকের শিশু। ওদের দেখে চৌধুরীমশাই বেশ রেগে গেলেন, "তোমাদের কাণ্ডকারখানা দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি। বিদেশবিভুঁইতে আছ, মেয়েটার জন্ডিস হয়েছে আর আমাদের খবর দাওনি?"

জামাই বললেন, "আদ্রাতে ভাল ডাক্তার আছে। বিশেষ করে ডক্টর সমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যিনি বই লেখেন, তিনি তো যথেষ্ট ভাল ডাক্তার। তা ছাড়া এখন তো ও প্রায় সেরে উঠেছে। তাই আপনাদের বিরক্ত করতে চাইনি।"

"আমরা বিরক্ত হব তা তোমাকে কে বলল? জন্ডিস সেরে গেলেও আবার হওয়ার ভয় থাকে। ওর মুখ থেকে তো এখনও হলদে ভাব যায়নি। বনমালী?"

"বলুন বাবু।"

"এখন থেকে ওর সব দায়িত্ব তোমার। বড়দিকে খবর দাও। তাকে বলো ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে খাবারের লিস্ট তৈরি করে আনতে। এখানে ও এখন বিশ্রাম নেবে।"

Pathagar.net

"ঠিক আছে। আমি এখনই ফোন করছি।"

"আঃ। এখনই ফোন করছি। অতটা জার্নি করে এল, ওকে চিনির শরবত আর একটা সন্দেশ দাও। জামাই আর সোনামণির জলখাবারের ব্যবস্থা করো।"

রঞ্জনা হাসল, "বাবা, তুমি মিছিমিছি ব্যস্ত হচ্ছ। আমাকে কী কী করতে হবে সব ডক্টর চট্টোপাধ্যায় লিখে দিয়েছেন। আর এখন তো দুপুর, জলখাবার খাওয়ার সময় নয়।"

"ও। তা হলে শরবত আনো। আর হ্যাঁ, একে তুই চিনিস?"

"দেখেছি। দিদির বাড়িতে। নাম তো আগেই শুনেছি। উনি এখানে?"

অর্জুন হেসে ফেলল, "আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আমি খুব খারাপ লোক।"

"তা নয়। কারও বাড়িতে ডাক্তার কিংবা পুলিশকে আসতে দেখলে যেমন চিন্তা হয়, তেমনই আপনাকে দেখা মানে কোনও রহস্য রয়ে গেছে বলে মনে হয়।"

শরবত এল। টুকটাক গল্প চলছিল। অর্জুন লক্ষ করছিল, চৌধুরীমশাই একবারও ছোট মেয়ে-জামাইকে শমননন্দনের কথা বলছেন না। শরবত খাওয়ার পর চৌধুরীমশাই তাড়া দিলেন স্নান সেরে নিতে। বোঝা গেল এ বাড়িতে দুই মেয়ের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা করে রেখেছেন চৌধুরীমশাই। ছোট জামাই মেয়েকে নিয়ে তাদের ঘরে চলে যেতে রঞ্জনা উঠে দাঁড়াল।

অর্জুন বলল, "একটু বসবেন?"

"কেন?" অবাক হল রঞ্জনা, কিন্তু বসল।

"আচ্ছা, আপনি আপনার মায়ের আলমারি কখনও খুলেছেন?"

"হঠাৎ এ কথা?" রঞ্জনা অবাক।

চৌধুরীমশাই বললেন, "এমন কিছু বড় ব্যাপার নয়, তুই বল না।"

"হ্যাঁ, খুলেছি।"

"কেন?"

"মাকে তো তেমন করে পাইনি। তাই ওঁর শাড়ি গয়না দেখতে আমার ভাল লাগে।"

"ওঁর শাড়ি তো আপনি পরেননি।"

"না। দিদিও না।"

"আপনার মায়ের আলমারির ওপরের তাকের বাঁ দিকে একটা চোরাকুঠরি আছে, আপনি কখনও সেটা খুলে দেখেছেন?"

pathagar.net

রঞ্জনা চট করে বাবার দিকে তাকাল। তারপর মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ।"

সেখানে কিছু ছিল?"

"হ্যাঁ। দু'জোড়া সোনার দুল। বাবাকে বলব-বলব করে ভুলে গিয়েছি। খুব সুন্দর। আমি আবার সে-দুটোকে বাবার আলমারির লকারে রেখে গিয়েছি।"

"আমার আলমারির লকারে?" চৌধুরীমশাই অবাক!

"হ্যাঁ। তোমার তখন শরীর খারাপ ছিল, বলতে গিয়েও বলতে পারিনি।"

চৌধুরীমশাই তখনই নিজের ঘরে চলে গেলেন।

রঞ্জনা জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে বলুন তো?"

"তেমন কিছু নয়। এক সাধুর মারফত উনি জানতে পেরেছিলেন ওই চোরাকুঠরিতে সোনার দুল আছে। কিন্তু খুঁজে পাননি বলে বিশ্বাস হয়নি।"

রঞ্জনা হেসে ফেলল, "ওঃ, এই রহস্য সমাধানের জন্যে বাবা আপনাকে ডেকে এনেছে। ইস, আমি আসায় আপনাকে পরিশ্রম করতে হল না।"

ইতিমধ্যে চৌধুরীমশাই দুটো ভেলভেটের বাক্স নিয়ে ফিরে এলেন। তাঁর মুখে হাসি, "এগুলো রেখেছিলি?"

"হ্যাঁ।" মাথা নাড়ল রঞ্জনা।

টেবিলে বাক্সগুলো রেখে চৌধুরীমশাই বললেন, "দুই বোন ভাগ করে নিয়ে নে।"

"দিদি আসুক। আমি এলাম।" অর্জুনকে শেষ কথাটা বলে রঞ্জনা চলে গেল।

সে অদৃশ্য হওয়ামাত্র চৌধুরীমশাই অর্জুনের দিকে তাকালেন। "কী বুঝছ?"

"সব গুলিয়ে যাচ্ছে।"

"তা হলে আমার স্ত্রী নিশ্চয়ই এসেছিলেন। তিনি ছাড়া এই গয়নার অস্তিত্ব কারও জানার কথা নয়। বিশেষ করে শমননন্দন তো জানতেই পারে না।"

"তাই তো মনে হচ্ছে।" অর্জুন বলল।

"তাই তো মনে হচ্ছে মানে কী? আত্মা আছেন, ঠিকঠাক ডাকলে তাঁরা আসেন, এই সত্যি কথাটাকে তোমরা মানতে পারো না কেন?" রেগে গেলেন চৌধুরীমশাই।

"আপনার সঙ্গে আমি তর্ক করব না। আমার শুধু একটাই প্রশ্ন।"

"বলো।"

"এই শহরে হাজার হাজার বাড়ি। তার একটাতেও না গিয়ে শমননন্দন

pathagar.net

কেন এই বাড়িতে এল? আপনাকে বেছে নেওয়ার পেছনের কারণ কী?"

"অ্যাক্সিডেন্ট। হঠাৎই হয়ে গেছে। লটারির মতো।"

"কী জানি! আচ্ছা, আমি এখন চলি। আপনি শমননন্দনকে বলবেন তিনটের মধ্যে আমি ফিরে আসব। ততক্ষণ যেন সে আমার জন্যে অপেক্ষা করে।" অর্জুন উঠে দাঁড়াল।

"কেন? সে কি বলেছে আজই চলে যাবে?"

"তার তো সেরকম ইচ্ছে।"

"সে কী! না, না, আমার এখনও অনেক কিছু জানার বাকি আছে।"

"এ কী! আপনি আজই বলেছেন বিনয়বাবুর ব্যাপারটা জানলেই হয়ে যাবে।"

"আঃ। থামো তো। তখন সে রাজি হচ্ছিল না বলে বলেছিলাম। ঠিক আছে, এতদিন টাকাপয়সার কথা বলেনি, এখন আমি পার কোশ্চেন ওকে এক হাজার করে দেব।"

"একটু বেশি দেওয়া হবে না?"

"এই তো মুশকিল। হিরে আর লোহা এক দাম হয়? সে যা পারছে আর কেউ করে দেখাক, আমি তখন দাম কমিয়ে দেব।"

"বেশ, ওকে বলুন কথাটা।"

"না। কীরকম সংকোচ লাগছে। তুমি যদি আমার হয়ে ওকে বলো—।"

"বেশ। আমি তো আসছি তিনটের সময়, ওকে বলবেন।" অর্জুন বেরিয়ে এল।

বেণু দত্তরায় জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন একসময়। তখন অর্জুন তাঁর ছাত্র ছিল। সে-সময়েই ভদ্রলোক আলিপুরদুয়ারে চলে যান অধ্যাপনা নিয়ে। যেহেতু এই শহরে বাড়ি তাই ছুটিছাটায় আসেন। এখন অবসর নেওয়ার পর পাকাপাকি চলে এসেছেন। চৌধুরীমশাইয়ের বাড়ি থেকে বেরিয়ে অর্জুন সোজা তাঁর বাড়িতে চলে এল।

বেণু দত্তরায় তখন স্নানে যাবেন, অর্জুনকে দেখে অবাক হলেন। "কী হে আর সময় পেলে না?"

"খুব দুঃখিত এই অসময়ে আসার জন্যে। একটু সময় দেবেন?" অর্জুন বলল।

"তোমরা যারা পুরনো ছাত্র তাদের তো না বলতে পারি না। চা খাবে?"

"না, না।"

"বোসো। বলো, কী উদ্দেশ্যে তব আগমন।"

"জলপাইগুড়ির নদীগুলোর মধ্যে শুধু ডায়না নদীর নামটা কি বিদেশি?"

"একটা আটচল্লিশ কিলোমিটারের নদী নিয়ে তোমার এত দুশ্চিন্তা?"

"নদী নিয়ে নয়, নদীর নাম নিয়ে।" অর্জুন বলল।

"দ্যাখো, জলপাইগুড়ির মেজর নদী হল, তিস্তা, তোরসা, জলঢাকা, কালজানি, সংকোশ, রায়ডাক, গদাধর, ডিমা, মুজগই, ডুডুয়া, ডায়না, ধরলা, করলা, যমুনা, করতোয়া। এর মধ্যে কোন নামটাকে বিদেশি শব্দ বলে মনে হচ্ছে?"

"ডায়না।"

"তোরসা নয় কেন? তোরসা ভুটানি শব্দ। তোয়া-রোশা। মানে ক্রুদ্ধ জলরাশি। ভুটান তো বিদেশ।"

"ও। তা হলে দুটো বিদেশি নামের নদী পাওয়া গেল।"

"হ্যাঁ। তোরসা ভুটানের চেন্দুয়ার দুর্গ থেকে বেরিয়ে চেংমারি বামনডাঙা হয়ে নাথুয়ার কাছে জলঢাকার সঙ্গে মিলিত হয়েছে।"

"তিস্তার সঙ্গে নয়?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।।

"না। তোরসা এই জেলার হান্টুপাড়া, মাদারিহাট, সোনাপুর দিয়ে কোচবিহারে চলে গিয়েছে। তারপর বাংলাদেশে ঢুকে ব্রহ্মপুত্রে গিয়ে মিশেছে। আর কী জানতে চাও?"

"বাঘের হাট নামে যে শ্মশানটার কথা শুনলাম সেটা কি ডায়নার পাশে?"

"ঠিক ডায়নার পাশে বলা যাবে না। ডায়না যেখানে জলঢাকার সঙ্গে মিশছে, সেখানে। আর একটা শ্মশান আছে, তার নাম বাঘাটি। সেটা বানারহাট ছাড়িয়ে মালবাজারের দিকে যেতে যে ডায়না নদী পড়ে, তার উজানে।

অর্জুন ধন্দে পড়ল। পোড়া গদাই যা বলেছে সেইমতো গেলে শ্মশানটার নাম হবে বাঘাটি। তবে কি লোকটা ভুল করল! অশিক্ষিত মানুষের মুখে মুখে অনেক নাম বদলে যায়। তাই বাঘাটি হয়তো বাঘের হাট হয়ে গেছে। এদিকে বাঘের হাট নামেও তো একটা শ্মশান আছে। সে জিজ্ঞেস করল, "এই বাঘের হাটে কীভাবে যাওয়া যায়?"

"সোজা নাথুয়ার বাসে চেপে চলে যাও। ওখান থেকে সাইকেল রিকশা নিয়ো। আবার বাসে চেপে গয়েরকাটায় গিয়েও নাথুয়াতে যেতে পারো। কিন্তু কী

ব্যাপার হে, হঠাৎ শ্মশানের খোঁজ করছ কেন? নতুন কোনও রহস্যের সন্ধান পেয়েছ নাকি?"

"তেমন কিছু নয়। আচ্ছা স্যার, আপনি আত্মায় বিশ্বাস করেন?"

"দুর! মানুষের ওপর পুরোপুরি বিশ্বাস জন্মাল না এখনও, আত্মা নিয়ে ভাবার সময় কোথায়? কোটি কোটি মানুষ সৃষ্টির পর থেকে মরেছে। আত্মা থাকলে তারা তো আকাশে গিজগিজ করছে।"

"রবীন্দ্রনাথ করতেন।"

"রবীন্দ্রনাথ তো কর্মযজ্ঞে বিশ্বাস করতেন, উপনিষদ তাঁকে পথ দেখাত। ওঁকে মাপতে যেয়ো না, অন্ধের হস্তিদর্শন হবে।" বেণু দত্তরায় বললেন।

দুপুরের খাওয়া শেষ হলে অর্জুন মাকে জানাল তার আজ ফিরতে রাত হবে, তেমন বুঝলে কাল সকালে ফিরবে। মা ছেলের ওই জীবন এখন মেনে নিয়েছেন। জিজ্ঞেস করলেন, "নতুন কেস পেয়েছিস?"

"ঠিক কেস নয়। অনেকটাই কৌতূহল। নিজের সঙ্গে লড়াই।" অর্জুন বলল।

"সে আবার কী?"

"যা আমি বিশ্বাস করি না, যাকে এতকাল কুসংস্কার বলে মনে করেছি সেটা যখন অনেক প্রমাণ দেখিয়ে সামনে আসে তখন হকচকিয়ে যেতে হয়। আমার এখন সেই অবস্থা।"

"কোথায় যেতে হবে তোকে?"

"একটা শ্মশানে।"

"শ্মশানেমশানে শুধু কৌতূহল মেটানোর জন্যে যাওয়ার কোনও দরকার নেই।"

"ভয় নেই, একজন সাধুবাবা থাকছেন সঙ্গে। যে-সে সাধুবাবা নন, একেবারে সেই মানস সরোবর ফেরত।" অর্জুন বলল।

"বুঝতে পেরেছি। ওই পোড়া গদাইকে অত রাতে এ বাড়িতে আসতে দেখে মন কু ডেকেছিল। এই যে আগেভাগে মনে আসাটাকে তোরা তো কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দিবি।" মা চলে গেলেন।

পুরো ব্যাপারটা আর একবার মনে মনে ঝালিয়ে নিল অর্জুন।

চৌধুরীমশাই প্ল্যানচেটে বিশ্বাস করেন। শমননন্দন ওই প্রস্তাব দিতে তাঁর

pathagar.net

তো রাজি হওয়ারই কথা। আসনে বসে তিনি প্রথমে স্ত্রীকে ডেকেছেন। স্ত্রী তাঁর আলমারির চোরাকুঠুরিতে যে দুল রাখার কথা বলেছেন এটা শমননন্দনের জানার কথা নয়। পরে রঞ্জনা এলে জানা গেছে, ব্যাপারটা সত্যি। চৌধুরীমশাই নিজের মাকে ডেকেছিলেন। তিনি বলে গেছেন যে রঞ্জনা অসুস্থ এবং জন্ডিস হয়েছে। ফোন করে জানা গেছে ব্যাপারটা সত্যি। এটা হয়তো অলৌকিক নয়। শমননন্দন রঞ্জনার খবর নিয়ে এসে মায়ের বক্তব্য বলে লিখে ফেলতে পারে। কিন্তু পাশাপাশি আর একটা প্রশ্ন উঠে আসছে। সেটা হাতের লেখা নিয়ে। চৌধুরীমশাই জোর গলায় বলেছেন স্ত্রীর কথাগুলো যেভাবে লেখা হয়েছে সেইভাবেই জীবিত অবস্থায় তিনি লিখতেন। শুধু স্মৃতির ওপর নির্ভর করে কেউ অন্যের হাতের লেখা ঠিকঠাক নকল করে যেতে পারে না।

যখনই কোনও আত্মাকে ডাকা হচ্ছে তখনই মিডিয়াম অসুস্থ হয়ে পড়েছে। শমননন্দনের ক্ষেত্রে ওটা অভিনয় হলেও পোড়া গদাই তো অভিনয় করেনি। তার মানে ওই সময় মানসিক চাপ প্রবল হওয়ায় শরীর সইতে পারে না। শমননন্দন যেচে এই অসুস্থতা নিচ্ছে কেন?

গুরুদেবকে ডেকে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারেনি শমননন্দন। তিনি পোড়া গদাইয়ের হাত দিয়ে একটা ধাঁধা লিখে গিয়েছেন। ধাঁধাটায় অবশ্য রহস্য কম কিন্তু পোড়া গদাইয়ের পক্ষে নিজে থেকে লেখা সম্ভব নয়। কিন্তু যমনন্দনের খবর জানার পর থেকেই শমননন্দন তার সন্ধানে যেতে চাইছে। ওই বাড়িতে আর থাকতে চাইছে না।

চৌধুরীমশাই মনে করছেন তার বন্ধু বিনয় মৃত কিন্তু সঠিক জানেন না। তাকে যতবার ডাকা হচ্ছিল ততবারই সব খারাপ আত্মা আসছিল। শেষে যিনি এলেন তিনি জানিয়েছেন যে, জীবিত অবস্থায় নিজের বিনয়সত্তাকে নষ্ট করে সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলেন বলে ওঁর পক্ষে ওই নামে ডাকলে আসা সম্ভব নয়।

অর্থাৎ বিনয় মারা গিয়েছেন জীবদ্দশায়। মারা গিয়ে সন্ন্যাসী হয়েছেন। এবং সেই সন্ন্যাসীও দেহ রেখেছেন। অতএব চৌধুরীমশাইয়ের কাছে রেখে যাওয়া দেড়লক্ষ টাকা ফেরত নিতে তিনি কখনওই আসবেন না।

শমননন্দন এখন যমনন্দনের দর্শন চায়। মজার কথা হল, এই অজ্ঞাত ব্যাপারটা সে আত্মাদের ডেকে জেনে নিতে পারছে না। এটাই অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার। ভাল আত্মারা একটি দুষ্ট আত্মাকে শাস্তি দিতে সাহায্য করছে না কেন?

শমননন্দন এবং যমনন্দন মুখোমুখি হলে কী ঘটনা ঘটবে তা জানার

Pathagar.net

কৌতূহল হচ্ছিল খুব। ঠিক তিনটের সময় অর্জুন চৌধুরীমশাইয়ের বাড়িতে পৌঁছে গেল।

দুই জামাই আর অঞ্জনাদি সোফায় বসে ছিলেন। পাশের ডিভানে রঞ্জনা শুয়ে ছিল। অর্জুনকে ঘরে ঢুকতে দেখে সে উঠে বসতে যাচ্ছিল, অঞ্জনাদি বাধা দিলেন, "আরে তুই উঠছিস কেন? শো, শুয়ে থাক। অর্জুন আমার ছোট ভাই।"

দীপকদা বললেন, "অনেক ধন্যবাদ।"

"কারণ?"

"শুনলাম তুমি নাকি বলে গেছ এ-সময় এসে ভণ্ডটাকে নিয়ে যাবে।" দীপকদা বললেন।

অঞ্জনাদি আপত্তি করলেন, "এই, এভাবে বোলো না। সাধু যে ভণ্ড তার প্রমাণ পাইনি এখনও।"

ছোট জামাই বললেন, "উলটে কয়েকটা সত্যি কথা বলে বিভ্রম তৈরি করেছেন।"

"দুর! ওগুলো কাকতালীয় ব্যাপার। অনেকেই আলমারিতে চোরা কুঠুরি রাখে। মা মারা যাওয়ার পর ওটা ভাল করে দেখা হয়নি বলে অঞ্জনারা জানে না। হাতের লেখা বাবার মনের বিভ্রম। আর রঞ্জনার অসুখের খবর নিয়েই ভণ্ডটা এখানে এসেছে। প্রেত বা আত্মায় যদি তোমরা বিশ্বাস করো তা হলে গ্রামে যারা ডাইনি সন্দেহ করে মানুষ পোড়ায় তারা কী দোষ করল।" দীপকদা বললেন।

"মেসোমশাই কোথায়?"

"শুয়ে আছেন। শমননন্দন চলে যাবে বলে মনখারাপ।" অঞ্জনাদি বললেন।

"বোসো। কীরকম সম্মোহন করেছে লোকটা।" দীপকদা বললেন।

"মেসোমশাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে পারি কি?"

"হ্যাঁ। যাও।" দীপকদা হাত নাড়লেন।

অঞ্জনাদি ওকে চৌধুরীমশাইয়ের শোয়ার ঘরের দিকে নিয়ে যেতে জিজ্ঞেস করলেন, "ওকে নিয়ে তুমি কি বাইরে কোথাও যাচ্ছ?"

"মানে?"

"তুমি নিয়ে যাচ্ছ শুনে ভাবলাম বলি শহরের বাইরে নিয়ে যাও ওকে, যেন আর বাবার কাছে আসতে না পারে।"

pathagar.net

"সেটা কী করে সম্ভব? যদি একশো মাইল দূরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিই তা হলেও তো ইচ্ছে করলে ফেরত আসতে পারে। ও তো আর পশু নয়। অবশ্য বেড়াল শুনেছি ঠিক গন্ধ শুঁকে ফিরে আসে তবে একশো মাইল দূরে গিয়ে ফিরতে পারে কি না জানি না।" অর্জুন গম্ভীর গলায় বলল।

দরজায় দাঁড়িয়ে অঞ্জনাদি ডাকল, "বাবা।"

শুয়ে ছিলেন চৌধুরীমশাই। অর্জুনকে দেখতে পেয়ে উঠে বসলেন, "ও, তুমি! এসো।"

অঞ্জনাদি দাঁড়িয়ে থাকলেন একটু, তারপর চলে গেলেন।

অর্জুন বলল, "মেসোমশাই, সত্যি আপনার বন্ধু বিনয়বাবু দেড় লক্ষ টাকা দিয়ে গেছেন?"

"আরে। আমার মিথ্যে কথা বলার কী দরকার।" বিরক্ত হলেন বৃদ্ধ।

"আপনার তো বেশ ভারী অসুখ হয়ে গেছে। যদি কিছু হয়ে যেত তা হলে তো কেউ জানতেও পারত না ব্যাপারটা," অর্জুন চেয়ারে বসল।

"তা অবশ্য।"

"আপনি ভারত সেবাশ্রমে দিয়ে দিন।"

"দাঁড়াও। কলকাতায় আমার এক সাংবাদিক বন্ধু আছেন। ইংরেজি কাগজের চিফ রিপোর্টার ছিলেন। এখন অবসর নিয়েও কলাম লেখেন। আমি তাঁর উত্তরের অপেক্ষায় আছি।"

"কীসের?"

"কুম্ভমেলায় যে বাঙালি সাধু মারা গিয়েছেন তাঁর পরিচয় জানতে চাই আমি। বন্ধু আমাকে বলেছে খোঁজ নিয়ে জানাবে।"

"ধরুন, ওই সাধু আপনার বন্ধু নন।"

"ঠিক। কিন্তু সে তো মারা গিয়েছে। নিজের চোখেই তো পড়লে।"

"ব্যাপারটা আপনি বিশ্বাস করেন?"

"ওঃ! তুমি দেখছি আমার মেয়ে-জামাইয়ের মতো কথা বললে। আচ্ছা, এই যে শমননন্দন এল, চলে যাচ্ছে, ওর কী স্বার্থ ছিল এখানে আসার পেছনে? বলো? একটা টাকাও তো চায়নি। কিন্তু তুমি ওকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?" উদ্বিগ্ন দেখাল ওঁকে।

"আপাতত নাথুয়ায়।"

"নাথুয়া? এখন গিয়ে সেখান থেকে ফিরবে কী করে?"

"আমার মোটরবাইক আছে।"

pathagar.net

"কাজ শেষ হয়ে গেলে ওকে এখানেই ফিরিয়ে এনো।"

"কথা দিতে পারছি না, উনি আসতে চাইলে নিয়ে আসব।"

"যাও। আর কী বলব!"

"একটা ছোট্ট প্রশ্ন আছে।"

তাকালেন চৌধুরীমশাই।

"বিনয়বাবু কেন আপনার কাছে টাকাটা রেখে গেছেন?"

"জানি না।"

"ওঁর কোনও আত্মীয়স্বজন নেই?"

"বিয়ে করেনি। ভাইপোরা আছে। তাদের ব্যবহারে খুব বিরক্ত ছিল।"

"উনি কি শুধুই বন্ধু ছিলেন, না অন্য কোনও সম্পর্ক ছিল?"

"ও ব্যবসা করত। ছোটখাটো। টাকার দরকার পড়লে আমার কাছ থেকে নিত, আবার শোধ করে দিত।" গম্ভীর মুখে বললেন চৌধুরীমশাই।

"আপনি প্রয়োজনে নিতেন?"

"এক-আধবার হয়তো নিয়েছি। কেন?"

"না, এমনই। আচ্ছা চলি।"

শমননন্দন তৈরি হয়েই ছিল। অর্জুনকে দেখে ব্যস্ত হল, "অনেক দেরি করলেন বাবা। আপনি কি ধাঁধাটার প্রকৃত অর্থ ধরতে পেরেছেন?"

"হ্যাঁ। চলুন।"

"কোথায় যেতে হবে?"

"আপনি কি এদিককার সব জায়গা চেনেন?"

"না।"

"তা হলে বললে বুঝতে পারবেন না।"

"চৌধুরীমশাইকে একবার বলে যাই।"

"দরকার নেই। ওঁর শরীর খারাপ। আমি জানিয়ে এসেছি।"

দোতলার দর্শকদের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় শমননন্দন একটু দাঁড়াল। হাতজোড় করে নমস্কার করল। তারপর নীচের দিকে পা বাড়াল। দর্শকরা কেউ কোনও শব্দ উচ্চারণ করল না। গেটের বাইরে এসে বাড়িটাকে মুখ ঘুরিয়ে দেখল একবার।

ইঞ্জিন চালু করে অর্জুন বলল, "উঠে পড়ুন।"

"এ কী! এখানে উঠতে হবে?"

"হ্যাঁ। কোনও ভয় নেই। নিশ্চিন্তে বসুন।"

pathagar.net

"অন্য কোনওভাবে, মানে, বাসে যাওয়া যায় না?"

"তার চেয়ে আরামে এবং আগে যাবেন। উঠুন।"

শমননন্দন কোনওমতে উঠে বসল। বসে শক্ত হাতে অর্জুনকে ধরল। অর্জুন বলল, "সহজ হোন। আমাকে নয়, পেছনে একটা হাতল পাবেন, সেটা ধরুন।"

শমননন্দন বিড়বিড় করল, "গুরুদেব দয়া করো দীনজনে।"

তিস্তা পেরিয়ে বার্নেশ, ময়নাগুড়ি বাইপাস, ধূপগুড়ি হয়ে গয়েরকাটায় এসে বাইক থামাল অর্জুন। বাইক চলতে শুরু হওয়ার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই কানে গুনগুনানি ভেসে এসেছিল। সেটা যে শমননন্দনের মন্ত্রোচ্চারণ তা প্রথমে বুঝতে পারেনি অর্জুন। এতটা পথ একটিবারের জন্যেও সেই শব্দ থামায়নি লোকটি।

গয়েরকাটার চৌমাথায় এসে বাইক থামিয়ে শমননন্দনকে নীচে নামতে বলল সে। শমননন্দন মাথা নাড়ল, "পারব না। পা অসাড় হয়ে গিয়েছে বাবা। আমার পা আমার বশে নেই।"

"নেমে দাঁড়ান, ঠিক হয়ে যাবে।"

"আমার হাত ধরো বাবা।"

তাই ধরতে হল। বোঝা যাচ্ছিল ওর বাঁ পায়ে জোর নেই। ওকে ওখানেই দাঁড়াতে বলে নীরদের পানের দোকানে চলে এল সে। এর আগে খুঁটিমারি রেঞ্জের সময় অর্জুনের সঙ্গে নীরদের আলাপ হয়েছিল। দেখা গেল নীরদ সেটা মনে রেখেছে, "আরে! অনেকদিন পরে দেখছি!"

"হ্যাঁ। আপনি ভাল আছেন?"

"এই বুড়ো বয়সে যেমন থাকা যায়। এখন কাজকর্ম কোথায় করা হচ্ছে।"

অর্জুন বুঝতে পারল তার সত্যসন্ধানের খবর নীরদের কাছে পৌঁছয়নি। সে বলল, "ঘোরাঘুরির কাজ। আচ্ছা, বাঘের ডাক শ্মশানটা কোথায়? নাথুয়ার কাছে শুনলাম!"

"শ্মশান ছিল এককালে। দু' বছর আগের বন্যায় দুই নদী মিলেমিশে সেটাকে গ্রাস করে নিয়েছে। কিছুটি খুঁজে পাবেন না। ওদিকের লোকজন মড়া নিয়ে আসে আংরাভাসায়।"

"শ্মশান না থাক জায়গাটা তো আছে।"

"না। ওই শ্মশানে রাতদুপুরে বাঘের ডাক শোনা যেত বলে নাম হয়েছিল বাঘের ডাক। শ্মশানও গিয়েছে, নামও কেউ বলে না।"

"সোজা খুঁটিমারি জঙ্গল দিয়ে চলে যাব?"

"হ্যাঁ। তবে সন্ধের পর না যাওয়াই ভাল।"

"কেন?"

"কাগজে পড়েননি? এইসব জঙ্গলে উগ্রপন্থীরা ঘাঁটি গেড়ে বসে আছে। সন্ধের পর তাদের কাজকর্ম বাড়ে। তখন পাবলিক দেখলে খুব বিরক্ত হয়।"

অর্জুন হেসে ফেলল কথা শুনে। বলল, "আপনি এমনভাবে কথাটা বললেন যে, আমার মনে হল ওই অঞ্চলে মানুষখেকো বাঘ বেরিয়েছে অথবা ভূতের উপদ্রব হয়েছে।"

নীরদ হেসে বলল, "এরা তার ঠাকুর্দা। তবে লোক্যাল লোকদের ঘাঁটায় না।"

খুঁটিমারির জঙ্গল এখন অনেক হালকা হয়ে গিয়েছে। দু'পাশে গাছপালা, মাঝখানে চওড়া বাঁধানো রাস্তা, মাঝে-মাঝেই মিলিটারি গাড়ি দেখা যাওয়ায় অর্জুনের মনে হল নীরদের কথাটা সত্যি। বেশ জোরে বাইক চালিয়ে সন্ধের মুখেই ওরা পৌঁছে গেল নাথুয়ায়।

নাথুয়া একটা ছোট্ট গঞ্জমতো জায়গা। দেখা গেল নীরদের কথাটা সত্যি। স্থানীয় মানুষ বললেন, "শ্মশান আর নেই। নতুন শ্মশানের জন্যে কেউ আর জমি ছাড়তে রাজি নয়।"

ওদের জিজ্ঞেস করে ওরা যেখানে পৌঁছল সেখানেই দুটো নদী পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেছে। ডায়নার তুলনায় জলঢাকা অনেক বড়, সিকিম থেকে বেরিয়ে এসে দার্জিলিং জলপাইগুড়ি কোচবিহার হয়ে বাংলাদেশে গিয়ে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিশেছে। সে-দিক থেকে ডায়না তো মাত্র আটচল্লিশ কিলোমিটারের নদী। এখন জলঢাকায় বেশ জল থাকলেও ডায়না অনেকটাই শীর্ণ। শুকনো পাথরের গা দিয়ে সামান্য স্রোত বয়ে যাচ্ছে জলঢাকায়। অর্জুন শমনন্দনকে বলল, "এই তো, বিদেশিনী নদী এখানে স্বদেশিতে মিশেছে এর নাম ডায়না আর ওর নাম জলঢাকা।"

শমনন্দনের চোখ সঙ্গে সঙ্গে চারপাশে ঘুরল। দূরে কিছু মাটির বাড়ি, টিনের চাল। একটা মুদির দোকান। ডায়নার ধার দিয়ে রাস্তা চলে গেছে। অর্জুন বলল, "চলুন।"

pathagar.net

শমননন্দন এবার বাইকে উঠল না। অতএব অর্জুনকেও বাইক নিয়ে হাঁটতে হল।

মুদির দোকানে দু'জন লোক বসে গল্প করছে। গ্রাম্য মুদির দোকানের চেহারা একই রকম। হঠাৎ একজন লোক শমননন্দনকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করল, "কবে এলেন বাবা?"

শমননন্দনও হাতজোড় করল, "এই তো, এখনই।"

"আপনার গলাটা অন্যরকম শোনাচ্ছে।" লোকটার চোখ ছোট হল।

"না তো, আমার কণ্ঠস্বর ঠিকই আছে।"

"সে-বার এখানে যে ঝামেলাটা হল সেটা মাথাগরম কয়েকটা ছোকরার জন্যে। আসলে যখন শ্মশান ছিল তখন আপনাদের মতো সাধুবাবারা সেখানে এসে ঘর তৈরি করতেন, গাঁজা, ভাং খেতেন, সাধনা করতেন, কারও চোখে লাগত না। এই যে আপনি বটগাছতলায় আখড়া করলেন, সেটাই হয়ে গেল কাল। বটগাছ হল নটবর রায়ের সম্পত্তি। সে ভাবল বেশিদিন থাকলে ওটা তার হাতছাড়া হয়ে যাবে। দিল ছোকরাগুলোকে খেদিয়ে।"

"আপনারা কী বলছেন আমি বুঝতে পারছি না বাবা।" অবাক হয়ে বলল শমননন্দন।

অর্জুন অনুমান করল। করামাত্র সে সক্রিয় হল, "ওই কারণে ইনি এসেছেন আজ। নটবরবাবুকে বলবেন তার কোনও চিন্তা নেই। উনি সাধুমানুষ, বেশিদিন এখানে থাকতেনও না। সে-বার বিদায় না নিয়ে চলে যেতে হল বলে এসেছেন।"

মুদির দোকানদার বলল, "আপনাকে তো চিনলাম না বাবু!"

"আমি সত্যসন্ধানী। আমার নাম অর্জুন।"

লোকগুলো কিছুই বুঝল না। একজন আর একজনের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল, "পুলিশ।"

অর্জুন হাত তুলল, "না দাদা, আমি পুলিশ নই।"

"এই যে বললেন সত্য—সত্য—!" লোকটি পুরো শব্দ উচ্চারণ করতে পারল না।

"সত্যসন্ধানী। আমি রহস্যে ঢাকা সত্যকে সন্ধান করি। আচ্ছা, এই সাধুবাবাকে দেখে আপনাদের মনে হচ্ছে ইনি আগে এখানে ছিলেন?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"বাঃ, মনে থাকবে না? ওই বটগাছটার নীচে ওঁর আখড়া ছিল। কত লোক

pathagar.net

আসত ওঁর কাছে। অমাবস্যার রাত্রে উনি ভূতপ্রেতের সঙ্গে কথা বলতেন!"

"ঠিক এই সাধুবাবা?"

"হ্যাঁ, মশাই।" সবাই বেশ জোর দিয়ে বলল।

শমননন্দন তীব্র প্রতিবাদ করল, "মিথ্যে কথা, আমি কখনওই এখানে আসিনি।"

"আসেননি? এখানে আপনার ঝোলা চুরি যায়নি? শহর থেকে যে-লোকটা এসে আপনার পা টিপত, সে ঝোলা চুরি করে হাওয়া হয়ে যায়নি?"

"না! এই তো আমার ঝোলা, এটা তো কখনও চুরি যায়নি!" শমননন্দন অর্জুনের দিকে তাকাল, "এঁরা কী বলছেন আমি তার কিছুই বুঝতে পারছি না বাবা!"

অর্জুন মাথা নাড়ল। সে দেখতে পাচ্ছিল একটু একটু করে ভিড় বাড়ছে। যারা আসছে তারা সবাই শমননন্দনকে চিনতে পারছে। সে মুদির দোকানদারকে জিজ্ঞেস করল, "উনি এখান থেকে কোথায় চলে গিয়েছিলেন তা কি আপনারা জানেন?"

"না। তবে শুনেছি বানারহাটে কেউ কেউ ওঁকে দেখেছে।"

"ওঁর বিরুদ্ধে আপনাদের কোনও অভিযোগ আছে?"

"ওঁর ঝোলা চুরি যাওয়ার আগে সবার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতেন। হিমালয়ের যেখানে সাধনা করেছেন তার কাহিনী শোনাতেন। ঝোলা চুরি যাওয়ার পর হঠাৎ ব্যবহার পালটে গেল। রেগে গেলেই দুষ্ট আত্মাকে ডেকে শাস্তি দেওয়ার ভয় দেখাতেন।"

অর্জুন শমননন্দনকে বলল, "উঠুন।"

ভিড় বাড়তে দেখে শমননন্দন যে ভয় পেয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। সুড়সুড় করে মোটরবাইকের পেছনে উঠে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে এক প্রৌঢ় ছুটে এল, "বাবা, তুমি আমার ছেলের সঙ্গে কথা বলিয়ে দাও। তুমি যে টাকা চেয়েছ তাই তোমাকে দেব।"

অর্জুন আর সময় নষ্ট করল না। দ্রুত বাইক চালিয়ে ডায়না নদীর পাশের রাস্তা ধরে চলে এল অনেকটা দূরে। এখন সন্ধ্যা। চারপাশে অন্ধকার। তবে চাঁদ উঠবে উঠবে করছে। এদিকে জনবসতি নেই। সামনে শুকনো নদী, পেছনে জঙ্গল। রাস্তার একপাশে বাইক দাঁড় করিয়ে অর্জুন শমননন্দনের দিকে তাকাল, "এত মানুষ কি একসঙ্গে ভুল কথা বলছে?"

"মানে?" আধা অন্ধকারে শমননন্দনের মুখ দেখা যাচ্ছিল না।

"চৌধুরীমশাইয়ের বাড়িতে যাওয়ার আগে আপনি কোথায় ছিলেন?"

"আমি মানস সরোবর থেকে নেমে এসে খুঁজতে খুঁজতে ওখানে পৌঁছেছিলাম।"

"মানস সরোবরে চৌধুরীমশাইয়ের ঠিকানা কেউ আপনাকে বলেছিল?"

"না, না। হঠাৎই ওঁর বাড়িতে ঢুকে পড়েছিলাম।"

"আপনি কি সত্যি কথা বলছেন? এখানকার মানুষ এখানে আপনাকে দেখেছে। পোড়া গদাই আপনার ঝোলা চুরি করেছে, যার মধ্যে রুদ্রাক্ষ ছিল। সেগুলো ফেরত পাওয়ার জন্যে আপনি ব্যস্ত হয়েছেন। এখানেও টাকার বিনিময়ে মৃত আত্মীয়দের নিয়ে এসে কথা বলিয়ে দিয়েছেন। আপনার উদ্দেশ্য কী বলুন তো?"

"বিশ্বাস করুন বাবা, আমি নই। ওই যমনন্দন নিশ্চয়ই আমার ছদ্মবেশ ধারণ করেছে। ওকে দেখে লোকে আমি বলে ভুল করছে।"

"যমনন্দনকে কেমন দেখতে?"

"আমার মতো লম্বা। তবে মুখে দাড়ি, বাবরি চুল, পাহাড়ে পা পিছলে পড়েছিল বলে চোট পেয়ে একটা পা টেনে টেনে হাঁটে।"

অর্জুন এরকমটাই অনুমান করেছিল কিন্তু যাচাই করতে ছাড়ল না, "তা যমনন্দনের রুদ্রাক্ষ যদি চুরি হয়ে যায় তা হলে যে-কোনও মৃত আত্মাকে জিজ্ঞেস করলেই তো সে জানতে পারবে ওগুলো কোথায় আছে। আপনিও তো পারেন!"

"না পারি না। ব্যক্তিগত কোনও প্রশ্ন করা যায় না।"

কথাটা এর আগেও বলেছিল শমননন্দন।

"আপনাদের গুরুদেব একই ব্যক্তি?"

"ব্যক্তি বলব না, তিনি ঈশ্বরের অংশ। হ্যাঁ। আমরা গুরুভাই।"

"তাঁর নাম কী?"

"যমানন্দ।"

"মানস সরোবরে তো প্রচণ্ড শীত। আপনারা কীভাবে থাকতেন?"

"প্রথমদিকে কষ্ট হত। তারপর সহ্য হয়ে গিয়েছিল। গুরুদেব তো শীতবস্ত্র ছাড়াই তপস্যা করতেন। ওখানে অন্য সাধুরাও প্রকৃতিকে বশ করতে পেরেছেন।"

"থাকতেন কোথায়? খেতেন কী?"

"গুহার ভেতরে আগুন জ্বালা হত। শীত বেশি পড়ার আগে ভক্তরা খাবার

রেখে যেত। চিন থেকেই বেশি ভক্ত আসত। তা ছাড়া সরোবরের মাছও ধরা হত।"

"চিনের মানুষ হয় বৌদ্ধ নয় খ্রিস্টান। তাঁরা কেন আসতেন?"

"বৌদ্ধদের মধ্যে যাঁরা তন্ত্রানুসারী তাঁরা গুরুদেবকে অতীব সম্মান করতেন।"

"ওই চিনা বৈজ্ঞানিক তাঁদের একজন যিনি যন্ত্রটি দিয়েছেন?"

"হ্যাঁ বাবা।"

"দেখুন, আপনাকে আমি এখনও বিশ্বাস করছি। কিন্তু সত্যি কথা বলতে বিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই। যাকগে, রাত হয়ে গেছে। উঠুন।"

"কোথায় যাব বাবা?"

"এখান থেকে কয়েক মাইল দূরে আমার পরিচিত এক ভদ্রলোকের চায়ের বাগান আছে। আপাতত সেখানে চলুন, পরে দেখা যাবে।"

নদীর ধার দিয়ে বেশ কয়েক মাইল যাওয়ার পর চা-বাগান শুরু হল। এখন সবে আটটা কিন্তু চা-বাগানের পক্ষে অনেক রাত। জানা গেল মালিক কলকাতায় গেছেন। ম্যানেজার অর্জুনকে চিনতে পেরে অভ্যর্থনা জানাতে গিয়েই থেমে গেলেন, "এঁকে কোথায় পেলেন?"

"আপনি চেনেন?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

উত্তর না দিয়ে অর্জুনকে একপাশে টেনে নিয়ে গেলেন ভদ্রলোক, "অলৌকিক কাণ্ডকারখানা করে মশাই। হু হু করে ভক্ত সংখ্যা বেড়ে চলেছে কিন্তু কাউকে শিষ্য করবেন না। তিন রাত এক জায়গায় থাকেন না। সবাই বলে মাঝরাত্রে আত্মারা এসে ওঁর সঙ্গে কথা বলে।"

"কেউ দেখেছে?"

"নিশ্চয়ই। না হলে গল্পটা ছড়াল কী করে?"

অর্জুন হাসল, "মুশকিল।"

"মানে?"

"এই লোক তো সেই লোক নাও হতে পারে।"

"সে কী!" ম্যানেজার ঘুরে তাকালেন। "নাঃ। ভুল হয়নি। একই লোক।"

"আচ্ছা, সেই সাধু কি সহজে চলাফেরা করতেন?"

"না। একটু পা টেনে টেনে হাঁটতেন।"

"ইনি সেভাবে হাঁটেন না। শেষ কোথায় ওঁকে দেখা গেছে?"

"দাঁড়ান। একজন ওঁর সঙ্গে সবসময় থাকত, তাকে ডাকি।'

pathagar.net

"কে?"

"একজন কুলি সর্দার। আপনি তো আজ রাত্রে এখানে থাকবেন?"

"হ্যাঁ।"

"ইনি?"

"ইনিও আমার সঙ্গে থাকবেন।"

"মালিক কিন্তু এঁকে খুব অপছন্দ করেন!"

"ঠিক আছে, আমি ওঁকে বোঝাবার দায়িত্ব নিচ্ছি।"

গেস্টহাউসের দরজা খুলে দেওয়া হল। দুটো শোয়ার ঘর। শমননন্দন বলল, "বাবা, আমাকে ওই ঘরে থাকতে বলবেন না। অনেক বেশি জিনিসপত্র, দমবন্ধ হয়ে আসবে। আমি এই কাঠের বারান্দায় থাকব।"

"আপনি রাত্রে এখানে খাবেন তো?"

"না বাবা। আমি স্বপাক আহার করি। যদি অসুবিধে না হয় একটু চাল ডাল দিলে ফুটিয়ে নিতে পারি।" শমননন্দন বলল।

সেই ব্যবস্থা হল। অর্জুন লক্ষ করছিল শমননন্দন কোনও নেশা করে না। সাধুবাবারা সাধারণত গঞ্জিকা সেবন করেন, এঁর সেই অভ্যেস নেই। লোকটা যদি খুব বড় অভিনেতা না হয়, তা হলে ওর কথাই ঠিক। যমনন্দন এখানে শমননন্দনের বেশ ধরে আছে বা ছিল। এই যমনন্দনকে খুঁজে বের করা দরকার।

"সেলাম সাহাব।" যে লোকটি কপালে হাত ছুঁইয়ে এসে দাঁড়াল সে ইতিমধ্যে নেশা করেছে। তবে খুব বেশি নয়।

"কী চাই ভাই?"

"আমি তো কিছু চাই না। সাহাব খবর পাঠাল, তাই এলাম।"

"ও, তুমি সর্দার?"

"জি।"

"এখানে এক সাধুবাবা এসেছিল, তুমি তার সঙ্গে থাকতে?"

"জি। উনি খুব বড় সাধু।"

শমননন্দন রয়েছে ভেতরের বারান্দায়। সর্দার এই ঘরে ঢোকার সময় তাকে দেখতে পায়নি।

"কী নাম সেই সাধুর?"

"শম, শম, শমন!" উচ্চারণ করতে পারল না সর্দার।

"শমননন্দন?"

"হাঁ সাহাব।"

pathagar.net

"তিনি এখন কোথায় আছেন?"

"উপরে। ডায়নার উপরে। বাঘাটিতে।"

"বাঘাটি? ওখানে কি শ্মশান আছে?"

"হাঁ সাহাব। তবে মানুষ কম।"

"এই সাধুর ঝোলা চুরি হয়ে গিয়েছিল, জানো?"

"না সাহাব।"

"এই সাধু যে খুব বড় তা কেন মনে হল তোমার?"

"ওঁর কাছে আত্মারা আসত!"

"কীভাবে আসত?"

"একটা বাচ্চাকে কলম-পেনসিল দিয়ে বসিয়ে দিয়ে যা-যা জিজ্ঞেস করতেন তা ওরা লিখে দিত।"

"দুর। আত্মা লিখত না বাচ্চাটা লিখত?"

"না সাহাব। বাচ্চাটা বাংলা লিখতেই জানে না। স্কুলে যায়নি।"

"আমার বিশ্বাস হয় না।" অর্জুন বলল।

"আপনি দেখবেন?"

"কী দেখব?"

"ওইসব কাগজ সাধুবাবা ফেলে দিলে আমি কুড়িয়ে রাখতাম। কতগুলো হারিয়ে গিয়েছে। কিন্তু পাঁচটা আছে। সব বাংলায় লেখা।"

"তুমি পড়েছ?"

"না সাহাব। আমি পড়তে জানি না।"

"কোথায় আছে কাগজগুলো?"

"আমার ঘরে?"

"কতদূর তোমার ঘর?"

"ওই তো কুলি লাইনে।"

"চলো।" অর্জুন খুব উত্তেজিত।

"আপনি যাবেন আমার সঙ্গে?"

"হ্যাঁ।"

pathagar.net

বেরোবার সময় চৌকিদারকে আলাদা ডেকে সে নির্দেশ দিল যেন শমননন্দনের ওপর নজর রাখে, সে না ফেরা পর্যন্ত কোথাও না যায়।

বাইকে সর্দারকে বসিয়ে কুলি লাইনে চলে এল অর্জুন নির্দেশ অনুসরণ করে। এখন এখানে ঘুম ঘুম ভাব। ঘরে ঢুকে মিনিটখানেকের মধ্যেই বেরিয়ে এল সর্দার। তার হাতে ভাঁজ করা কাগজ।

"এগুলো?"

"হাঁ সাহাব।"

"আমি দেখতে পারি?"

"দেখুন। কিন্তু আমাকে ফেরত দেবেন সাহাব।"

"আমি যাওয়ার আগে চৌকিদারের কাছে রেখে যাব।"

"আপনি কি সাধুবাবাকে খুঁজছেন?"

"হ্যাঁ। ওঁকে খুব দরকার।"

"বাঘাটিতে চলে যান। পাবেন। কিন্তু সাধুবাবা খুব রাগি।"

"তুমি আমাকে বাঘাটিতে নিয়ে যেতে পারবে?"

"বাস যায় না সাহাব।"

"আমার এটা যেতে পারবে না?"

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল সর্দার। অর্জুন বলল, "আমি আজ রাত্রেই যেতে চাই।"

"আই বাপ। এত রাত্রে?"

"ম্যানেজার সাহেবকে বলে দেব যাতে তিনি আগামীকাল তোমাকে ছুটি দেন।"

"তা হলে ঠিক হ্যায়। আমি এক ঘন্টার পর বাংলোয় আসব?"

"এসো।"

ফিরে এসে অর্জুন দেখল শমননন্দন বারান্দায় রান্না করছে উবু হয়ে বসে। সেইসঙ্গে মন্ত্রোচ্চারণের মতো গুন্‌গুনিয়ে গানও চলছে। ঘরে ঢুকল অর্জুন।

ছোট খাতার পাঁচটা ছেঁড়া পাতার কোনওটাতে চার লাইন, কোনওটায় দুই। হাতের লেখা এক-একটায় এক-একরকম।

প্রথমটায় লেখা, "আমি অনেকবার সব বলেছি, এবার ডাকলে আর আসব না।"

দ্বিতীয়টায়, "তোমার গুরুদেব তোমাকে এভাবে ডাকতে নিষেধ করেছেন।"

তৃতীয়টায়, "তোমার শত্রু এখন জায়গা দখল করতে রওনা হয়েছে। তার সঙ্গে হাজার চেষ্টা করলেও পেরে উঠবে না তুমি। সত্যের জয় সবসময় হবেই।"

Pathagar.net

চতুর্থটায়, "তুই বদলা নে। এমন শাস্তি দে যে বিশ্বাসঘাতক জ্বলেপুড়ে মরুক। এখান থেকে সোজা হাঁটলে যে বড় শহর পড়বে, তার পাশে বড় নদী, সেখানেই এক তিনতলা বাড়িতে সে থাকে।"

পঞ্চমটায় লেখা হয়েছে, "তুমি পথভ্রষ্ট। দুরাত্মা। তোমাকে শিষ্য বলে গ্রহণ করেছিলাম বলে আমি এখন মর্মাহত। পূর্বাশ্রমে কী ঘটেছিল তাতে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। এখনও সময় আছে, নিজেকে পরিশুদ্ধ করো।"

লেখাগুলো আবার পড়ল অর্জুন। শেষের লেখাটা খুব সুন্দর অক্ষরে লেখা হয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে ইনিই গুরুদেব। প্রথম তিনজন সম্ভবত পরিচিত, চতুর্থজন একই পথের পথিক এবং শেষ লেখাটি গুরুদেবের ভর্ৎসনা।

কিন্তু চতুর্থ লেখাটিতে কোন বিশ্বাসঘাতকের কথা বলা হয়েছে? এই শমননন্দনের? কিন্তু শমননন্দন তো মাত্র দু'দিন হল ওই শহরে এসেছে। এই লেখার সময়ে তো নয়। এখান থেকে সোজা হাঁটলে যে বড় শহর পড়বে—, কোনদিকে সোজা? বড় শহর বলতে শিলিগুড়ি অথবা জলপাইগুড়ি। দুটো শহরের পাশেই বড় নদী রয়েছে। একটা তিস্তা, অন্যটা মহানন্দা। দুটো শহরেই কয়েক শো তিনতলা বাড়ি পাওয়া যাবে। পুরো ব্যাপারটাই কেমন ধোঁয়াটে।

কিন্তু একটা ব্যাপার স্পষ্ট। যমনন্দন, যদি সত্যি তার নাম হয় যমনন্দন তা হলে সে এসেছে প্রতিশোধ নিতে। কীসের প্রতিশোধ? বদলা মানে তো তাই? শমননন্দন, যদি এর নাম সত্যি শমননন্দন হয়, তা হলে সে এসেছে যমনন্দনকে ঠেকাতে। কিংবা কে জানে, তার কোনও গোপন উদ্দেশ্য আছে কি না!

কিন্তু নির্দেশ পাওয়ার পরেও যমনন্দন রওনা হয়নি কেন?

সর্দার এল ঠিক একঘণ্টা পরে। ইতিমধ্যে শমননন্দনের রান্না-খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। তাকে এ ঘরে আনতেই সর্দার চমকে উঠে তার পায়ের কাছে শুয়ে পড়ল। শমননন্দন আশীর্বাদের ভঙ্গিতে হাত তুলল। সর্দার হাউমাউ শব্দ করে উঠে বসল, "বাবা, আপনি এখানে? কখন এসেছেন বাবা? আপনি আমাকে নিষেধ করার পর আমি আর আপনার কাছে যাইনি। আমার ওপর কৃপা করুন বাবা।"

অর্জুন বলল, "সর্দার ভাল করে দ্যাখো তো, ইনি সেই সাধু কি না?"

"নিশ্চয়ই।" মাথা নাড়ল সর্দার।

"কিন্তু আমি তো তোমাকে কখনও দেখিনি বাবা।" শমননন্দন বলল।

pathagar.net

কপালে ভাঁজ পড়ল সর্দারের "ওর গলার স্বরটা অন্যরকম লাগছে। কেন? একরকম দেখতে দু'জন সাধুবাবা আছেন নাকি?"

"হ্যাঁ। তুমি যাকে চিনতে তার কথা ভাল করে মনে করো।" অর্জুন বলল।

সর্দার মনে করার চেষ্টা করল কিন্তু পারল না। শুধু বলল, "দেখতে একরকম, শুধু গলার স্বর আলাদা। আর ওই সাধুবাবা এতক্ষণ এত চুপচাপ থাকতেন না।"

অর্জুন বলল, "এবার আমরা রওনা হব সর্দার।"

"এত রাত্রে যাবেন? রাস্তা ভাল না।"

"কোনও অসুবিধে হবে না। আপনি কি আমাদের সঙ্গে যাবেন?"

শমননন্দন তাকাল, "কোথায় যাওয়া হচ্ছে বাবা?"

"যমনন্দনের সন্ধানে।"

"আমি যাব। তাকে আমার দরকার। আমাকে ছাড়া গিয়ে কোনও লাভ হবে না।"

"একটু কষ্ট হবে, আসুন।"

মোটরবাইকের পেছনের সিটে দুটো মানুষ মোটামুটি বসতে পারে। শমননন্দনকে মাঝখানে বসতে দেওয়া হল। তার ঝোলা ইত্যাদির সঙ্গ সে ত্যাগ করেনি। অর্জুন পেছনে বসা সর্দারকে বলল, "একটু সাবধানে থেকো সর্দার।"

"আমি ঠিক আছি সাহাব।"

রাতের অন্ধকার চিরে বাইক ছুটছিল। চা-বাগান থেকে বেরিয়ে ন্যাশনাল হাইওয়ে ধরে তীব্রগতিতে ছুটে চলেছিল নাগরাকাটার দিকে। মাঝে মাঝে উলটো দিক থেকে ভারী ট্রাক আসছে। সাবধানি হাতে তাদের কাটাচ্ছিল অর্জুন। শেষ পর্যন্ত ডায়না নদীর ওপর এসে সে বাইক থামাল। এখন চাঁদের আলোয় নদীর বুক দেখা যাচ্ছে। বেশিরভাগই নুড়ি পাথর। একপাশ দিয়ে সামান্য জল বইছে।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "সর্দার, কোন দিক দিয়ে যাব?"

"পুলটা পার হন। ডান দিকে একটা কাঁচা রাস্তা আছে।"

অর্জুন নির্দেশ মান্য করল। এখন আর বাইকের গতি বাড়ানো যাচ্ছে না। মাঝে মাঝেই নুড়ি পাথর পড়ে থাকায় ঝাঁকুনি হচ্ছিল বেশ। শমননন্দন সেটা সামলাতে উঃ, আঃ করে উঠছিল। হঠাৎ সর্দার চেঁচিয়ে উঠল, "মনে পড়েছে, মনে পড়েছে সাহাব।"

pathagar.net

বাইক থামাল অর্জুন, "কী মনে পড়েছে?"

"কিছুদিন আগে নদীতে নামতে গিয়ে সাধুবাবা পড়ে গিয়েছিলেন। পাথরে ধাক্কা লেগে ওঁর হাঁটুতে চোট লাগে, রক্ত জমে যায়, কেটেও যায়।"

"কতদিন আগে?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"বেশিদিন নয়। সেই দাগ এখনও মিলিয়ে যাওয়ার সময় হয়নি।"

খোপ থেকে টর্চ বের করে অর্জুন সর্দারের হাতে দিল, "দেখে নাও।"

সর্দার বাইক থেকে নেমে হাঁটু মুড়ে বসল, "পাপ হলে মাফ করবেন সাধুবাবা। আপনার হাঁটুতে নিশ্চয়ই আমি দাগটা দেখতে পারব।"

শমনন্দন নির্বিকার মুখে লুঙ্গি হাঁটুর ওপর তুলে ধরলে টর্চের আলো ফেলল সর্দার। দুটো হাঁটু দেখল। তারপর চুপচাপ বাইকে উঠে বসল, "মাফ করবেন সাধুবাবা।"

"কী দেখলে?"

"আপনি ঠিক বলেছেন। ইনি তিনি নন। কিন্তু দেখলে বোঝা যায় না।" সর্দার বলল।

প্রায় আধঘণ্টা বাইক চালানোর পর রাস্তার যা অবস্থা হল তাতে বাইক চালানো সম্ভব নয়। বাইকটাকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটাও যাচ্ছিল না। পাথর, উঁচু-নিচু জমিতে রাস্তাটা দুর্গম হয়ে উঠেছিল। অর্জুন বাঁ দিকের একটা ঝোপের পেছনে বাইকটাকে রেখে তালাচাবি দিয়ে দিল। কোনও মানুষ এদিক দিয়ে গেলে চট করে দেখতে পাবে না।

শমনন্দন কোনও কথা বলছিল না। ভায়না নদী ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে চওড়ায়। জল তাই চোখে পড়ছিল। অর্জুন ঘড়ি দেখল। মধ্যরাত।

আরও কিছুটা যাওয়ার পর দূরে জনবসতি চোখে পড়ল। অন্ধকারে ঢাকা পড়ে আছে একটা ছোট্ট গ্রাম। সর্দার দূরের একটা জায়গা আঙুল তুলে দেখাল, "ওই হল বাঘাটির শ্মশান। আর ওই হল বাঘাটির গ্রাম।"

"বাঘাটির শ্মশানেই সেই সাধুবাবা থাকেন?"

"তাই তো শুনেছি সাহাব।"

দূর থেকে আগুনটাকে দেখা গেল। কাঠ জ্বালিয়ে আগুন তৈরি করা হয়েছে। তারপর স্পষ্ট হল, আগুনের চারপাশে ঘুরছে কেউ।

শমনন্দন দাঁড়িয়ে পড়ল, "সর্বনাশ।"

"মানে?"

"এই প্রক্রিয়া করতে ওকে অনেকবার নিষেধ করেছেন গুরুদেব।"

pathagar.net

"কী প্রক্রিয়া।"

"অগ্নিমন্থন।"

"এতে কী হয়?"

"অগ্নির তেজ সংগ্রহ করে মানুষের উপকার এবং অপকার দুটোই করা যায়। কিন্তু ও কারও উপকার করবে এটা আর ভাবতে পারি না।"

"ইনিই যমনন্দন?"

"অবশ্যই। আমি যাই।"

"না। দাঁড়ান। আপনি প্রথমে যাবেন না।" অর্জুন কঠোর হল।

"সে কী! ওঁকে খুঁজতে আমি এতদূরে এসেছি—।"

"এসেছেন। আর এসেছেন যখন, তখন ওর কাছে যাবেনও। কিন্তু আমি চাই না ও প্রথমেই আপনার উপস্থিতি জানতে পারুক। আপনি একটু দূরে অপেক্ষা করুন। আমি না ডাকলে কিছুতেই আগে যাবেন না।"

"না। এ হতে পারে না। আমাকে যেতেই হবে।"

"আপনি আমার কথা বোঝার চেষ্টা করুন। আচ্ছা, আমি যাওয়ার মিনিটদশেক পরে না হয় আপনি যাবেন। ঠিক আছে?" অর্জুন এগিয়ে গেল।

মূর্তিটি স্পষ্ট হল। হাতদশেক দূরে পৌঁছে অর্জুন বুঝল কেন এখানকার সব মানুষ একই ভুল করছে। যমনন্দন আর শমননন্দনের চেহারার মধ্যে প্রচুর মিল আছে।

"কে? কে ওখানে? মধ্যরাত্রির এই নিস্তব্ধ প্রহরে এখানে আসার সাহস হল?" মূর্তি থেমে গেল এবং চিৎকার ভেসে এল।

"আমার নাম অর্জুন। আপনার সঙ্গে কিছু ব্যক্তিগত কথা আছে।"

"মূর্খ! একজন গৃহীর সঙ্গে আমার কোনও ব্যক্তিগত কথা থাকতে পারে না। তুমি অবিলম্বে এখান থেকে দূর হও, নইলে আমি তোমাকে ভস্ম করে দেব।"

"সেটা সম্ভব নয়। কারণ রুদ্রাক্ষগুলো এখন আপনার কাছে নেই। খামোখা উত্তেজিত হবেন না। ওই ব্যাপারে কথা বলতেই আমি এসেছি।" অর্জুন বলল।

যমনন্দন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অর্জুন এগিয়ে গেল ওর সামনে, "নমস্কার।"

"কে তুমি?" মুখ বিকৃত করল যমনন্দন।

"আমি আমার নাম আপনাকে বলেছি। আপনার ঝোলার রুদ্রাক্ষগুলো

pathagar.net

এখন শিলিগুড়িতে আছে। আপনি সেগুলো ফেরত চান?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"অবশ্যই। শিলিগুড়ি—শিলিগুড়ি। হ্যাঁ, পাশেই একটি বড় নদী আছে, কী যেন নাম?"

"মহানন্দা।" অর্জুন হাসল, "সেখানেই এক তিনতলা বাড়িতে তস্করের বাস।"

"তিনতলা বাড়ি? তুমি জানলে কী করে?"

"জেনে গেছি। কিন্তু আপনি তো রুদ্রাক্ষের সন্ধানে এখানে আসেননি!"

"না, আসিনি। তোমার বাড়ি কোথায়?"

"জলপাইগুড়িতে। পাশেই বিরাট নদী, তিস্তা। সেখানে তেতলা বাড়ির সংখ্যা হাজারের কাছাকাছি। আপনি যাঁর সন্ধানে এসেছেন তিনি কি সেখানে থাকেন?"

অর্জুনের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে নিভে আসা আগুনে কাঠ ফেলল যমনন্দন।

অর্জুন বলল, "কিন্তু আপনার গুরুদেবের নিষেধ সত্ত্বেও আপনি এসেছেন।"

সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল যমনন্দন, "কে তোমাকে এসব কথা বলেছে?"

"আপনি যার ছদ্মবেশ ধারণ করে আছেন, সে।"

"আ-চ্-ছা! তুমি শমননন্দনকে চেনো?"

"হ্যাঁ। আমি জানি আপনার নাম যমনন্দন।"

"বুঝতে পেরেছি। সেই গর্দভ তোমাকে এসব গোপন কথা বলে ফেলেছে। খুব অন্যায় করেছে। এ কথা জানলে গুরুদেব ওকেও ত্যাগ করবেন।"

"সেটা সম্ভব নয়। কারণ তাঁর শরীর এখন মানস সরোবরের নীচে শুয়ে আছে।"

"সে কী! কী বলছ তুমি?"

"আপনি ওঁর আশ্রয় থেকে বিতাড়িত বলে এসব খবর জানেন না।"

হঠাৎ যমনন্দন মাটিতে বসে পড়ল। দ্রুত একটা কাঠি দিয়ে কিছু আঁকাআঁকি করে হাত বাড়িয়ে একটা ছোট জ্বলন্ত কাঠ তুলে ওর মধ্যে রাখল, তখনই শমননন্দন আড়াল থেকে ছুটে এল, "না। তুমি এটা করতে পারো না। কিছুতেই না।"

বাধা পেয়ে উঠে দাঁড়াল যমনন্দন, "ও, তুই এটাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিস! এত সাহস তোর! আমি কী পারি না পারি তা তোকে দেখিয়ে দিচ্ছি!"

pathagar.net

"যমনন্দন, কেন তুমি এইসব কুকাজ করছ! চলো, হিমালয়ে ফিরে যাই আমরা। আবার মন দিয়ে গুরুদেবের প্রদর্শিত পথে সাধনা করি। তাতেই আমরা শান্তি পাব।" বলল শমননন্দন। সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে না বলল যমনন্দন।

অর্জুন এগিয়ে গেল ওদের কাছে, "আপনার কী চাই?"

"টাকা।" মুখটা বীভৎস দেখাল যমনন্দনের।

"ছি! ধিক তোমাকে।" শমননন্দন বলল।

"অনেক হয়েছে। এই যে এত বছর ধরে সাধনা করলাম, কী পেলাম? কিস্যু না। প্রেতগুলোকে ধরে ধরে আনতাম কিন্তু নিজের জন্যে কিছু চাইতে পারতাম না। ওই ব্যাটা যমানন্দ বলত, মানুষ মারা গেলেও তার অভিজ্ঞতা মারা যায় না। তোমরা আত্মার কাছ থেকে সেই অভিজ্ঞতা গ্রহণ করবে। করে ভবিষ্যৎকে দিয়ে যাবে। ওসব দান করা আমার দ্বারা হবে না।" যমনন্দন বলল।

"আপনি চিনে বৈজ্ঞানিকের যন্ত্র ছাড়াই আত্মা নামাতে পারতেন?"

"পারি। যে-সব আত্মা মহাকাশে যেতে পারেনি, পাপের ভারে পৃথিবীর আকাশে ঘুরপাক খাচ্ছে, তাদের নিয়ে আসতে পারি। কিন্তু সেই ব্যাটারা এত পাপী যে, কিছুই দিতে পারে না।" হঠাৎ যমনন্দন শমননন্দনের ঝোলার দিকে তাকাল, "তোমার কাছে যন্ত্রটা আছে?"

সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে গেল শমননন্দন, "আছে, কিন্তু তুমি কখনও এটাকে পাবে না।"

হঠাৎ হা হা শব্দ করে হেসে উঠল যমনন্দন, "শমননন্দন, তুমি এর আগে কতবার আমার বাহুবলের কাছে হার মেনেছ স্মরণে আছে?"

শমননন্দন মাথা নিচু করল, "বেশ, একবার তোমাকে সুযোগ দিতে পারি। একবার তুমি ইচ্ছেমতো কোনও আত্মার সঙ্গে কথা বলতে পারবে। রাজি আছ?"

"তোমাদের দু'জনের শারীরিক শক্তি আমার চেয়ে বেশি। তাই রাজি হচ্ছি। তাই হবে।"

"কথা বলার পর তুমি হিমালয়ে ফিরে যাবে?"

"পাগল? ওই ঠান্ডায়, নীরস জায়গায় কেউ ফিরে যায়?"

"কার সঙ্গে কথা বলতে চাও তুমি?"

"আর কার সঙ্গে? গুরুদেব যমানন্দ।"

pathagar.net

"না। তিনি তোমাকে অনুগ্রহ করবেন না।"

হঠাৎ হেসে উঠল যমনন্দন, "তোমাকে পরীক্ষা করছিলাম আমি। তোমার ওই যন্ত্র ছাড়াই প্লানচেটে আমি তাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করেছি। তবে হ্যাঁ, খুব অল্প সময়ের জন্যে ওঁরা পৃথিবীতে থাকতে পারতেন।"

"যন্ত্র ছাড়াই?" শমননন্দন হতভম্ব হয়ে গেল।

"হ্যাঁ। তুমি যাদের ডেকে আনছ তারা আমার সঙ্গে দেখা না করে ফিরে যাবে, এ তো হতে পারে না। তুমি যখনই ওই যন্ত্রটা চালু করতে, আমি তখনই প্লানচেট শুরু করতাম।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কী করে বুঝতেন যে, যন্ত্রটা চালু হয়েছে?"

"তার উত্তর তোমাকে দেব না ছোকরা।" ক্ষিপ্ত দেখাল যমনন্দনকে। তারপর শমননন্দনকে বলল, "আর কাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছ এখানে?"

অর্জুন হাসল, "আপনার শিষ্য। সর্দার, এদিকে এসো।"

সর্দার আড়াল থেকে হাতজোড় করে বেরিয়ে আসতেই যমনন্দন চিৎকার করে তাকে গালাগাল করতে লাগল পথ দেখিয়ে নিয়ে আসার জন্যে। সর্দার হাঁটু মুড়ে বসে কাঁদতে শুরু করল।

অর্জুন বলল, "ওকে বলে কোনও লাভ নেই। আমি ওকে বাধ্য করেছি।"

যমনন্দন বলল, "ঠিক আছে। এই ব্যাটাকেই মাধ্যম করা যাক। বের করো তোমার যন্ত্র।" তারপরেই চিৎকার করে বলল, "গুরুদেব দয়া করো দীন জনে।"

অর্জুন অবাক হয়ে গেল। এই লাইনটাই শমননন্দন কত সুন্দর স্বরে বলে। আর যে গুরুকে অস্বীকার করছে সে তাঁর কাছে দয়া চাইছে কেন?

কাগজের সামনে পেনসিল হাতে বসিয়ে দেওয়া হল সর্দারকে। যন্ত্র চালু করল শমননন্দন। বিপ বিপ শব্দ হচ্ছে। নব ঘোরাচ্ছে শমননন্দনের দক্ষ আঙুলগুলো। চোখ বন্ধ যমনন্দনের। হঠাৎ শব্দটা থামল। পাশের নিভে আসা আগুনে মৃদু ঢেউ বয়ে যেতে যমনন্দনের গলা শোনা গেল, "আপনি এসেছেন গুরুদেব। না ডেকে উপায় ছিল না।"

সর্দারের হাত চলল। যমনন্দন সেটা পড়ল, "আপনি আমাকে বলেছিলেন পূর্বাশ্রমের প্রতি আপনার কোনও টান নেই। উদাহরণ দিয়েছিলেন, কোনও এক বন্ধুর কাছে পনেরো লক্ষ টাকা রেখে গিয়েছিলেন। সেই টাকার ওপরেও আপনার আর কোনও আকর্ষণ নেই। আমি খবর পেয়েছি সেই লোক নদীর

ধারে বড় শহরের তিনতলা বাড়িতে থাকে। টাকাটা তার নয়। যেহেতু আমি আপনার শিষ্য তাই টাকাটা আমি চাইতে পারি। এখন বলুন, সে কোথায় থাকে, কী নাম?"

লেখা হতে লাগল। তারপর সর্দারের হাত থেকে পেনসিল পড়ে গেল। সর্দারের মুখ বুকের ওপর নেমে এল। ছোঁ মেরে কাগজটা টেনে নিয়ে চিৎকার করে উঠল যমনন্দন, "এ কী! শুধু লাইন টেনে গিয়েছে লোকটা?"

"গুরুদেব বলতে চেয়েছেন বাঁধ দাও, সংযমের বাঁধ দাও।" কানে তুলল না কথাগুলো, যমনন্দন চেঁচিয়ে উঠল, "আছে, শেষে লিখেছে, শ, শ-ন। তার মানে? শ-ন তুমি? তোমার নাম? শমননন্দন। গুরুদেব জানাতে চেয়েছেন তুমি সব জানো।"

"আমি কিছুই জানি না।"

"মিথ্যে কথা।"

"তুমি জানো আমি সত্য ছাড়া মিথ্যে বলি না।"

"এখানে তুমি কোথা থেকে এলে?"

"জলপাইগুড়ি থেকে।"

"এই ছোকরার বাড়িতে?"

"না।"

"দাঁড়াও, দু'জন মৃত মহিলার আত্মাকে যে ডেকেছিল তার বাড়িতে?"

"হ্যাঁ।"

"ঠিক আছে। এখন তোমরা আমার কাছে কী চাও?"

"একটাই চাওয়ার আছে। তুমি হিমালয়ে ফিরে যাও।"

"দুর। আমার পনেরো লক্ষ টাকা চাই। কোনও ভূতপ্রেত আমাকে ওই টাকা এনে দিতে পারবে না। একমাত্র মানুষই পারে। আর সাধারণ মানুষের স্বভাব হল কৃপণ হওয়া। বাধ্য না হলে তারা টাকা বের করে না। অত টাকা কেউ আমাকে দেবে না। এবার তোমরা ফিরে যাও।"

অর্জুন বলল, "এত রাত্রে আমরা কোথায় যাব? ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে। কিন্তু একটা কথা, লোকে আপনাকে শমননন্দন হিসেবে জানুক এটা কেন চেয়েছেন?"

"উত্তর দেব না। তোমরা বরং ওখানে গিয়ে রাত কাটাও। আমাকে বিরক্ত করবে না।" যমনন্দন উঠে গেল। গিয়ে খানিকটা দূরে গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে বসল। ঝোলায় যন্ত্র ভরে নিয়ে শমননন্দন নদীর ধারে যেতে অর্জুন

Pathagar.net

তাকে অনুসরণ করল। উন্মুক্ত আকাশের নীচে বসল ওরা। সর্দার থেকে গেল যেখানে ছিল।

শমননন্দন নিচু গলায় বলল, "ভগবান, ওর মতি ফিরিয়ে দাও।"

অর্জুন বলল, "আপনার প্রার্থনা পূর্ণ হবে না বলে আমার বিশ্বাস।"

শমননন্দন তাকাল, "কী করা যায়?"

"এখন পর্যন্ত উনি তেমন বড় অপরাধ করেননি যে, পুলিশের কাছে যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু একটা সত্যি কথা বলুন তো, বিজ্ঞান প্ল্যানচেট বিশ্বাস করে না। তার ওপর আপনি কখন যন্ত্র খুলে আত্মাকে আহ্বান করছেন তা ইনি টের পাচ্ছেন কী করে?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"ও অমন বিদ্যায় সিদ্ধ। ও সব পারে।"

"আমি একটু শুচ্ছি। আপনি লক্ষ রাখবেন যেন যন্ত্রটা চুরি না যায়!"

বলামাত্র শমননন্দন ঝোলাটাকে আঁকড়ে ধরল।

শেষ রাতে ঘুম এসে গিয়েছিল। অর্জুন যখন চোখ মেলল তখন ভোর হচ্ছে। পাশে শমননন্দন নেই। চট করে উঠে দাঁড়াল সে। ওপাশে কোনও মানুষের চিহ্ন নেই। যমনন্দন বা সর্দারকেও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর শমননন্দনকে আবিষ্কার করল সে। হাত-পা-মুখ বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে। দ্রুত তার বাঁধন খুলে দেওয়ামাত্র হাহাকার করে উঠল শমননন্দন। কাল রাত্রে তার ওপর বল প্রয়োগ করে বেঁধে রেখে ঝোলা নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে যমনন্দন। যাওয়ার সময় সর্দারকেও সঙ্গে নিয়েছে।

"আপনি চিৎকার করতে পারলেন না?"

"কী করে করব? পেছন থেকে কী একটা নাকের ওপর চেপে ধরতেই—"

"চলুন।"

"কোথায়?"

"এখানে থেকে তো কোনও লাভ নেই। এবার শহরে ফেরা যাক। কেন যে ঘুমিয়ে পড়লাম!"

ওরা হাঁটতে শুরু করল। সেই ঝোপের কাছে এসে তাজ্জব হয়ে গেল অর্জুন। তার বাইকটা নেই। অথচ এই পথে এখন ভোরবেলাতেও লোকজন নেই। গেলেও কারও চোখে পড়ার কথা নয়। নিশ্চয়ই সর্দার যমনন্দনকে

Pathagar.net

দেখিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সর্দার স্ব-ইচ্ছায় এতবড় বিশ্বাসঘাতকতা করবে বলে মনে হয় না। ওকে নিশ্চয়ই বাধ্য করেছে যমনন্দন।

"আপনার এই গুরুভাই বাইক চালাতে জানে?"

"জানি না। তবে সে যে-কোনও অসঙ্গত বিদ্যায় পটু।"

"মানে? বাইক চালানো আপনার কাছে অমঙ্গলের?"

"না, ঠিক তা নয়, তবে বড্ড লাফায়, ব্যথা হয়।"

রেগে গিয়েও রাগতে পারল না অর্জুন। উলটে হেসে ফেলল।

হাইওয়ের কাছে পৌঁছতে প্রায় সকাল দশটা। এবং সেখানেই সর্দারকে পাওয়া গেল। উপুড় হয়ে পড়ে আছে ঘাসের ওপর। জ্ঞান নেই, মাথার একপাশ রক্তাক্ত।

অর্জুন বলল, "এতক্ষণে পুলিশের কাছে যাওয়ার সুযোগ হল। লোকটার প্রাণ তার আগে বাঁচানো দরকার।"

কিছুক্ষণ চেষ্টার পর হাইওয়ের ওপর গাড়ি থামাতে পারল অর্জুন। অনেক অনুরোধের পর সর্দারকে গাড়িতে তোলা গেল। মালবাজারের হাসপাতালে ওকে ভর্তি করাবার পর থানায় গেল ওরা। শমননন্দন মাঝে মাঝে শিশুর মতো আচরণ করছিল। তার সর্বস্ব নিয়ে চলে গিয়েছে যমনন্দন। ওই যন্ত্রটাকে সে রাখতে পারল না, এই দুঃখ কিছুতেই ভুলতে পারছিল না।

থানার দারোগা এই সাতসকালে ওদের দেখে খুশি হলেন না। বিরক্ত মুখে জিজ্ঞেস করলেন "কী চাই?"

অর্জুন বলল, "একটু আগে আপনাদের এখানকার হাসপাতালে গুরুতর আহত একজন চা-বাগানের সর্দারকে ভর্তি করে এসেছি।"

"আপনি কে? এই সাধু না ফকির, এর সঙ্গে কী সম্পর্ক?"

"ইনি শমননন্দন। হিমালয়ের মানস সরোবরের তীরে সাধনা করেন। একজন অসৎ গুরুভাইকে সংশোধন করতে এসেছিলেন। সেই লোক এঁর কথা তো শোনেইনি, উলটে এঁর যাবতীয় জিনিসপত্র চুরি করে পালিয়েছে। পালাবার সময় ওই সর্দারকে মেরে অজ্ঞান করে রেখে গেছে।" অর্জুন বলল, "ওর শরীরটাকে আমরা ডায়না নদীর পাশে হাইওয়ের ধারে পেয়েছি। ও হ্যাঁ, যাওয়ার সময় সাধুবাবা আমার বাইকটাও নিয়ে গিয়েছেন।"

"আপনি কে?"

"আমি অর্জুন। আপনাদের এস পি সাহেব আমার পরিচয় জানেন। আমি সত্যসন্ধানী।"

"সত্যসন্ধানী? আচ্ছা, আপনি কি জলপাইগুড়ির—।"

"হ্যাঁ।"

"ও হো, নমস্কার। আপনার নাম আমি শুনেছি। চোখে দেখার সুযোগ এই প্রথম হল। হ্যাঁ, আপনি যে জায়গার কথা বলছেন সেটা এই থানার জুরিসডিকশানে পড়ে না। কিন্তু এ নিয়ে ভাববেন না, আমি ওই থানায় খবর পাঠাচ্ছি। কিন্তু ব্যাপারটা কী বলুন তো? এঁকে দেখে মানস সরোবরের সাধু বলে মনে হয় না, তাঁরা তো বেশ বৃদ্ধ হন। সমতলে নামেন না।" দারোগাকে এখন বেশ কৌতূহলী দেখাল।

"যেটুকু জানি তা সংক্ষেপে বলছি।"

"দাঁড়ান। অ্যাই, তিন কাপ চা নিয়ে এসো, চটপট।"

"না। দু' কাপ আনতে বলুন। ইনি অন্যের হাতের রান্না খান না।"

"ও।"

অতএব খুব সংক্ষেপে ব্যাপারটা বলতে হল অর্জুনকে। শোনার পর দারোগা বললেন, "কী ডেঞ্জারাস লোকজন। ভূতের সঙ্গে এরা কথা বলে? আপনি দেখেছেন?"

"না। আমি দেখিনি। তবে প্রশ্নের উত্তর মিডিয়াম লিখে দিচ্ছে, এটা দেখেছি।" অর্জুন বলল, "এখন প্রথম প্রয়োজন আমাদের জিনিসগুলো ফেরত পাওয়া।"

"কী কী জিনিস যেন—!"

"শমননন্দনের ঝোলা আর আমার মোটরবাইক।"

"শমননন্দন? জব্বর নাম। অ্যাটেম্প্‌ট টু মার্ডার, ছিনতাই, ডাকাতি। সবক'টা কেস একসঙ্গে। ও যে নিয়ে গিয়েছে সে গুরুভাই। নামটা হল—।" কাগজে লিখতে লিখতে থমকে গেলেন দারোগা।

"যমনন্দন।" অর্জুন বলল।

"সর্বনাশ!"

দারোগা কথা দিলেন তিনি চারদিকের সমস্ত পুলিশ ফাঁড়ি, টহলদার পুলিশকে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছেন মোটরবাইকটাকে দেখতে পেলেই যেন যমনন্দনকে ধরে ফেলে। মোটরবাইকের নম্বর অর্জুন দিয়ে দিল।

দ্বিতীয় কাজটা ছিল টেলিফোন করা। থানা থেকেই চা-বাগানের ম্যানেজারকে ফোন করল অর্জুন। সর্দারের আহত হওয়া এবং মালবাজারের হাসপাতালে ভর্তি করানোর কথা জানাল। মালবাজারের হাসপাতালে

সবরকম চিকিৎসা সম্ভব নয়। তাই ওকে শিলিগুড়ি বা জলপাইগুড়ির হাসপাতালে যদি নিয়ে যাওয়া যায় তা হলে বেশি উপকার হবে। ম্যানেজার বললেন, তাঁরা এখনই মালবাজারে যাচ্ছেন।

ওরা যখন থানা থেকে বেরিয়ে আসছে তখনই টেলিফোনটা এল। দারোগা চিৎকার করে ওদের থামতে বললেন। তারপর টেলিফোনে কথা শেষ করে এসে বললেন, "আপনার বাইক পাওয়া গিয়েছে। ওটা তিস্তা ব্রিজের ওপাশে একটা ঝোপের মধ্যে পড়ে ছিল। সকালেই গ্রামবাসীরা দেখতে পেয়ে পুলিশকে জানিয়েছে। বাইকটাকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আর আপনার মতো ওই বাইকটাও দেখছি বেশ ফেমাস। জলপাইগুড়ির ওসি দেখেই চিনতে পেরেছেন। আপনার বাড়িতে ফোন করে খবরটা দিয়ে দিয়েছেন।"

অর্জুন বলল, "যাচ্চলে। এতক্ষণে মায়ের অবস্থা তো— আর একটা ফোন করব!"

"নিশ্চয়ই।"

টেলিফোন করে মাকে নিশ্চিন্ত করল অর্জুন। তার কোনও বিপদ হয়নি। শুধু বাইকটা চুরি গিয়েছিল। মা বললেন, তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে।

মালবাজার থেকে জলপাইগুড়ি পৌঁছতে বাসে ঘণ্টা দেড়েকের বেশি লাগে না। পাশাপাশি বসে শমননন্দন একটা বড় নিশ্বাস ফেলল। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কী করবেন এখন?"

"ওর মনের পরিবর্তন করাতেই হবে।"

"সেটা ভারতবর্ষের জেল করবে।"

"জেল?"

"যে অপরাধ যমনন্দন করেছে তাতে জেলে যাঁওয়া ছাড়া তো কোনও পথ খোলা নেই।"

"ওঃ।" মাথা নাড়ল শমননন্দন, "কিন্তু সে কোথায় গেল কে জানে!"

"জলপাইগুড়িতে। আমার বাইক নিয়ে শহরে ঢোকার মুখে বুদ্ধি করে ওটাকে ঝোপের মধ্যে ফেলে কোনও-না-কোনও ভাবে গন্তব্যস্থলে গিয়েছে।" অর্জুন বলল।

"গন্তব্যস্থল?" চমকে উঠল শমননন্দন।

"চমকে উঠলেন কেন?"

"না। এই কথাটা আমাকে আগে বললেন না কেন? আমাদের উচিত ছিল

pathagar.net

চৌধুরীমশাইকে টেলিফোনে সতর্ক করে দেওয়া।" শমননন্দন উত্তেজিত হয়ে উঠল।

"গন্তব্যস্থল বলতে চৌধুরীমশাইয়ের বাড়ির কথা ভাবছেন কেন?"

"কারণ ও এতদিন জানত না, এখন জানতে পেরেছে। টাকাপয়সার জন্যে ও মানুষ খুন করতে পারে। ওঃ, আমার খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছে।"

"যমনন্দন যে পনেরো লক্ষ টাকার কথা বলছিল সেই গল্পটা কী!"

"একবার গুরুদেব খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন যমনন্দন আশ্রম থেকে বিতাড়িত হয়নি। সে-সময় তিনি বলেছিলেন, পূর্বাশ্রমের কথা স্মরণে আনতে চান না। কিন্তু সেই সময় প্রায় পনেরো লক্ষ টাকা তিনি এক বন্ধুর কাছে পেতেন। সেই টাকা গরিব দুঃখীদের জন্যে খরচ করলে খুশি হতেন। যেহেতু ওই সময় তাঁর কাছে মৃত, সন্ন্যাস নেওয়ার পর আর কোনও গুরুত্ব নেই তাই ইচ্ছেটা অপূর্ণ থেকে গেল। যমনন্দন জানতে চেয়েছিল, কে সেই লোক, কোথায় থাকে? গুরুদেব বলেছিলেন উত্তর বাংলার এক পাহাড়ি নদীর পাশে সেই বন্ধুর বাড়ি। সেখানে দুই নদীর সঙ্গম হয়েছে। বিতাড়িত হওয়ার পর যমনন্দন সম্ভবত এখানে চলে এসে পাহাড়ি দুই নদীর সঙ্গমে সঙ্গমে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।" শমননন্দন বলল।

"আপনি কী করে ওই বাড়িতে পৌঁছলেন?"

"গুরুদেবের মৃত্যুর পরে আমি যমনন্দনের সন্ধানে যতবার তাঁর আত্মাকে স্মরণ করেছি ততবার তিনি এসেছেন কিন্তু ধরা দেননি। একবার বলেছিলেন, টক ফল খেতে গেলে জিভে আসে জল, মাঝখানে পাই তার গুড়ির বাকল, তৃষিতায় মিশে যায় তেতো এক ফল।' অনেক ভেবে ভেবে দেখলাম জিভে যখন জল আসে তখন জল দিয়ে শুরু, মাঝখানে পাই। মানে জলপাই, টক ফল। শেষে গুড়ি। অর্থাৎ জলপাইগুড়ি। জলপাইগুড়িতে এলাম। তৃষিতায় মিশে যায় তেতো এক ফল। দেখলাম তিস্তায় এসে মিশছে করলা নদী। বুঝলাম ঠিক জায়গায় এসেছি। তারপর এক বিহারি পরিবারের সাধ মেটাতে প্ল্যানচেটে বসলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'তিনটে লাইন পেয়েছি, চতুর্থটা কী? লেখা হল, সমুখে বাগান বাড়ি একটি ত্রিতল।' পুরো ধাঁধাটা হল,

> 'টক ফল খেতে গেলে জিভে আসে জল
> মাঝখানে পাই তার গুড়ির বাকল
> তৃষিতায় মিশে যায় তেতো এক ফল
> সমুখে বাগান-বাড়ি একটি ত্রিতল।"

Pathagar.net

ব্যস, খুঁজতে খুঁজতে পেয়েও গেলাম। আমি দেখছিলাম লোকটির বিবেক এখনও জাগ্রত আছে কি না। প্রথমদিন তিনি স্ত্রী আর মাকে ডাকলেন। পরের দিন এক বন্ধুকে, যে তাকে দেড় লক্ষ টাকা দিয়ে গেছে। যার নাম বিনয়। পনেরো নয়, দেড় লক্ষ। হিসেব মিলছিল না। এই সময় যমনন্দনের কথা জানতে পেরে আপনার সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম।" শমননন্দন বলল।

অর্জুন দেখল, বাস ময়নাগুড়িতে ঢুকছে।

দরজা খুলে বনমালী অবাক, "আপনি!" শমননন্দনকে এই সকালে সে দেখবে ভাবেনি।

"চলে এলাম।"

"অর্জুনবাবু কোথায়?"

"সে তার কাজে গিয়েছে। বাড়ির আর সব কোথায়?"

"আর সব বলতে বড় জামাইবাবু দিদিমণি চলে গেছেন নিজের বাড়িতে। ছোট জামাইবাবু কালই ফিরে গেছেন কাজের জায়গায়। ছোট দিদিমণি শুয়ে আছেন। আর বুড়োবাবু ঘুম থেকে উঠে চুপচাপ বসে আছেন।" বনমালী ফিরিস্তি দিল।

"চলো, তাঁর কাছে।"

বনমালী আপত্তি করল না। শমননন্দন চলে যাওয়ার পর থেকেই বুড়োবাবুর মন বেশ খারাপ। বলল, "আসুন।"

চৌধুরীমশাই বসে ছিলেন, হঠাৎ যেন ভূত দেখলেন, "আরে! আপনি!"

"হ্যাঁ। তোমার কথা ভেবেই ফিরে এলাম।"

"খুব ভাল করেছেন। ও বনমালী, ওর থাকার ব্যবস্থা করে দে। শিগগির।"

বনমালী একটু অবাক! শমননন্দন কাল পর্যন্ত বড়বাবুকে আপনি বলেছে। সে জিজ্ঞেস করল, "আপনার রান্নার ব্যবস্থা করে দিই?"

"রান্নার আবার কী ব্যবস্থা হবে। আপাতত একটু জলখাবার পেলেই হয়ে যাবে।"

"আপনি আমাদের রান্না খাবেন? কাল পর্যন্ত তো খাননি।"

"মত বদলেছি। গুরুদেব বলেছেন এ বাড়িতে খাওয়া চলে।"

বনমালী চলে গেলে চৌধুরীমশাই বললেন, "আপনার গুরুদেব এ কথা বলেছেন? কী সৌভাগ্য।"

pathagar.net

"তুমি তাঁর কাছে দীক্ষা নেবে?"

"তিনি আমাকে দেবেন?"

"চলো, আসনে বসি।"

চৌধুরীমশাই তখনই তৎপর। বনমালীকে ডাকা হল মিডিয়া হওয়ার জন্যে। সে তো কিছুতেই রাজি হতে চায় না। শেষ পর্যন্ত চৌধুরীমশাইয়ের ধমক খেয়ে বসল কাগজ-পেনসিল নিয়ে। যমনন্দন বলল, "নিয়মকানুন তো জানো। তুমি চিত্ত চিন্তামুক্ত করো। তুমি আমাকে স্পর্শ করে গুরুদেবকে স্মরণ করো।" হাত বাড়িয়ে চৌধুরীমশাইয়ের হাত স্পর্শ করল যমনন্দন।

কিন্তু কেউ এল না। যমনন্দন বলল, "আমি জানতাম উনি আসবেন না।"

"কেন?"

"উনি কোনও পাপীকে শিষ্যত্ব দান করেন না।"

"পাপী?"

"তুমি কোনও অপরাধ করেছ?"

"না তো! মানে ছোটখাটো অপরাধ।"

"বড়। পনেরো লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছ তুমি। করোনি?"

"না, না। আমার এক বন্ধু বিনয়, সে দেড় লক্ষ টাকা আমার কাছে রেখে নিরুদ্দেশে চলে যায়। এটাকে কি আত্মসাৎ বলে?"

"দেড় লক্ষ নয়, পনেরো লক্ষ।" চিৎকার করল শমননন্দন, "বেশ। এখনই আমি এর সত্যতা প্রমাণ করছি। আর সত্য যদি উদ্‌ঘাটিত হয় তা হলে মুখে রক্ত উঠবে তোমার। কেউ তোমাকে বাঁচাতে পারবে না।"

"আমি রাজি। বিনয়ের দেড় লক্ষ টাকা আমার কাছে আছে। কারও কোনও টাকা আমি আত্মসাৎ করিনি। আমি পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত।" চেঁচিয়ে বললেন চৌধুরীমশাই।

"দেড় লক্ষ? দেড় লক্ষে কী হবে।" মুহূর্তে মন পালটাল যমনন্দন, "বেশ, আপাতত ওই দেড় লক্ষ টাকাই দাও। তারপর আমি গুরুদেবকে অনুরোধ করব।"

এইসময় সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। কেউ কিছু বলার আগেই বনমালী আসন থেকে উঠে দৌড়ে চলে গেল দরজায়, "এই যে, এদিকে আসুন; বড়বাবুকে লোকটা চমকাচ্ছে।"

ততক্ষণে দু'জন সেপাই, জলপাইগুড়ির ওসি এবং অর্জুন ঘরে ঢুকে পড়েছে। ওসি গম্ভীর গলায় বলল, "উঠে পড়ুন। পালাবার চেষ্টা করবেন না।"

pathagar.net

যমনন্দন প্রচণ্ড ঘাবড়ে গেল, "অ্যাঁ, আমি কী করেছি?"

"অ্যাটেম্পট টু মার্ডার, চুরি, ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করার অভিযোগে আপনাকে গ্রেফতার করা হল। আপনার সাধুগিরি আমি এবার ঘুচিয়ে দেব?" ওসি হাতকড়া পরিয়ে দিতেই শমননন্দন পেছন থেকে এগিয়ে এল, "ভাই যমনন্দন, গুরুদেব বলতেন, অন্যায় পথ ত্যাগ করতে। তুমি শোনোনি। এখন প্রায়শ্চিত্ত করো।"

হাতকড়ি বাঁধা অবস্থায় যমনন্দন ঝাঁপিয়ে পড়ল শমননন্দনের ওপর। সেপাইরা তাকে ধরে ফেলে টানতে টানতে নিয়ে গেল বাইরে।

শমননন্দন নিচু হয়ে তার ঝোলাটা তুলল। যন্ত্রটা ব্যাগে ঢোকাল। তারপর হাতজোড় করে বলল, "ওকে দেখে বিভ্রান্ত হয়ে নিশ্চয়ই ভেবেছিলেন আমি এসেছি। আমি খুব দুঃখিত। এবার আমাকে বিদায় দিন।"

চৌধুরীমশাই বললেন, "কিন্তু ওই টাকাটা।"

"অর্জুনবাবু তো ঠিকই বলেছেন। সেবাশ্রমে দিয়ে দিন। মানুষের মঙ্গল হবে।"

চৌধুরীমশাই জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কোথায় যাচ্ছেন বাবা?"

"মানস সরোবরে।" ধীর পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল শমননন্দন।

pathagar.net

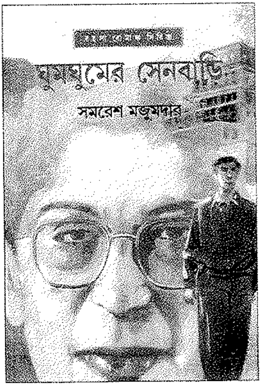

ঘুমঘুমের সেনবাড়ি

দুই পা ঝুলিয়ে মগডালে বসে দোল খাচ্ছিল বেঁটেটা। আর একটু দূরে দুই ডালের জোড়ে আরামসে বসে শরীর দুলিয়ে গান গাইছিল লম্বুটা, ট্রা-লা-লা-লা। গাইতে গাইতে তার নজর গেল বেঁটের দিকে। গান থামিয়ে বলল, "অ্যাই, অত জোরে দোল খাস না, মগডাল ভেঙে আছড়ে পড়বি।"

বেঁটে ফিক করে হাসল, "দূর! তুই তো সবে এসেছিস, তাই কিস্যু জানিস না।"

স্বীকার করে নিল লম্বু, "ঠিক আছে, মানছি, একটু বুঝিয়ে বল।"

বেঁটে থামল, "ভূতেরা নীচে পড়ে যায় না। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ভূতেদের কবজা করতে পারে না। এই দ্যাখ, এই আমি ডাল ছাড়লাম, পড়ছি? পড়ছি না। কিন্তু বেশিক্ষণ শূন্যে ভাসতে পারব না বলে আবার ডাল ধরলাম। এখানেই মানুষের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য।"

লম্বু একটু ভাবল। শূন্যে দাঁড়াতে গিয়েও সাহস পেল না।

বেঁটে বলল, "ওই গাছটাকে চিনতে পারছিস?"

লম্বু দেখল। বিশাল চেহারার বটগাছ। তার নীচ দিয়ে রাস্তা। ওই রাস্তা দিয়ে কতবার সে মানুষ হয়ে থাকার সময়ে যাতায়াত করেছে। বলল, "ওটা তো মহাবটবৃক্ষ। অনেক বয়স। ওর তলাতেই তো আমি মারা যাই।"

"জানি বাবা জানি। কিন্তু কীভাবে মরলি তা কি তুই জানিস?"

"না। মরে গেলাম বুঝতেই সময় লেগেছিল। হঠাৎ দেখলাম আমার শরীর হালকা হয়ে গেছে। আমি লাফিয়ে এ গাছ থেকে ও গাছে চলে যাচ্ছি। আমার বডিটা ওই রাস্তার উপর গোটা রাত পড়ে ছিল। খুব রক্ত বেরিয়েছিল। তারপর সকাল হতেই একটা সাইকেলওয়ালা আমাকে

pathagar.net

দেখতে পেয়ে ভয়ে ফিরে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে প্রচুর লোক ছুটে এল। আমি মাটিতে নেমে ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম, কিন্তু কেউ আমাকে দেখতেও পেল না। বডি তুলে নিয়ে চলে গেল।" যেন ছবি দেখতে দেখতে বর্ণনা করছিল লম্বু।

"মরার সময় বোঝা যায় না, পরে বুঝতে হয়। ঠিক কথা। কিন্তু তোর শরীর থেকে রক্ত বের হল কেন? তার মানে কেউ তোকে আঘাত করতে চেয়েছে। সেই আঘাতে তুই মরেছিস।"

"তাই হবে হয়তো।"

"তোকে খুন করা হয়েছে, কে খুন করল জানিস?"

"হুঁ!"

"জানিস? বাঃ। জেনে চুপ করে বসে আছিস? লোকটাকে শাস্তি দিবি না?"

শুনে লম্বু খিকখিক করে হেসে নিল খানিকটা। তারপর বলল, "আমি নতুন হয়ে যা জানি, তুই পুরনো হয়ে তা জানিস না? আমরা একটা আলপিন তুলতে পারি না, কাউকে ঘুষি মারলে সে টের পাবে না, আমরা কী করে শাস্তি দেব? আগে শুনতাম ভূতেরা মানুষের ঘাড় মটকে দেয়। সেই ক্ষমতা যে ভূতেদের নেই তা মরে গিয়ে জানতে পেরেছি।"

বেঁটে একটু ভাবল। তারপর বলল, "এই যে মহাবটবৃক্ষ, তার পরে পুকুর, তার পরে দুটো বড় বেলগাছ মাঠের পাশে দাঁড়িয়ে, এই জায়গা দিয়ে সন্ধের পর হাঁটতে মানুষেরা খুব ভয় পায়। কারণ আমরা এই জায়গাটায় থাকতে খুব পছন্দ করি বলে ওদের ধারণা। আমরা ঘাড় না মটকাতে পারি, কিন্তু ভয় দেখাতে তো পারি। ভয় দেখিয়েও তো মানুষকে মারা যায়। আতঙ্কে হার্ট বন্ধ হয়ে যেতে পারে। সেটা তো করতে পারিস।"

"তা পারি।"

"বাঃ। তবে ওই বেলগাছের দিকে যাস না। ওর একটায় একজন তান্ত্রিক ভূত আর অন্যটায় ভৈরবী পেতনি ক'দিন ধরে আছেন। খুব রাগী ওরা। এখন বল, লোকটা থাকে কোথায়? কী নাম তার?" বেঁটে উঠে এল লম্বুর পাশে।

আর ঠিক তখনই ঘুম ভেঙে গেল অর্জুনের। শরীরে [illegible] ভাব, গলায় ঘাম, সে চোখ খুলে ঘরের অন্ধকার দেখল। জানলার বাইরে ঝাপসা আকাশ, গাছেরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে, বাতাস নেই।

pathagar.net

একটু ঝুঁকে-পড়া ছায়াছায়া গাছটির দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল অর্জুন। এরকম নিটোল স্বপ্ন কি কখনও দেখেছে সে? তার উপর ভূতপ্রেত নিয়ে? কিছুদিন আগে অবশ্য বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দেবযান' বইটি সে পড়েছিল। মরে যাওয়া মানুষজনের আত্মাদের নিয়ে লেখা সেই উপন্যাসটি পড়তে পড়তে মনে হয়েছিল যেন সত্যি সত্যি সব ঘটছে। নিজের কল্পনাকে পাঠকের মনে ঢুকিয়ে বাস্তব করে ফেলতে পেরেছেন বিভূতিভূষণ। কিন্তু সে তো কখনওই ভূতপ্রেতে বিশ্বাস করে না। তা হলে এই স্বপ্নটা সে দেখল 'দেবযান' পড়ার কারণে? কিন্তু বইটি তো সে দু'-চারদিনের মধ্যে পড়েনি।

স্টেশনে ট্রেন থেমেছিল তিনঘণ্টা দেরিতে। তখন চারপাশ অন্ধকার। কিন্তু অর্জুনের জন্যে অপেক্ষা করছিল নির্মল। একসময় জলপাইগুড়ির আনন্দচন্দ্র কলেজে তার সহপাঠী ছিল নির্মল। তারপর সে কোথায় গিয়েছে জানা ছিল না অর্জুনের। সপ্তাহখানেক আগে হঠাৎ চিঠি পেল নির্মলের। চিঠির ভাষা একটু অভিনব।

প্রিয় বন্ধু, আশা করি ভাল আছ। মাত্র কয়েকটা বছর, তবু তুমি এরই মধ্যে যে খ্যাতির সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠছ তাতে আমার সম্পর্কিত স্মৃতিতে ধুলো জমা অস্বাভাবিক নয়। তবু একদা-সহপাঠী হিসেবে কিছু দাবি তো আমার থাকতেই পারে। পড়াশোনা আর আমার হয়নি। কলেজের পরেই আচমকা একটা চাকরি পেয়ে গিয়েছিলাম খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের দৌলতে। মালদহ শহর থেকে তিরিশ মাইল দূরে এই জনপদটির নাম ঘুমঘুম। এখানে কোনও রেল লাইন নেই, দুটি বাস শহর থেকে যাওয়া আসা করে। কিন্তু এখানকার প্রতিটি মানুষ নিজের নাম লিখতে পারে। এমন একটি বর্দ্ধিষ্ণু জনপদ সচরাচর দেখা যায় না। এখানকার সবচেয়ে ধনী পরিবারের কর্তা মারা যাওয়ার পর তাঁর স্ত্রী বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন, ম্যানেজার নিয়োগ করবেন। আমি সেই চাকরিটি করছি। সম্প্রতি এই পরিবারের একজনের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ তদন্ত করে কোনও কিনারা করতে পারেনি। আমার মালিকান জেনেছেন যে, তুমি আমার সহপাঠী ছিলে। তাঁর ইচ্ছা, তুমি একবার এখানে এসো। বন্ধু হিসেবে আমিও কি তা আশা করতে পারি না? সঙ্গে কীভাবে আসবে তার বিশদ লিখে দিলাম। আমায় আগে জানালে আমি স্টেশনে অপেক্ষা করব। ইতি

নির্মলকুমার রায়।

পুনশ্চ, তোমার সম্মান-দক্ষিণার ব্যাপারে কোনও দ্বিধা রেখো না।

নির্মলকে ভুলে যাওয়ার কোনও সুযোগই নেই। দারুণ ব্যাডমিন্টন খেলত সে। আর অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প বলত। কারও কারও স্মৃতিশক্তি খুবই প্রবল হয়, নির্মলেরও ছিল। এখন সে মালদার কাছে একটি গ্রামে রয়েছে যার নাম ঘুমঘুম। এই নামটা হঠাৎই আকর্ষণ করল অর্জুনকে। দার্জিলিংয়ে যাওয়ার পথে ঘুম নামে যে জায়গা আছে তার বিকল্প নাম আর হতে পারে না। কিন্তু ঘুম আর ঘুমঘুম এক নয়। তার উপর সেখানে একজনের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছে বলে তার ডাক পড়েছে। অতএব অর্জুন লিখে দিয়েছিল কবে কোন ট্রেনে সে মালদায় পৌঁছোচ্ছে।

একটু মোটা হলেও নির্মলকে চিনতে অসুবিধে হয়নি। প্ল্যাটফর্মেই তাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল নির্মল, "আমার অনুরোধ তুমি রাখবে কিনা সন্দেহ ছিল।"

অর্জুন হেসে বলেছিল, "আমরা কিন্তু তুই-তোকারি করতাম।"

সঙ্গে সঙ্গে তুই-তে চলে গিয়েছিল নির্মল, "রাস্তায় তোর অসুবিধে হয়নি তো?"

"না। ট্রেনটা খামোখা লেট না করলে ভাল লাগত।"

রাত ন'টার পর মালদা স্টেশনের বাইরেটা এমন কিছু নির্জন হয়ে যায় না। গাড়ি এনেছিল নির্মল। টাটা সুমো। গাড়িতে উঠে বলল, "রাস্তা ভাল না, ঘণ্টাখানেক লাগবে, এখানে কিছু খেয়ে নিবি? সামনেই ভাল দোকান আছে।"

অর্জুন মাথা নেড়ে না বলে দিল। দ্রুত গাড়ি চলে এল শহরের বাইরে। তখন বোঝা গেল অন্ধকার কতটা ঘন। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "তুই কি একাই থাকিস?"

"হ্যাঁ। ওই বাড়ির একপাশে আউট হাউস, আর একপাশে গেস্টহাউস। আমি আউট হাউসে থাকি। ফসলের সময় একটু কাজের চাপ বাড়ে, বাকি সময়ে হালকাই থাকি। যাবতীয় ট্যাক্স, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে শুরু করে সবকিছুই করতে হয়। এখন জমিদারি প্রথা নেই, কিন্তু অনেক নামে এত জমি আছে যে, প্রায় জমিদারিই বলতে পারিস।"

অর্জুন দেখছিল দু'পাশের মাঠের উপর অন্ধকার উপুড় হয়ে রয়েছে। কোথাও আলোর চিহ্ন নেই, একমাত্র গাড়ির হেডলাইট ছাড়া। রাস্তার জন্যে গাড়ির গতি কমেছে এবং এত ভাল গাড়িতেও ঝাঁকুনি এড়ানো যাচ্ছে না।"

Pathagar.net

"যে ভদ্রলোকের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে তিনি কে?"

"আমাদের পুরনো ম্যানেজার।"

"তিনি এখানেই ছিলেন?"

"হ্যাঁ। আশির উপর বয়স হয়েছিল, স্মৃতি কাজ করছিল না। সারাজীবন এখানেই ছিলেন, যাওয়ার জায়গা ছিল না বলে মা জননী ওঁকে এখানে থাকার অনুমতি দিয়েছিলেন। ওই আউট হাউসের একটা ঘরে উনি থাকতেন।" নির্মল বলল।

"মানুষটি কীরকম?"

"খুব ভাল। মাঝে মাঝে সমস্যায় পড়লে ওঁর উপদেশ নিতাম। আমি যে ওঁর জায়গায় এসেছি, ওঁকে অবসর নিতে হয়েছে, তাতে একটুও ক্ষুণ্ণ হননি। সকালে-সন্ধ্যায় হাঁটতে যেতেন আর সারাদিন বই পড়তেন। ওঁকে কেউ খুন করবে, আমি ভাবতেই পারি না।" নির্মল বলল।

"খুন? খুন না অস্বাভাবিক মৃত্যু?" অর্জুন তাকাল।

"মঙ্গলাবাবু রাস্তার পাশে গাছের নীচে হাঁটুতে চিবুক গুঁজে পড়েছিলেন। তাঁর শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন ছিল না। কিন্তু হাঁটু এবং গোড়ালি ভাঙা ছিল। চোখ বিস্ফারিত। স্ট্রোক বা হার্ট অ্যাটাকে ওইভাবে মরার কথা নয়। পুলিশ বলছে, গাছ থেকে পড়ে মরে গিয়েছেন। কিন্তু সেটাও বিশ্বাসযোগ্য নয়। ওই বয়সে মঙ্গলাবাবুর পক্ষে গাছে ওঠাই সম্ভব নয়। তা ছাড়া উনি কী কারণে গাছে উঠবেন সন্ধেবেলায়?" নির্মল যেন অর্জুনকেই প্রশ্নটা করল।

"ভদ্রলোকের পুরো নাম কী?"

"মঙ্গলময় দত্ত।" হাসল নির্মল, "আসামাত্র তোকে সমস্যার কথা শোনাচ্ছি। কাল সকালে এসব কথা হবে। তোর খবর বল। হঠাৎ কী করে এত বড় গোয়েন্দা হলি?"

"প্রথম কথা আমি গোয়েন্দা নই। আমি সত্যি যা, তা খুঁজে বের করতে চেষ্টা করি।" গম্ভীর গলায় কথাগুলো বলল অর্জুন।

আকাশের অনেকটা ঢেকে রেখেছিল বলে দূর থেকে বাড়িটাকে ছায়াছায়া পাহাড় বলে মনে হচ্ছিল। হেডলাইটের আলোয় সেটাকে প্রাসাদ বলেই মনে হল। দারোয়ান গেট খুলে দিলে গাড়ি বিশাল বাগানে ঢুকেছিল। ঘড়ি দেখে নির্মল বলেছিল, "অনেক রাত হয়ে গেছে, তুই ফ্রেশ হয়ে নে। ডিনার পাঠিয়ে দিচ্ছি। মা জননী বোধ হয় শুয়ে পড়েছেন, কাল সকালে তাঁর সঙ্গে তোর দেখা হবে।"

"মা জননী?"

"এই বাড়ির যিনি মালিকান।"

গেস্টহাউসের যে ঘরে তার ব্যবস্থা হয়েছিল সেটি বেশ বড় হোটেলের ঘরের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। শীতাতপনিয়ন্ত্রণের যন্ত্র আছে ঘরে, কিন্তু অর্জুন সেটা চালু না করে জানলা খুলে দিল। তারপর চমৎকার রান্না করা খাবার খেয়ে শুয়ে পড়েছিল। ঘুম ভাঙল ওই ভূতের স্বপ্ন দেখে।

বাইরের অন্ধকার দ্রুত পাতলা হয়ে আসছে। পাখিরা শব্দ তুলছে গাছে গাছে। এখন শুয়ে থাকলেও ঘুম আসবে বলে মনে হয় না। স্বপ্নে দেখা লম্বু ভূতটার কথা মনে এল। বেশ কিছুদিন আগে সে অদ্ভুত একটা ছবি দেখেছিল। ছবিটির নাম 'ঘোস্ট'। অসহায় এক ভূতের ছবি। ওই লম্বু ভূত কি সেই ছবি দেখার ফসল? অবচেতনে ছিল, স্বপ্নে ফুটে উঠল?

একটু আগে কাজের লোক চা আর বিস্কুট দিয়ে গিয়েছিল। চায়ের স্বাদ থেকেই অর্জুন বুঝতে পারল, শুধু অর্থ নয়, এ বাড়ির কর্ত্রীর পছন্দ তারিফ করার মতো। এই অজ পাড়াগাঁয়ে এত দামি চা পাওয়াটা বেশ বিস্ময়কর।

সাড়ে সাতটায় দরজায় টোকা পড়ল। অর্জুন উঠে সেটা খুলতে দেখল নির্মল দাঁড়িয়ে, "গুড মর্নিং! কাল ঘুম হয়েছিল?"

"গুড মর্নিং। হ্যাঁ। ভালই হয়েছে।"

"আয়, আমরা বাগানে গিয়ে বসি।"

গাছগাছালি, ফুল তো চোখে পড়লই, যে জায়গাটায় নির্মল তাকে নিয়ে গেল তার চারপাশে শুধু গোলাপ আর গোলাপ। একদিকে টকটকে লাল, আর একদিকে সাদা, অন্যদিকে হলদে গোলাপ চাপ বেঁধে রয়েছে। এদের মাঝখানে মুখোমুখি দুটো সিমেন্টের বেঞ্চ। সাতসকালেই মৌমাছি উড়ছে ফুলগুলোতে। ওদের আকৃতিও বেশ বড়সড়।

অর্জুন বলল, "চমৎকার।"

নির্মল জানাল, "চার-চারটে মালি ওদের যত্ন করে। ফুলগুলো আপনি ঝরে যায়। বড় মায়ের হুকুম, একটা ফুলও ছেঁড়া চলবে না।"

"তার মানে ভদ্রমহিলা পুজোটুজো করেন না।" অর্জুন বলল।

"তা কেন? পুজোর ফুল রয়েছে বাড়ির পিছনের বাগানে। জবা, টগর..."

"ও। এবার বল আমাকে কী করতে হবে!" অর্জুন তাকাল।

pathagar.net

"মঙ্গলাবাবুর মৃত্যু স্বাভাবিকভাবে হয়নি। আবার উনি যে খুন হয়েছেন তারও কোনও প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। সত্যিটা কী, তা তোকে আবিষ্কার করতে হবে।" নির্মল বলল।

"ওঁর কোনও শত্রু ছিল?"

"না। তবে যখন চাকরিতে ছিলেন তখন কাজের প্রয়োজনে কর্মচারীদের বকাবকি করেছেন, আমাকেও এখন তাই করতে হয়। কিন্তু সে কারণে কেউ তাঁকে খুন করতে পারে না।"

"ওঁর কোনও বন্ধু ছিল?"

একটু ভাবল নির্মল। তারপর মাথা নাড়ল, "না। আমি দেখিনি। আমি আসার পর উনি সারাদিন লাইব্রেরিতে বই নিয়ে বসে থাকতেন। বিকেলে হাঁটতে বেরোতেন। কাউকে ওঁর সঙ্গে গল্প করতে দেখিনি। কথা বলতেন খুব কম।"

"লাইব্রেরি আছে এখানে?"

"হ্যাঁ। খুব ভাল লাইব্রেরি। এ বাড়িতেই। শুনেছি মা জননীর শ্বশুরমশাইয়ের শখ ছিল এ ব্যাপারে। অনেক পুরনো বই, হাতে লেখা ডায়েরি, পুরনো পত্রিকা, আবার নতুন যেসব বই বের হচ্ছে তার ভিতর থেকে মা জননীর নির্বাচন করা বইও ওখানে আছে।"

"বাঃ। দেখার ইচ্ছে হচ্ছে।"

"নিশ্চয়ই যাবি। তবে..." থেমে গেল নির্মল। চাপা গলায় বলল, "মা জননী আসছেন।" সে উঠে দাঁড়াল। অর্জুন দেখল, যে বৃদ্ধা এগিয়ে আসছেন বাগানের পথ ধরে, তাঁর সৌন্দর্যের সঙ্গে ব্যক্তিত্ব একইসঙ্গে প্রকট। মাথার চুল রুপোলি, পরনে গরদ, ছিপছিপে লম্বা শরীর, চোখে চশমা, তাকালেই মনে শ্রদ্ধাভাব জাগে।

অর্জুন নমস্কার করে বলল, "আমি অর্জুন।"

"বসুন।" মা জননী বললেন, "আমাদের আমন্ত্রণে আপনি এসেছেন বলে ভাল লাগছে। নিশ্চয়ই তেমন কোনও অসুবিধে হয়নি?"

"না, না।"

"ম্যানেজারবাবু নিশ্চয়ই আপনাকে সমস্যার কথা জানিয়েছেন। মঙ্গলাবাবু এই বাড়ির সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন। তাঁর ওইভাবে মৃত্যু হওয়াটা আমি মেনে নিতে পারছি না। পুলিশ তাদের কাজ করেছে, কিন্তু সেই কাজে আমি সন্তুষ্ট হইনি। যদিও আপনার বয়স কম তবু

Pathagar.net

ম্যানেজারবাবুর কাছে আপনার অনেক কাহিনি শুনেছি। আপনাকে সমস্ত সহযোগিতা করা হবে।" মা জননী একটু থামলেন, "এই বাড়ির বয়স প্রায় দুশো বছর। কখনও এরকম ঘটনা এখানে ঘটেনি।"

"দুশো বছর? এত পুরনো বলে মনে হয় না!"

"না। প্রথমে এত বড় ছিল না। একটু একটু করে হয়েছে। তা ছাড়া এখন পর্যন্ত নিয়মিত যত্ন নেওয়া হয়। লাইব্রেরিতে গেলে এ বাড়ির ইতিহাস জানতে পারবেন। আমার স্বামীর পূর্বপুরুষ ছিলেন কনৌজের মানুষ। লক্ষ্মণ সেনের কাকার ছেলে। লক্ষ্মণ সেন পূর্ব বাংলায় পালিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু উনি যাননি। এই গৌড়ের বিভিন্ন জায়গায় তাঁর উত্তরপুরুষরা বাস করেছেন। আচ্ছা, আমি এখন চলি। তেমন প্রয়োজন হলে ম্যানেজারবাবুকে বললে আমি খবর পেয়ে যাব। নমস্কার।" মা জননী কথা শেষ করে আর অপেক্ষা করলেন না।

তাঁর চলে-যাওয়া শরীরটা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আমি কেন এখানে এসেছি, আমার কী পরিচয়, তা এখানকার কতজন মানুষ জানেন?"

"দু'জন। মা জননী আর আমি।" নির্মল জবাব দিল। এখন নির্মল বেশ স্বাভাবিক। যতক্ষণ মা জননী এখানে ছিলেন ততক্ষণ সে সম্ভ্রম দেখানোর ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিল।

"কিন্তু প্রশ্ন তো উঠবেই?"

"হ্যাঁ। তাদের বলা হয়েছে বা হবে, তুই আমার বন্ধু, কিছুদিনের জন্যে বেড়াতে এসেছিস এখানে। আমার কাছে মাঝে মাঝেই কেউ না কেউ আসে, তাই তোর আসাকে স্বাভাবিক বলেই ধরে নেবে সবাই।" ঘড়ি দেখল নির্মল, "শোন, তোর যা-যা প্রয়োজন হবে, আমাকে বলবি। কিন্তু এখন আমাকে ঘণ্টাখানেকের জন্যে একটা কাজ করতে যেতে হবে।"

"বেশ তো। তুই যা। আমি একটু চারপাশ ঘুরে দেখি।"

"সঙ্গে লোক দেব?"

"না না।"

দিনের আলোয় বাড়ির সামনের বাগানটাকে ভাল করে দেখল অর্জুন। এই বাগান আর বাগানের পিছনের বাড়িটাকে দেখে মনে হল দুশো বছর ধরে এরা অনেক ঘটনার সাক্ষী হয়ে আছে। ওই অতবড় দোতলা বাড়িতে কত লোক থাকেন এখনও জানা হয়নি। মা জননী নিশ্চয়ই একা থাকেন না এখানে!

Pathagar.net

এইসময় লোকটিকে দেখতে পেল অর্জুন। গাট্টাগোট্টা চেহারার একটি খাটো মানুষ, যার ঘাড়ের উপর মাথাটাকে ঈশ্বর বসিয়ে দিয়েছেন কোনও গলা তৈরি না করে, একটা ঝাঁকড়া গাছের আড়াল থেকে তাকে লক্ষ করছে। ওরকম বীভৎস মুখ এর আগে অর্জুন কখনও দেখেনি। সে পা বাড়াতেই চিতাবাঘের গতিতে লোকটা যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। গাছটার কাছে পৌঁছে কোথাও আর লোকটাকে সে দেখতে পেল না। ধন্দে পড়ল অর্জুন। লোকটা কে? বাগানে ঘুরছে যখন, তখন নিশ্চয়ই এই বাড়িতেই থাকে। চেহারার উপর মানুষের হাত নেই, কিন্তু ভাবভঙ্গি অমন রহস্যময় কেন? এ বাড়ির লোক হলে তো এগিয়ে এসে কথা বলতে পারত।

গেট খুলে বের হল অর্জুন। যে রাস্তা দিয়ে গত রাতে এসেছিল সেই রাস্তা ধরে খানিকটা হাঁটতেই দু'পাশে বাড়ি ঘর এবং দোকান চোখে পড়ল। সাইকেলে লোকজন যাচ্ছে। একটা চায়ের দোকানের সামনে কিছু মানুষ খবরের কাগজ নিয়ে গুলতানি মারছে। তাদের কেউ কেউ ওর দিকে তাকাল। নিজেদের মধ্যে কথা বলল। অর্জুন দাঁড়াতেই তাদের একজন জিজ্ঞেস করল, "কিছু বলবেন?"

অর্জুন এগিয়ে গেল, "এখানে সিগারেটের দোকান কোথায় পাব?"

"ওই মোড়ে। কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই সেনবাড়িতে এসেছেন?" লোকটি জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ।"

"ওদের যে কোনও কাজের লোককে বললেই তো এনে দিত।"

"আসলে আমি সেনদের অতিথি নই। আমার সহপাঠী ওই বাড়িতে ম্যানেজারের চাকরি করে, ওর কাছেই এসেছি। তাই কাউকে কিছু বলতে সংকোচ হল।" অর্জুন হাসল।

"ও। নির্মল আপনার সহপাঠী ছিল?"

"হ্যাঁ। জলপাইগুড়ির আনন্দচন্দ্র কলেজে। ওকে তো আপনারা ভাল চেনেন, তাই না?"

"না মশাই। আমাদের সঙ্গে উনি মেশেন না। হয়তো চাকরির শর্ত তাই।" একজন বলল।

"চা খাবেন?" প্রথমজন জিজ্ঞেস করল। অর্জুন মাথা নেড়ে না বলল। সস্তা দামের একটা সিগারেট একজন এগিয়ে ধরল, "এটা চলবে?"

ইতস্তত করে অর্জুন নিল সেটা। লোকটির দেওয়া আগুনে সিগারেট

pathagar.net

ধরিয়ে বলল, "যাই বলুন, আপনাদের গ্রামের নামটি বেশ সুন্দর, ঘুমঘুম।"

"হ্যাঁ। মালদার অনেক গ্রামের নামই সুন্দর।"

"ঘুমঘুম নামটা কেন রাখা হয়েছিল?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

লোকটি পাশের ব্যক্তির দিকে তাকাল। সে মাথা নাড়ল, "কী জানি। বোধ হয় এখানে এলে লোকের ঘুম পেয়ে যেত। নাম নিয়ে কখনও মাথা ঘামাইনি। তবে... লোকটা একটু ভাবল, "দক্ষিণপাড়ার গজেনদাদু জানলেও জানতে পারেন।"

সিগারেট যে দিয়েছিল তাকে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "গজেনদাদু কে?"

"এ গ্রামের সবচেয়ে প্রবীণ মানুষ। ওঁর ছেলের বয়সই আশি পেরিয়েছে। সবাই বলে উনি এখন একশো। অথচ দিব্যি হেঁটে চলে বেড়ান।"

"বাঃ। আলাপ করতে ইচ্ছে করছে। দক্ষিণপাড়াটা কোন দিকে?"

"ওই মোড় থেকে ডান দিকে মিনিট কুড়ি গেলেই দক্ষিণপাড়া।"

আরও কিছুক্ষণ গল্প করল অর্জুন। মানুষগুলোর মন সাধাসিধে, গল্প করার পুঁজিও বেশি নেই। তবে সেনবাড়ির সঙ্গে যে দূরত্ব আছে, তা কথাবার্তায় স্পষ্ট। নির্মল ওদের এড়িয়ে চলে বলে তাকেও এরা পছন্দ করে না।

ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে লোকটির নির্দেশিত পথে দক্ষিণপাড়ার দিকে হাঁটতে লাগল অর্জুন। মিনিট কুড়ির মধ্যে মোটামুটি জনবসতি এলাকায় পৌঁছে গেল সে। এক প্রৌঢ়কে জিজ্ঞেস করতেই গজেনদাদুর হদিস পেয়ে গেল।

"গজেনদাদু? উনি তো একটু আগেই হাঁটতে গেলেন!"

"নিশ্চয়ই ধারে-কাছে কোথাও আছেন!" অর্জুন ওঁর বয়সটাকে মনে করে বলল।

হাসলেন প্রৌঢ়, "না ভাই, একশো বছরেও লোকটা আধঘণ্টা হাঁটে। যান না, এই মাঠপথ দিয়ে, ওঁকে দেখতে পাবেন। হাতে লাঠি দেখলেই চিনবেন।"

মাঠপথ মানে, ফসল তুলে ফেলার পর মাঠের মধ্যে দিয়ে যে পায়ে চলার পথ তৈরি হয়েছে। পরিষ্কার রাস্তা ছেড়ে ওই বয়সের মানুষ কেন মেঠো পথে হাঁটবেন বুঝতে পারল না অর্জুন। অবশ্য একটা গ্রামের নামকরণ কেন হয়েছে জানার জন্যে ওঁকে বিরক্ত করার কোনও মানে হয় না। নির্মল তাকে যে কারণে আমন্ত্রণ জানিয়েছে তার সঙ্গে নামকরণের

pathagar.net

কোনও সংযোগ নেই। বরং বাড়ি ফিরে ওই বাগানে উঁকি-মারা লোকটির খোঁজখবর নিলে বেশি লাভ হবে।

প্রৌঢ় তখনও দাঁড়িয়ে ছিলেন। অর্জুন তাঁকে জিজ্ঞেস করল, "এই পথ কোথায় গিয়েছে?"

"সোজা গেলে রাস্তা পাবেন। একেবারে মহাবটবৃক্ষের পাশের রাস্তা।"

মহাবটবৃক্ষ শব্দটাকে শোনা বলে মনে হল অর্জুনের। কোথায় শুনেছে? একটু ভাবতেই অনেক স্মৃতি, কিন্তু তার কোথাও মহাবটবৃক্ষ নেই। নামটার মধ্যেই বেশ রহস্যের গন্ধ রয়েছে। ইতস্তত না করে মাঠে নামল সে।

দু'পাশে এবড়োখেবড়ো জমিতে রোদ পড়েছে। একেবারে ফাঁকা জমি। কিছুটা হাঁটতেই একটা কালো আগুনকে এঁকেবেঁকে যেতে দেখল সে। অতবড় কালো চকচকে সাপ এর আগে কখনও দেখেনি। শব্দ করলে সাপ ভয় পায় বলে শুনেছিল অর্জুন, তাই জোরে হাততালি দিল। আচমকা থেমে গেল সাপটা। তারপর মুখ ফিরিয়ে উলটোদিকে চলে গেল। সাপ কামড়ায় ভয় পেয়ে। কাছে আসার পর তাকে দেখে যে ভয় পেত না, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। চোখের আড়ালে সাপ চলে গেলে পা বাড়াল অর্জুন।

মাঠটা শেষ হতেই ঝোপ-জঙ্গল, পথ মাঝখান দিয়ে। হঠাৎই কানে এল, "কে যায়?"

অর্জুন দাঁড়াল। ঝোপের পাশে একটা পাথরের উপর যে বৃদ্ধ বসে আছেন হাতে লাঠি নিয়ে, তিনিই যে গজেনদাদু তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

"আমি, অর্জুন।"

"কোন গাঁয়ের মানুষ?"

"আজ্ঞে, আমি জলপাইগুড়িতে থাকি। সেনবাড়িতে বেড়াতে এসেছি।"

"তাই! তা এ পথে হাঁটাচলা কেন?"

"আপনার খোঁজে এসেছিলাম।"

"আমার খোঁজে? আমাকে চেনা হল কী করে?"

"এখানে এসে শুনতে পেলাম।"

"কাছে এসো।"

অর্জুন এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করল।

"প্রণাম করলে কেন?"

"আপনি জ্ঞানবৃদ্ধ মানুষ। এই বয়সেও এত সক্রিয়। তাই..."

"প্রথম কথা আমার জ্ঞান সম্পর্কে তোমার কোনও ধারণা নেই। আর

pathagar.net

বয়স্ক মানুষ মানেই ভাল মানুষ হবে, তার কোনও ঠিক নেই। কেন খোঁজ করছিলে?"

"এই গ্রামের নাম কেন ঘুমঘুম হল তাই জানতে আগ্রহ হয়েছে।"

"ও।" বৃদ্ধ চোখ বন্ধ করলেন। অর্জুন লক্ষ করছিল ওঁর শরীরে কোনও মেদ নেই। খাটো চেহারা, মাথায় ছোট ছোট সাদা চুল, খাড়া। মুখে-হাতে সময় কিলবিল করছে। অথচ গলার স্বর এখনও স্পষ্ট।

মুখ তুললেন বৃদ্ধ, "ঠাকুরদার কাছে শুনেছি, ডাকাতরা মানুষকে গুম করে এখানকার জঙ্গলে এনে খুন করত। কেউ কোথাও গুম হয়ে গেছে শুনলেই লোকে বুঝত তাকে এখানে আনা হয়েছে। ওই গুম থেকে ঘুম হয়ে গেল কথাটা। আর একটা ঘুমে খুশি না হয়ে চালু হয়ে গেল ঘুমঘুম। তবে এখানকার মানুষ একসময় কাজ করার চেয়ে ঘুমোতে বেশি পছন্দ করত। ওই সেনেরা, যাদের বাড়িতে তুমি উঠেছ, তারা তো প্রথমে গাঁয়ের সব জমিজমা কিনে নিয়েছিল। তখন ওরা এখানে থাকত না। রাজরক্ত ছিল তো ওদের শরীরে। তারপর জমিদারি দেখতে বাড়ি তৈরি হল, কিন্তু সব জমি রাখতে পারল না। ওই বাড়িতে মঙ্গলা নামের একজন ম্যানেজার ছিল। খুব পড়াশুনা করত লোকটা, আমার কাছে মাঝে মাঝে আসত, বলত ওই বাড়িতে অনেক বই আছে। সেখানে নাকি হাতে লেখা অনেক খাতাও আছে। তাতে সে পড়েছে দুশো বছর আগে ওই সেনদের কেউ পাহাড়ে গিয়ে ঘুম নামে কোনও জায়গার খবর শোনে। ফিরে এসে সে এই গ্রামের নাম দেয় ঘুমঘুম। এবার তুমি আমার বাঁ হাতটা ধরো। অনেকক্ষণ বসে থাকলে হাড়ের জোড়াগুলো দুর্বল হয়ে যায়।"

বৃদ্ধ হাত বাড়ালেন। অর্জুন তাঁর হাত ধরলে তিনি অন্য হাত লাঠির উপর রেখে ধীরে ধীরে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "এই বয়সে এতটা পথ রোজ আসেন কেন?"

"অসুবিধে তো হয় না, একটু সময় লাগে, এই পর্যন্ত। ওই ও পাশে একটি বৃক্ষ আছে, মহাবটবৃক্ষ। তার বয়স কত কেউ জানে না। কিন্তু ওর নীচে এসে দাঁড়ালে মন শান্ত হয়ে যায়। যখন মারা যাব তখন তো ওখানেই যেতে হবে।" বৃদ্ধ হাসলেন।

"মানে?"

"ছেলেবেলায় শুনতাম, সবাই বলত, মারা যাওয়ার পর এই গ্রামের আত্মা ওই মহাবটবৃক্ষে কিছুদিন থাকে, তারপর স্বর্গ অথবা নরকে যায়।"

pathagar.net

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল স্বপ্নটার কথা। স্বপ্নে দেখা বেঁটে ভূত আর লম্বা ভূত তো মহাবটবৃক্ষের কথা বলছিল। এটা কী করে সম্ভব হল? স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের এত মিল কি স্রেফ কাকতালীয় ব্যাপার! মহাবটবৃক্ষ শব্দটা তো সে আগে শোনেনি। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন?"

"যাব। আগে মহাবটবৃক্ষকে প্রণাম করব, তারপর।"

লাঠিতে ভর করে গজেনদাদু ধীরে ধীরে হাঁটছিলেন। তাঁর পাশে সতর্ক হয়ে চলছিল অর্জুন, কারণ তার ভয় হচ্ছিল বৃদ্ধ যে কোনও মুহূর্তে পড়ে যেতে পারেন। খানিক বাদে একটা চওড়া মাটির রাস্তায় চলে এল ওরা। এবং দূর থেকেই গাছটাকে দেখে বটগাছ বলে চিনতে অসুবিধে হল না। কিন্তু এত বিশাল চেহারার বটগাছ এর আগে কখনও দেখেনি সে। যেন আকাশ আড়াল করে রেখেছে। হঠাৎ মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল। এ কী করে সম্ভব। কাল রাত্রে যে স্বপ্ন দেখেছিল, সেই বেঁটে এবং লম্বু ভূতেরা তো এইরকম দেখতে গাছে বসে গল্প করছিল। অবশ্য গাছটাকে স্পষ্ট দেখেনি। কিন্তু ডালপালায় বেশ মিল আছে।

গাছের নীচে পৌঁছে গজেনদাদু দুটো হাত মাথার উপর ঠেকিয়ে বিড়বিড় করতে লাগলেন। অর্জুন চারপাশে তাকাল। গজেনদাদুর প্রণাম শেষ হতেই সে জিজ্ঞেস করল, "আপনি তো রোজ এখানে আসেন, এই গাছের নীচেই মঙ্গলাবাবুর মৃতদেহ পড়ে ছিল? আপনি কি দেখতে পেয়েছিলেন?"

"মঙ্গলা? না না। মঙ্গলা তো এখানে মারা যায়নি।"

"শুনেছি গাছের নীচে ওঁর মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল।"

"গাছ তো এই গাঁয়ে একটা নেই। গাঁয়ে ঢোকার পথে কোনও গাছের তলায় তাকে পাওয়া গিয়েছে। সবাই বলে গাছ থেকে পড়ে গিয়ে সে মরেছে।"

"ওই আশির উপর বয়সে উনি গাছে উঠতে গেলেন কেন?"

"তা আমি কী করে বলব ভাই! আমাকে বলে তো ওঠেনি।"

লম্বু ভূত স্বপ্নে বলেছিল মহাবটবৃক্ষের নীচে সে মারা যায়। তা হলে ভূতেরাও মিথ্যে কথা বলে? অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনার এত বছরের স্মৃতিতে কি এখানে কারও মরার কথা আছে?"

"না ভাই। এখানে মরতে হলে অনেক পুণ্য দরকার। এই যে গাছের ডাল দেখছ, এখানে আমাদের প্রিয় আত্মারা কিছুদিন বাস করেন। তারপর যাঁর

pathagar.net

যেমন কর্মফল সেইমতো নিজের জায়গায় চলে যেতে হয়। আমার প্রাণ শরীর থেকে বের হলেই এই গাছে চলে আসতে হবে আমাকে।" কথাগুলো শেষ করে পিছন ফিরলেন গজেনদাদু।

"আপনি ভূত আছে বলে বিশ্বাস করেন?"

"আত্মা আছেন। মানুষের শরীরে থাকেন, শরীর নষ্ট হয়ে গেলেও তিনি থাকেন।"

"কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ তাদের দেখতে পায়নি।"

"ভাই, পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষ বিশ্বাস করেন ভগবান আছেন। এই যে সবাই কালী, দুর্গার প্রতিমা গড়ে পুজো করে, কেউ কি তাঁদের স্বচক্ষে দেখেছে? শুনেছি ঠাকুর রামকৃষ্ণ মা কালীকে দর্শন করেছিলেন। তুমি তো করোনি। তা হলে কি তুমি বলবে ঠাকুর রামকৃষ্ণ মিথ্যেবাদী? কী, জবাব দাও?" গজেনদাদু হাসলেন।

কঠিন প্রশ্ন। বারংবার এখানে এসে থমকে যায় অর্জুন। বিজ্ঞান কোনও অলৌকিক কাণ্ড বিশ্বাস করে না। যুক্তি দিয়ে যার বিচার হয় না তা বাতিল করে। ভূত, প্রেত, ডাইনি থেকে বাস্তবের দিকে জনসাধারণের দৃষ্টি নিয়ে আসতে আন্দোলন হচ্ছে। ঠিক কথা। কিন্তু মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে তো কোনও আন্দোলনের খবর সে পায়নি। ভগবান আছেন কিনা তা যখন যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা যায় না, তখন মানুষকে বলা হচ্ছে না কেন, ভগবান বলে কিছু নেই? যতই সুস্থ ভাবনার প্রতীক হোক, ভগবানে বিশ্বাস রাখলে মনে যতই শক্তি আসুক, তাকে একটি কাল্পনিক চরিত্র ছাড়া আর কিছু ভাবার কোনও কারণ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। ভগবান আছেন, এই কথাটা শুধু মনকে উজ্জীবিত করে।

বৃদ্ধ হাসলেন, "পারবে না। অস্বীকার করতে পারবে না।"

অর্জুন মহাবটবৃক্ষকে ভাল করে দেখল। এই দিনের আলোয় অজস্র পাতা আর ডালপালা কীরকম রহস্যময়!

বৃদ্ধ বললেন, "আচ্ছা, চলি। আবার দেখা হবে ভাই।"

"দাঁড়ান। আমি আপনার সঙ্গে যাচ্ছি।"

"না ভাই। তুমি সঙ্গে গেলে মনে হবে কারও সাহায্য ছাড়া আর হাঁটতে পারব না। মনে ভয় ঢুকবে। ফলে কাল আর একা বেরোতে পারব না।"

"কিন্তু আপনার উচিত নয় একা হেঁটে যাওয়া?"

"এতকাল তো হাঁটলাম। খারাপ কী হবে? পড়ে মরে যাব! সেটা তো

pathagar.net

এখন শুয়ে শুয়েও যেতে পারি। তাই না?" বৃদ্ধ হাসলেন।

আচমকা জিজ্ঞেস করল অর্জুন, "আচ্ছা, এখানে কোনও বেলগাছ আছে?"

"বেলগাছ? এখানে? না, নেই। আমি তো দেখিনি।"

অর্জুন খুশি হল। স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের কোনও মিল নেই এবং সেটাই ঠিক।

"তুমি বেলগাছের কথা জিজ্ঞেস করলে কেন?"

"শুনেছি, মানে গুজব চাউর আছে, বেলগাছে ব্রহ্মদৈত্য থাকেন?"

"হ্যাঁ। খুব পবিত্র গাছ। নিচু শ্রেণীর আত্মাদের ওই গাছ সহ্য করে না। ও হ্যাঁ, এই রাস্তা ধরে যদি মাইলখানেক হেঁটে যাও তা হলে তিনমাথা পড়বে। ডান দিকে ঘুরলে গাঁয়ে ঢুকতে পারবে, বাঁ দিকে বিলের পথ। সেই মোড়ে একটা বড় বেলগাছ আছে। তার ফল কেউ গাছ থেকে পাড়ে না। মাটিতে পড়লে কুড়িয়ে নেয়।" বৃদ্ধ বললেন।

"কেন?"

"ওই গাছে মাঝে মাঝেই তান্ত্রিক ভৈরবীদের আত্মা এসে কিছুদিন অধিষ্ঠান করেন। তাঁদের বিরক্ত করতে কেউ সাহস পায় না। আচ্ছা।"

লাঠি হাতে গজেনদাদু প্রায় হাঁটি-হাঁটি পায়ে বাড়ির দিকে রওনা হলেন, অর্জুন ওঁর যাওয়া দেখল। কিন্তু তার মাথায় তখন অন্য চিন্তা। স্বপ্নে দেখা ভূতেরা বলেছিল, পাশের বেলগাছে এক রাগি তান্ত্রিকের আত্মা এসেছেন। যদিও পাশে নয়, মাইলখানেক দূরে, তবু গজেনদাদু বলে গেলেন সেখানকার বেলগাছে তান্ত্রিক ভৈরবীদের আত্মা মাঝে মাঝেই এসে বাস করেন। এসব বিষয়ে সে কখনও পড়াশোনা করেনি অথবা আলোচনা করেনি কারও সঙ্গে সাম্প্রতিককালে, তা হলে স্বপ্ন তাকে ওই তথ্য জোগাল কী করে? একেই কি বলে কাকতালীয়? তবু তো মনের খুঁতখুঁতুনি যায় না।

অর্জুন হাঁটছিল। মাঝে মাঝে দু'-চারজন লোককে দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু গ্রামের এই দিকে কেউ যে সচরাচর আসে না, তা বোঝা যাচ্ছে। ঘুমঘুম নামটা এই এলাকার পক্ষে একদম লাগসই। অনেকটা পথ চলে আসার পর ঘড়ি দেখল অর্জুন। এই সময়ে অন্তত দেড় মাইল পেরিয়ে আসার কথা। গ্রামের মানুষেরা যখন বলেন, ওই এক ক্রোশ দূরে, তখন সেটা তিন মাইল বলে ধরে নিতে হবে। শেষপর্যন্ত তিন মাথার মোড়ে পৌঁছোল সে।

রাস্তার পাশে বেলগাছটা দাঁড়িয়ে আছে। গাছে কোনও ফল নেই। বেশ

ঝাঁকড়া গাছ। অর্জুন গাছের তলায় এসে দাঁড়াল। না, গাছের কোথাও কোনও অস্বাভাবিক ব্যাপার চোখে পড়ছে না। একটা বড় পাথর পড়ে আছে একপাশে। অর্জুন তার উপর বসল। এখন বেশ চড়া রোদ উঠেছে, পাখি ডাকছে। বেলগাছেও প্রচুর পাখি। রাগি তান্ত্রিকের আত্মা এখানে থাকলে পাখিরা কি টের পেত না! ভূতের গল্পে দেখা যায় কুকুর বেড়ালরা ভৌতিক অস্তিত্ব আগে অনুভব করে। পাখিরা কি করে না?

মুখ ফেরাতেই পাশের ঝোপে একটা কিছু দেখতে পেল অর্জুন। রোদ পড়ায় চিকচিক করছে। কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে একটু ঝুঁকে ডাল সরিয়ে সে জিনিসটা তুলে আনল। একটা বড় সাইজের তাবিজ, তাবিজের সঙ্গে লাগানো মোটা লাল কর্ড ছেঁড়া। আপাতদৃষ্টিতে খোলটাকে রুপোর বলে মনে হচ্ছে। এই তাবিজটাকে কেউ নির্ঘাত ছুড়ে ফেলেছে ওই ঝোপের মধ্যে। যে ছুড়েছে তার কাছে খোলের রুপোর কোনও মূল্য নেই। তাবিজটাকে পাথরের উপর রেখে আবার সেখানে বসল অর্জুন। একটা পাখি অদ্ভুত গলায় ডাকছে। কান পাতলে মনে হবে পাখিটা বলছে, 'আক্কেল হোক, আক্কেল হোক।' এ অনেকটা রেলগাড়ির চাকার শব্দের মতো, যা ইচ্ছে কথা বসানো যায়।

অর্জুন পাখিটার সন্ধানে কয়েক পা এগিয়ে যেতেই কাণ্ডটা ঘটল। একটা সূচলো ঠোঁটের রঙিন পাখি প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে লাল কর্ড-সমেত তাবিজটাকে তুলে নিয়ে বেলগাছের উঁচু ডালে গিয়ে বসল। বসার পর গর্বিত চোখে অর্জুনের দিকে তাকাল। ভঙ্গিতে বলছে, কেমন দিলাম!

তাবিজটা কোনও প্রয়োজনে লাগবে না, তবু পাখিটার ভঙ্গি দেখে অর্জুন হাত ছুড়ল ভয় দেখাতে। কিন্তু পাখি ভয় পেল না। উলটে পা দিয়ে ধাতব বস্তুটিকে চেপে ধরে ঠোঁট ঢোকাবার চেষ্টা করল ভিতরে। তাবিজ বা মাদুলির ভিতরে যা থাকে তাকে সুরক্ষিত রাখার জন্যে মোমজাতীয় মোটা আস্তরণের ব্যবস্থা করা হয়। পাখিটির ঠোঁট এত সূচলো যে, সেই আস্তরণকে অনায়াসে বের করে আনতে পারল, তারপর কোনও খাদ্যবস্তুর খোঁজ না পেয়ে পা সরিয়ে নিতেই তাবিজটা মাটিতে পড়ে গেল।. সেটা দেখামাত্রই পাখি ডানা মেলে উড়ে গেল অন্য গাছে।

অর্জুন তাবিজটাকে তুলল। একটা মুখ হাঁ হয়ে গেছে। তাবিজের ভিতর কি শিকড়-বাকড় থাকে? নইলে লোকে কোন বিশ্বাসে ওগুলো ধারণ করবে? একটা সরু কাঠি তুলে নিয়ে গর্তে ঢোকাল অর্জুন। আরও একটু

Pathagar.net

গালা বা মোমজাতীয় বস্তু বের হওয়ার পর সেলোফেন পেপারে মোড়া একটা পুরিয়া গোছের বস্তু বেরিয়ে এল। অর্জুন অবাক। এই বস্তুটি কি মন্ত্রপূত? কিন্তু কিন্তু করেও শেষপর্যন্ত খুলল সে মোড়কটা। তারপরেই ট্রেসিং পেপারের মতো পাতলা কাগজটা চোখে পড়ল যা সুন্দরভাবে ভাঁজ করা রয়েছে। কাগজটা খুলল সে। ছোট্ট একটা নকশা। কাগজের বাঁ দিক থেকে শুরু হয়ে ডান দিকে চলে গেছে কয়েকটা মোড় নিয়ে একটা লাইন। যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে ঝাঁঝরি মতো কিছু আঁকা। তলায় দুটো অক্ষর লেখা, ম.দ। অক্ষরদুটো গায়ে গায়ে হলে বিভ্রান্তি বাড়ত। এখন অক্ষরদুটোকে কোনও ব্যক্তির নামের আদ্যক্ষর বলে মনে হচ্ছে।

কী খেয়াল হতে কাগজটাকে পকেটে রেখে তাবিজের ভিতরটা মাটি দিয়ে ভরিয়ে যেটুকু মোম-গালা বেরিয়েছিল তাই দিয়ে মুখটাকে আড়াল করার চেষ্টা করল অর্জুন। তারপর সে গাছটার দিকে তাকাল। বেলগাছে কোনও রাগি তান্ত্রিকের আত্মা নিশ্চয়ই এই মুহূর্তে নেই, হয়তো কোথাও বেড়াতে গিয়েছেন, তাই সে নিশ্চিন্তে বসতে পারল এখানে। অর্জুন হেসে ফেলল!

দুপুরের খাওয়া মন্দ হল না। নির্মল এসেছিল দেখা করতে। কিন্তু অনেক অনুরোধেও সে তার সঙ্গে খেতে বসল না। বলল, "আমার খাবার আলাদা আছে।" ঘুরিয়ে বোঝাল, অর্জুন মা জননীর অতিথি। তার জন্যে যে ব্যবস্থা হবে তাতে নির্মল অংশ নিতে পারে না। সে এই বাড়ির একজন কর্মচারী। বাড়ির বাইরে হলে কোনও পার্থক্য থাকবে না। খাওয়া শেষ হলে অর্জুন লাইব্রেরিটা দেখতে চাইল। নির্মল এককথায় রাজি। মা জননী তাকে আদেশ দিয়েছেন, অর্জুন যা-যা দেখতে চাইবে তা যেন ওকে দেখানো হয়!

চাকর দরজার তালা খুলে দিলে নির্মল বলল, "আয়।"

বিশাল হলঘরটির সব জানলা বন্ধ। ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়নি, কারণ উপর-দেওয়ালে কাচ লাগানো। যদিও সেই কাচ ভেঙে ভিতরে আসা সম্ভব নয় লোহার রড লাগানো থাকায়।

চাকর আলো জ্বেলে দিলে নির্মল জিজ্ঞেস করল, "জানলা খুলে দিতে বলব?"

একটা ভ্যাপসা গন্ধ ঘরে ভাসছিল। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "জানলা

pathagar.net

কতদিন খোলা হয়নি? মঙ্গলাবাবু মারা যাওয়ার পর থেকেই বন্ধ?"

"না। উনিও খুলতেন না। আমার মনে পড়ে না।"

"খুলে দে, হাওয়া ঢুকুক।"

জানলা খোলার পর আলো জ্বালার প্রয়োজন হল না। অর্জুন তাকাল। দেওয়ালজোড়া আলমারি, তাতে সুন্দর করে বই সাজানো। আলমারির উপর বইয়ের নাম অনুযায়ী আদ্যক্ষর লিখে রাখা হয়েছে। গল্প উপন্যাস কম, বেশিরভাগই প্রবন্ধের বই, ইতিহাসের বই। গল্প উপন্যাসের বেশিরভাগই ইংরেজি ভাষায়। ঘরের মাঝখানে একটা কাচের ঢাকনা দেওয়া টেবিল। ঢাকনাটিতে তালা দেওয়া। ভিতরে বেশ কিছু পাণ্ডুলিপি।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "এগুলো?"

নির্মল মাথা নাড়ল, "আমি জানি না। আমি কখনও এই ঘর নিয়ে মাথা ঘামাইনি। একমাত্র মঙ্গলাবাবুকেই এই ঘরে দিনরাত পড়ে থাকতে দেখেছি। মা জননী তাঁকে অনুমতি দিয়েছিলেন। উনি চলে যাওয়ার পর আর দরজা খোলা হয়নি।"

নির্মল চাকরকে নিয়ে বিদায় নিলে অর্জুন জানলার দিকে তাকাল। সামনেই বাগান। গাছপালায় ঠাসা। মঙ্গলাবাবু জানলা খুলতেন না কেন? সঙ্গে সঙ্গে অর্জুনের কপালে ভাঁজ পড়ল। জানলা বন্ধ রাখা মানে উনি কী করছেন তা লোকজনকে জানতে না দেওয়া। সেই কাজটা কী ছিল?

আলমারিগুলোতে তালা নেই। 'এ' লেখা আলমারির পাল্লা খুলে সে বইগুলোর দিকে তাকাল। দেখলেই বোঝা যায় ওদের অনেক বয়স হয়েছে। একটা বই টেনে নিল সে। বাঁধানো বই। পাতা হলদে। বইটির নাম 'এ নাইট ইন ক্যালকাটা।' লেখকের নাম এস টি মুরহেড। এই বইটি ছাপা হয়েছে ১৮৪০ সালে। অর্থাৎ সিপাহি বিদ্রোহ হয়নি, রবীন্দ্রনাথ তখনও জন্মাননি। পড়তে হবে বইটা। যে বইটি 'আ' আদ্যক্ষরে পাওয়া গেল, তার নাম 'আলালের ঘরের দুলাল', প্রথম সংস্করণের বই নয়, চল্লিশ বছর আগে কেনা। বইটার টাইটেল পেজের নীচে লেখা ম. দ।

চমকে উঠল সে। তাবিজের ভিতরে পাওয়া কাগজটা এখনও পকেটে, বের করল অর্জুন। মিলিয়ে দেখল, হস্তাক্ষর এক। ম.দ মানে মঙ্গলময় দত্ত। এই বইটি তা হলে ভদ্রলোক কিনেছিলেন, নাম লিখেছেন, পরে এই লাইব্রেরিতে রেখে দিয়েছেন। এবং ওই তাবিজটাও ওঁর। মঙ্গলময়বাবুর তাবিজ ওই অতদূরে বেলগাছের পাশের ঝোপে গেল কী করে? উনি তো

ওখানে মারা যাননি। অন্তত গজেনদাদু তাই বললেন।

দু'-দুটো মোটা খাতা পাওয়া গেল, তাতে এই ঘরে যত বই আছে তার নাম লেখা। কোন আলমারিতে কোন বই, লেখক কে, কবে কেনা হয়েছিল, তার বিস্তারিত বিবরণ। মোট বইয়ের সংখ্যা এগারোশো একুশ। বইগুলোর উপর চোখ বোলাতে-বোলাতে থমকে গেল সে, 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর পাশের তারিখ দেখে। এই বইটি কেনা হয়েছিল ১৮৬১ সালে, যে বছর রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন। অথচ এখানকার আলমারিতে যে বইটি রয়েছে সেটি কেনা হয়েছে ১৯৬১ সালে। যদি প্রথম কেনা বইটি হারিয়ে যায় অথবা নষ্ট হয়ে যায়, তা হলে দ্বিতীয় তারিখটির উল্লেখ এখানে থাকার কথা। এরকম বেশ কিছু বই যা দ্বিতীয়বার কেনা হয়েছিল তার তারিখ খাতায় লেখা রয়েছে।

প্রথম বইটি না পাওয়ায় যদি মঙ্গলময়বাবু নিজের নামের আদ্যক্ষর লেখা বই পাঠাগারে দান করে থাকেন, তা হলে খাতায় দান করার তারিখ লিখলেন না কেন? কোনও কারণ ছাড়াই 'আলালের ঘরের দুলাল' পড়তে শুরু করল সে। বাংলা ভাষা এই কিছুদিন আগেও কত কাঁচা ছিল! বঙ্কিম তাকে হামাগুড়ি দিতে শিখিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাকে দাঁড় করিয়ে শুধু হাঁটি-হাঁটি পা-পা নয়, রীতিমত দৌড় করিয়ে গিয়েছেন। মুখ তুলল সে। সঙ্গে সঙ্গে জানলার ও পাশে বাগানের গাছের আড়ালে কেউ যেন চট করে সরে গেল। অর্জুন উঠে জানলার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েও কাউকে দেখতে পেল না।

বিকেল হয়ে এসেছে। অর্জুনের কেবলই মনে হচ্ছিল এই লাইব্রেরি ঘরে অনেক রহস্য জমা হয়ে আছে। সে চাকরটিকে ডেকে জানলা-দরজা বন্ধ করতে বলল। সম্ভবত খবর পেয়েই, নির্মল সেখানে হাজির। তাকে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "এই ঘরের চাবি আমার কাছে রাখতে পারি? রাত্রে ঘুম না এলে বই পড়তে আসতে পারি।"

"নিশ্চয়ই।" নির্মল মাথা নাড়ল, "তবে মা জননীকে একবার জিজ্ঞেস করে নিতে হবে। চাবিটা ওঁর কাছেই তো থাকে। আর হ্যাঁ, আজ সন্ধ্যারতির পর মা জননী তোকে ওঁর কাছে একবার নিয়ে যেতে বলেছেন!"

"বেশ তো, যাওয়া যাবে। কিন্তু এখন সন্ধে নামার আগে আমাকে সেই গাছটার কাছে নিয়ে চল, যেখানে মঙ্গলময়বাবুর মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল।"

PathagarNet

নির্মল চাকরকে কিছু নির্দেশ দিয়ে বলল, "চা খেয়ে গেলে হত না!"

"না। সন্ধে নেমে যাবে।"

বাগানে পা রেখে অর্জুন চারপাশে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেল না। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "তোদের এই বাড়িতে একটা লোক থাকে। লোকটার গলা বলে কিছুই নেই। মুখটাকে বীভৎস বললে কম বলা হবে। চেহারাটা বেশ গাট্টাগোট্টা। কে রে?"

"তুই কী করে জানলি?" নির্মল অবাক।

"দেখেছি।"

"আচ্ছা! ও তো সাধারণত এদিকে আসে না। পিছনের জমিতে গোরু-ছাগলের দেখাশোনা করাই ওর কাজ।" হাসল নির্মল, "ওর নাম বকু।"

মাথা নাড়ল অর্জুন, কথা বাড়াল না।

গেট পেরিয়ে সোজা রাস্তা ধরে একটু হাঁটতেই চায়ের দোকানটা এসে গেল। দূর থেকেই অর্জুন লোকগুলোকে দেখতে পেল। সকালে যারা ছিল তারা তো আছেই, নতুন কয়েকজন যোগ দিয়েছে। সে বলল, "চা খাওয়া যাক।"

"এখানে? না।" মাথা নাড়ল নির্মল।

"না কেন?"

"এখানে চা খেলে আমার চাকরি চলে যাবে।"

"ও।! আমি খেলে কোনও সমস্যা হবে?"

কাঁধ নাচাল নির্মল। অর্জুন চায়ের দোকানের সামনে পৌঁছে বলল, "একটা চা, ভাল করে।"

দোকানদার নির্মলের দিকে তাকাল। অর্জুন বলল, "ও খাবে না।" তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে যে লোকটা সিগারেট দিয়েছিল সকালে, তাকে বলল, "আপনাকে ধন্যবাদ।"

"কেন?"

"আপনি বললেন বলেই গজেনদাদুর সঙ্গে পরিচয় হল। দারুণ মানুষ। তবে দেখলাম, উনি আত্মায় বিশ্বাস করেন। বললেন, এই গ্রামের গাছগুলোয় নাকি তাঁরা থাকেন।"

লোকটির মুখে এখন অস্বস্তি স্পষ্ট। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "চা চলবে?"

মাথা নাড়ল লোকটি, "একটু আগে খেয়েছি।"

pathagar.net

নির্মলের পাশে দাঁড়িয়ে চা খেতে খেতে অর্জুন দেখল আড্ডাধারীরা একটু ওপাশে সরে গেছে এবং নিজেদের মধ্যেও কথাবার্তা বলছে না। অথচ সকালে সে যখন এখানে ছিল তখন এমন দৃশ্য ছিল না। ব্যাপারটা যে নির্মলের উপস্থিতির কারণেই হচ্ছে, তাতে কোনও সংশয় নেই।

চা খেয়ে দাম মিটিয়ে হাঁটতে শুরু করে সে নির্মলকে জিজ্ঞেস করল কথাটা।

নির্মলও যেন চলে আসতে পেরে হালকা হয়েছে। বলল, "তোমাকে তো বলেছি, স্থানীয় মানুষের সঙ্গে আড্ডা মারলে আমার চাকরি থাকবে না। এটা বোধহয় ওরাও জানে।" তারপর একটু অভিমানী গলায় জিজ্ঞেস করল, "তুমি যে গজেনদাদুকে খুঁজে বের করেছ তা আমায় বলোনি তো।"

তুই থেকে তুমিতে উঠে গেল নির্মল। এটা হয়তো অভিমানের কারণে। কিন্তু ও-ই তো তাকে ডেকে এনেছে পুরনো বন্ধুত্বের সূত্রে। তাই দূরত্বটা কমাবার চেষ্টা করল অর্জুন, "বলব-বলব করেও বলা হয়নি। তা তুই কি আমাকে চলে যেতে বলছিস?"

"মানে?"

"হঠাৎ তুমি বলতে শুরু করলি।"

"ধ্যাৎ।" হেসে উঠল নির্মল শব্দ করে। বোধ হয় মেঘ সরে গেল।

গ্রামে ঢোকার প্রধান রাস্তায় একটি ঝাঁকড়া গাছের নীচে পৌঁছে নির্মল বলল, "এই এখানে মঙ্গলাবাবুর মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল।"

গত রাত্রে অন্ধকারে তারা গ্রামে ঢুকেছিল, কিন্তু সেটা এই পথেই তাতে কোনও সন্দেহ নেই। অর্জুন মুখ তুলে গাছটার দিকে তাকাল। মোটা গুঁড়ি, নীচের ডালটা লাফালেই ছোঁয়া যায়। সে লাফিয়ে ধরল ডালটাকে, তারপর সহজেই তার উপর উঠে বসল। আশির বেশি বয়সের মানুষ কেন এই ডালে উঠবেন? সে গাছটাকে ভালভাবে দেখল। অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ল না। শরীরটাকে অলসভাবে ছেড়ে দিল সে। ছয়-সাড়ে ছয়ফুট উচ্চতা থেকে মাটিতে পড়লে ব্যথা পাওয়ার কথা নয়। কিন্তু আশির উপরে যাঁর বয়স তাঁর হাত-পায়ের হাড় ভাঙতেই পারে। কিন্তু মরে যাওয়া কি সম্ভব? অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "মঙ্গলময়বাবুর হাঁটু আর গোড়ালি ভাঙা ছিল?"

"হ্যাঁ।"

"রক্ত বের হয়েছিল?"

"না। কোনও আঘাতের চিহ্ন বাইরে থেকে বোঝা যায়নি!"

pathagar.net

"উপর থেকে নীচে পড়ে ওঁর হার্ট তো ফেল করতেই পারে।"

"পোস্টমর্টেম করে জানা গেছে তা হয়নি। হার্ট ভাল ছিল। নীচে পড়ার পর ঝাঁকুনিতে ওঁর হৃদ্‌যন্ত্র বন্ধ হয়েছে।"

অর্জুন বলল, "তা হলে তো ল্যাঠা চুকেই গেল।"

"মা জননী পুলিশের বক্তব্য মানতে চাইছেন না। ওঁর ধারণা, মঙ্গলাবাবুর পক্ষে ওই গাছে ওঠা সম্ভবই নয়। আমি তোর কথা ওঁকে বলতেই উনি চিঠি লিখতে বললেন।"

অর্জুন চারপাশে তাকাল। রাস্তার পাশে চাষের মাঠ। এখন ফসল তোলা হয়ে গিয়েছে। গাছের পাশ থেকে সরে সে মাঠে চলে এল। শুকনো মাটি, সন্দেহজনক কোনও চিহ্ন নেই। সে হাত বাড়িয়ে একটা দিক দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, "এই মাঠ পেরিয়ে সোজা চলে গেলে কোথায় পৌঁছোব?"

"গ্রামের পিছনদিকটায়।"

"ওখান থেকে মহাবটবৃক্ষ কত দূরে? ওদিকেই কি?"

নির্মল অবাক হয়ে গেল, "তুই মহাবটবৃক্ষের নাম এর মধ্যে জেনে গেলি?"

"আজ নয়, কাল জেনেছি।"

"কাল? রাত্রে এখানে এসে কার কাছে শুনলি?"

"স্বপ্নে। দুটো ভূত বলাবলি করছিল।"

"ভ্যাট। গুল মারছিস।" নির্মল হাসল, "হ্যাঁ, এই মাঠ পেরিয়ে বেশ অনেকটা, তা ধর, মাইল আড়াই গেলে গাছটার কাছে পৌঁছোনো যায়। কেন রে?"

"এমনিই। চল, ফেরা যাক, সন্ধে নামছে।"

মাঝে মাঝে সাইকেলের ঘণ্টা শোনা যাচ্ছে। লোকেরা বেশ দ্রুত প্যাডেল ঘুরিয়ে গ্রামে ফিরছে। অন্ধকার হয়ে যাওয়ার পর ওরা সেনবাড়িতে ঢুকল। নির্মল বলল, "তুই ফ্রেশ হয়ে নে। আমি আধ ঘণ্টা পরে আসছি।"

নির্মল চলে যাচ্ছিল, অর্জুন তাকে ডাকল, "নির্মল।"

"বল।" ফিরে তাকাল নির্মল।

"আচ্ছা, মঙ্গলময়বাবু কি ধর্মভীরু মানুষ ছিলেন?"

"ধর্মভীরু?" কপালে ভাঁজ পড়ল নির্মলের, "বুঝতে পারছি না। আমি তো ওঁকে কখনও ধর্মাচরণ করতে দেখতাম না। পুজোর সময় কখনও মণ্ডপে যেতে দেখিনি।"

pathagar.net

"উনি মাদুলি কিংবা তাবিজ পরতেন?"

"আমি দেখিনি। হয়তো জামার তলায় ছিল..." বলেই মাথা নাড়ল নির্মল, "না। পরতেন না। ওঁকে যখন দাহ করা হয় তখন শরীরে ওসব ছিল না।"

অর্জুন মাথা নাড়ল।

"এসব প্রশ্ন করছিস কেন?"

"মানুষটি কেমন ছিলেন বুঝতে চেষ্টা করছি।" অর্জুন হাসল।

পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে দোতলার যে ঘরে নির্মল তাকে নিয়ে গিয়ে বসাল, সেই ঘরটিতে যা সম্পদ রয়েছে তা পৃথিবীর যে-কোনও জাদুঘর লুফে নেবে। এক দেওয়ালে বিশাল-বিশাল হাতির দাঁত, বাঘের ছাল, যা থেকে বোঝা যায় এই বংশে বেশ ভাল শিকারি ছিলেন। লম্বা টুলের উপর হাতির দাঁত দিয়ে তৈরি একটি নারীমূর্তি তো অপূর্ব। পায়ের তলায় যে কার্পেট, তাও চমৎকার ও দামি।

এই ঘরের চেয়ারে নির্মল অর্জুনকে বসিয়ে চলে গিয়েছিল। সুদৃশ্য ঢাকনার আড়াল থেকে বিচ্ছুরিত আলো মায়াময় পরিবেশ তৈরি করেছে। পাশের ঘরের পরদা সরিয়ে মা জননী ঘরে এলেন। এখন তাঁর পরনে গরদ, কবজি-ঢাকা জামা, অর্জুন উঠে দাঁড়ালে মাথা নাড়লেন, "বসুন। এখানে আপনার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো?"

"না, না। বিন্দুমাত্র না।"

"আপনি নির্মলবাবুর বন্ধু হতে পারেন, কিন্তু এখন আমার অতিথি।"

"ধন্যবাদ।"

"হ্যাঁ। মঙ্গলময়বাবুর মৃত্যু আমাদের কাছে খুবই দুঃখের। স্বাভাবিকভাবে মারা গেলে কিছু বলার ছিল না। আমার ধারণা, ওঁকে হত্যা করা হয়েছে। ঝামেলা এড়াতে পুলিশ স্বাভাবিক মৃত্যু বলে চালাতে চাইছে। উনি এ বাড়িতে এসেছিলেন আমার শ্বশুরমশাইয়ের আমলে। কোনওদিন তাঁর কাজে কোনও গাফিলতি দেখিনি। মানুষটার এইভাবে মরে যাওয়া আমি মেনে নিতে পারছি না।" মা জননী বললেন।

"ওঁর কোনও শত্রু ছিল?"

"থাকার কথা নয়। অবসর নেওয়ার পর উনি এই বাড়ি থেকে বের হতেন

pathagar.net

না। কেউ ওঁর সঙ্গে দেখা করতে আসত না। আত্মীয়স্বজনও ছিল না।"

অর্জুন তাকাল, "তা হলে? আপনার কথা অনুযায়ী ওঁকে খুন করার কোনও কারণ নেই।"

"কিন্তু ওঁর মৃত্যু স্বাভাবিকভাবে হয়নি। গাছ থেকে পড়ে দুর্ঘটনায় মারা যাননি।"

"কিছু মনে করবেন না, অনুমানের উপর দাঁড়িয়ে আপনি সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন।"

"না, শুধু অনুমান নয়।" মা জননী গম্ভীর গলায় বললেন।

অর্জুন লক্ষ করল ভদ্রমহিলা ইতস্তত করছেন। তারপর, "এক মিনিট" বলে পাশের ঘরে চলে গেলেন। মিনিট তিনেক পরে ফিরে এসে চেয়ারে বসলেন। এখন ওঁর হাতে একটি বই, বইটি বাঁধানো। বললেন, "আজ থেকে একবছর আগে মঙ্গলময়বাবু আমার কাছে এই বইটি পাঠিয়েছিলেন। আমাদের বংশের পূর্বপুরুষরা পালদের পর গৌড়ের রাজা হয়েছিলেন। বল্লাল সেন, লক্ষ্মণ সেনের নাম সবাই জানেন। লক্ষ্মণ সেন ভীরু প্রকৃতির মানুষ ছিলেন? তাই যুদ্ধ না করে পূর্ববঙ্গে পালিয়ে যান। তাঁর যে সব আত্মীয় থেকে গেলেন তাঁরা ভয়ে আত্মগোপন করেন। এঁদের দু'জনের কাছে প্রচুর মণিরত্ন ছিল। এঁদেরই একজন আমার স্বামীর পূর্বপুরুষ ছিলেন। এই বইটিতে ইংরেজি ভাষায় সেই সময়ের কথা লেখা রয়েছে। লাইব্রেরিতে পড়াশোনা করতে করতে মঙ্গলময়বাবু এই বইয়ের সন্ধান পান। বোধহয় আমার জানা উচিত ভেবে তিনি বইটি আমাকে পাঠিয়েছিলেন। পড়ব-পড়ব করেও সময় না পাওয়ায় পড়া হয়ে ওঠেনি তখন। উনি মারা যাওয়ার পর মনে পড়ল বইটির কথা। পড়লাম, সেই সঙ্গে বইটির ভিতরে একটা চিরকুট দেখতে পেলাম।"

হাত বাড়িয়ে চিরকুটটি এগিয়ে ধরলেন মা জননী। অর্জুন সেটি নিয়ে পড়ল,

বিপুল সম্পদ আপনাদের অজ্ঞাতে রয়েছে। কোথায় রয়েছে এখনও জানি না। তবে খবরটা শত্রুপক্ষেরও জানা থাকতে পারে। সাবধানে থাকবেন। এই কারণে আমিও বিপদে পড়তে পারি।

ম. দ।

"মঙ্গলাবাবু যে পুরো নাম লিখতেন না, তা আপনি জানতেন?"

"না। এই চিরকুট পাওয়ার পর জানলাম।"

pathagar.net

"যে বিপুল সম্পদের ইঙ্গিত এখানে আছে, তা নিয়ে ওঁর সঙ্গে কথা হয়নি?"

"না। উনি জানাননি এই বইয়ের ভিতরে চিরকুট আছে। আমার উদাসীনতার জন্যেই তখন পড়িনি। আর অবাক লাগছে, আমার কাছে কোনও প্রতিক্রিয়া জানতে না পেরেও তিনি দ্বিতীয়বার এ নিয়ে কথা তোলেননি।" মা জননী বললেন।

"এই একবছরে আপনার কাছে কেউ কোনও প্রস্তাব নিয়ে এসেছে?"

"মানে?"

"সেন বংশের কোনও অজানা শরিক কি এর মধ্যে আপনার কাছে এসেছেন?"

"না।"

"আপনার এই বাড়িতে ক'জন মানুষ থাকেন? কর্মচারী এবং আপনারা?"

"এখন এখানে আমি ছাড়া আমার এক দেওর থাকেন। তিনি মানসিক প্রতিবন্ধী, দেখলে বোঝা যাবে না, কিন্তু তাঁর ব্রেন কাজ করে না। কথা বলেন খুব কম। ষাটের কাছে বয়স। সারাদিন ঘরে শুয়ে টিভি দেখেন, আসলে কিছুই দেখেন না। শুধু বিকেল হলে ছাদে যান পায়চারি করতে। কিন্তু কখনওই ছাদের ধারে যাবেন না। যা কিছু হাঁটাহাঁটি তা ছাদের মাঝখানে। আমার একমাত্র ছেলে শিকাগোতে। খুব বড় চাকরি করে সে। দু'বছর অন্তর এখানে আসে। তার খুব ইচ্ছে যে, এসব বিক্রি করে আমি ওখানে চলে যাই। আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই। বছরদুয়েক আগে সে বিয়ে করে স্ত্রীকে নিয়ে এখানে এসেছিল। মেয়েটিকে অপছন্দ হয়নি আমার। স্পেনের মেয়ে। এ ছাড়া এই বাড়িতে কর্মচারীর সংখ্যা বারো। বেশিরভাগই দীর্ঘকাল কাজ করছে। মঙ্গলাবাবুর দুর্ঘটনার রাত্রে কেউ এ বাড়ির বাইরে পা বাড়ায়নি। আমি খুঁটিয়ে জেরা করে জেনেছি।" মা জননী বললেন।

কিছুক্ষণ কথা বলার পর অর্জুন ঘড়ি দেখল। তারপর জিজ্ঞেস করল, "আপনার দেওর কি ঘুমিয়ে পড়েছেন এখন?"

"হ্যাঁ। ওঁকে ওষুধ খাইয়ে দেওয়া হয়। ঘুমের সময় হয়ে গিয়েছে।"

"কাল সকালে ওঁর সঙ্গে কথা বলা যাবে?"

মা জননী হাসলেন, "আপনি বোধহয় আমার কথা বুঝতে পারেননি। ওঁর ব্রেন কাজ করে না। কথা বলার চেষ্টা করে কোনও লাভ হবে না।"

pathagar.net

"বুঝতে পেরেছি। তবু..,"

"ঠিক আছে। কাল বিকেলে উনি যখন ছাদে বেড়াতে যাবেন, তখন ম্যানেজারবাবু আপনাকে নিয়ে যাবে উপরে।"

"আপনি বললেন এই বাড়িতে বারোজন লোক কাজ করে। আমি প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলতে চাই।" অর্জুন তাকাল।

"কখন?"

"এখনই হতে পারে। এখানে অসুবিধে হলে আমি যেখানে রয়েছি সেখানে পাঠিয়ে দিন। আর এই বইটি আমি একটু নিতে পারি?"

"নিশ্চয়ই। আপনার পড়া হয়ে গেলে আমি এটাকে লাইব্রেরিতে রেখে দিতে চাই।" ইংরেজি বইটা এগিয়ে ধরলেন মা জননী। সেটি নিয়ে উঠে পড়ল অর্জুন। মা জননী তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন, "রহস্যের সমাধান কতদিনে সম্ভব?"

অর্জুন হাসল, "আগে প্রমাণিত হোক এর মধ্যে রহস্য রয়েছে, তা হলে নিশ্চয়ই সমাধানের চেষ্টা করব। মনে হয় আগামী পরশুর মধ্যে হ্যাঁ অথবা না আপনাকে বলে দিতে পারব।"

বইটির নাম, "ডেজ় আফটার হি ক্লেড।" লেখকের নাম এম.স্কট। বইটি ছাপা হয়েছে ১৯০৩ সালে, প্রকাশিত হয়েছে লন্ডন থেকে। প্রথম পাতায় চোখ রাখল অর্জুন। ভূমিকায় লেখক সেনবংশকে বাংলার শেষ হিন্দুরাজাদের বংশ বলে উল্লেখ করেছেন। বইয়ে একটা ম্যাপও রয়েছে, যেখানে বাংলা ভারতবর্ষের ঠিক কোনখানে তা দেখানো হয়েছে। মাত্র কয়েক পুরুষেই সেনেরা বাংলার রাজা হয়ে গিয়েছিলেন। এই গ্রন্থ তাঁদের শেষ রাজা লক্ষ্মণ সেন এবং তাঁর বংশধরদের জীবনযাপন নিয়ে লেখা।

এরকম কোনও বই যে আছে তা জানতই না অর্জুন। হঠাৎ মনে হল কোথায় ইংল্যান্ডে বসে একজন ইংরেজ একশো বছর আগে গবেষণা করে এমন একটা বই লিখে ফেলেছিলেন যার বিষয় নিয়ে গত দেড়শো বছরে কোনও বাঙালি কৌতূহল প্রকাশ করেনি। কেন লিখলেন ওই ভদ্রলোক? উত্তর জানা নেই, কিন্তু ওঁরাই পারেন এরকম কাণ্ড করতে। মূল বইয়ের প্রথম লাইনে চোখ রাখল সে, "বাংলার শেষ রাজা লক্ষ্মণ সেন কি বাঙালি ছিলেন? কতদিন কোনও ভূখণ্ডে বাস করলে তাকে সেই দেশের মানুষ

হওয়ার সম্মান দেওয়া যায়? ইংল্যান্ডে দেড়শো বছর ধরে যে পরিবার বাস করছেন তাঁরা যদি মিশর থেকে এসে থাকেন তা হলে কি তাঁদের ইংরেজ বলা যাবে? যদি না যায়, তা হলে লক্ষ্মণ সেন এবং সেনবংশের কেউ বাঙালি ছিলেন না।"

দরজায় শব্দ হল। টেবিল ছেড়ে উঠে দরজাটা খুলতেই কাজের লোকটিকে দেখতে পেল অর্জুন। তার পিছনে কয়েকজন পুরুষ দাঁড়িয়ে রয়েছে চুপচাপ। কাজের লোকটি কপালে হাত ছুঁইয়ে বলল, "মা জননী পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

"ও। ঠিক আছে। তুমি একজন একজন করে আমার ঘরে পাঠাবে।" অর্জুন ফিরে গেল চেয়ারে। প্রথমে যে ঢুকল সে প্রৌঢ়। একটু রুগ্‌ণ। অর্জুন দ্বিতীয় খালি চেয়ারটা দেখিয়ে বলল, "বসুন।"

লোকটি হাতজোড় করল, মালদা জেলার নিজস্ব ঘরানায় বলল, সে দাঁড়িয়েই থাকবে।

"তোমার নাম কী?"

"ঘনশ্যাম দাস।"

"কত বছর এই বাড়িতে কাজ করছ?"

"ঊনত্রিশ বছর। আগে জোগাড় দিতাম, এখন রান্না করি।"

"তোমার বাড়ি কি এই গ্রামে?"

"না। চাঁচোলে। তা সেখানে কেউ নেই এখন।"

"তোমার স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে?"

"না। বাবু, আমি বিয়ে করিনি। এখানেই থাকি, কোথাও যাই না।"

"মঙ্গলময়বাবুকে তোমার কেমন লাগত?"

"যখন চাকরি করতেন তখন খুব কড়া মানুষ ছিলেন। এখন তো শুধু বই নিয়ে থাকতেন। কোনও-কোনও রাত্রে খেতেও যেতেন না। খবর পাঠালে বলতেন, খাবেন না। অনেক রাত্রে ঘুম ভাঙলে দেখতে পেতাম ওঁর ঘরে আলো জ্বলছে।" লোকটি জানাল।

"ওঁর কাছে কেউ আসত?"

"আমি দেখিনি।"

"গাছ থেকে পড়ে গিয়ে ওঁর মৃত্যু হয়েছে না, কেউ ওঁকে খুন করেছে?"

"কী করে বলব বাবু!"

"ওঁর কোনও শত্রু ছিল?"

pathagar.net

"আমি জানি না।"

পরপর পাঁচজন প্রায় একই কথা বলল। অল্পবয়স্ক একজন বলল, "উনি খুব রাগি ছিলেন বলে আমি ওঁর সামনে যেতাম না।"

"ওঁকে কেন রাগি বলে মনে হত তোমার?" অর্জুন জিজ্ঞেস করেছিল।

"আমি একবার ওঁর ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে বইতে হাত দিয়েছিলাম দেখে উনি খুব রেগে আমায় অনেক বকেছিলেন।"

ষষ্ঠ লোকটি ঘরে ঢুকে গোঁজ হয়ে দাঁড়াল। এই লোকটিই যে তাকে বাগানের গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখছিল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

"তোমার নাম বকু?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

ঘাড় না থাকায় মাথাটা সামান্য দুলল। ওইটুকুই।

"মঙ্গলময়বাবুকে কে খুন করেছে?"

সঙ্গে সঙ্গে বকুর চোখ বড় হয়ে গেল। দ্রুত মাথা ঘুরতে লাগল ঘাড়ের উপর, "আমি জানি না, আমি জানি না।"

"বাগানে গাছের আড়ালে লুকিয়ে আমাকে দেখছিলে কেন?"

"আপনি... আপনি...!"

"আমি কী?"

"নতুন লোক, তাই।"

"তোমার কাজ তো বাড়ির পিছনে গোয়ালঘরে। তাই না?"

"হ্যাঁ। পাঁচটা গাই। তিনটে দুধ দেয়।"

"মঙ্গলময়বাবুকে তুমি দেখেছ?"

"হুঁ।"

"ওঁর শরীরে কেমন জোর ছিল? গাছে উঠতে পারতেন?"

"ধুস! উনি সিঁড়ি দিয়ে সোজা উঠতে পারতেন না।" বকু বলল।

অর্জুন তাকাল লোকটির দিকে। তারপর জিজ্ঞেস করল, "বকু, তুমি কখনও ভূত দেখেছ?"

প্রশ্নটা শোনামাত্র লোকটির মুখের চেহারা বদলে গেল। চট করে দু'পা এগিয়ে এসে নিচুগলায় বলল, "দেখেছি। এই বাড়িতে ভূত আছে বাবু।"

অর্জুন গম্ভীর হল, "এ কথা কাউকে বলেছ?"

"হ্যাঁ। ম্যানেজারবাবুকে বলেছিলাম। তিনি বিশ্বাস করেননি।" বকু বলল, "ভূতটা গোয়ালঘরের কাছে ঘুরে বেড়ায়। তখন গাইগুলো ছটফট করে।"

Pathagar.net

"নিজের চোখে দেখেছ?"

"হ্যাঁ বাবু। কালো জামাপরা ভূত।"

"কথা বলেছ?"

"কথা? ওরে বাব্বা, আমি তো ভয়ে চোখ বন্ধ করে ছিলাম।"

"কতবার ভূতটাকে দেখেছ?"

"দু'বার। দুই রাতে।"

"ঠিক আছে। এসব কথা আর কাউকে বলার দরকার নেই। এখন যেতে পারো।"

স্কটসাহেবের বইটা শেষ করতে রাত সাড়ে বারোটা বেজে গেল। তারিখ এবং পরিচিত ঐতিহাসিক নামগুলো না থাকলে জমজমাট উপন্যাস বলা যেতে পারত। লক্ষ্মণ সেন যত ধনসম্পদ নিয়ে যেতে পেরেছেন তড়িঘড়িতে তার দশগুণ পড়ে ছিল গৌড়ের রাজপ্রাসাদে। অষ্টাদশ অশ্বারোহী সেগুলোর দখল নেওয়ার আগেই লক্ষ্মণ সেনের নিকট আত্মীয়েরা তার অনেকটাই সরাতে পেরেছিল। লক্ষ্মণ সেনের হাতে রাজশক্তি থাকায় তিনি গৌড় থেকে পূর্ব বাংলায় পালিয়ে যাওয়ার সময় ভয়ংকর নদীগুলো পার হতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু সেই সুযোগ অন্য আত্মীয়দের ছিল না। তারা লুকিয়ে পড়েছিল গৌড়ের কাছাকাছি গ্রাম অঞ্চলে। শত্রুদের ভয়ে এদের কয়েকপুরুষ আত্মপ্রকাশ করতে সাহসী হয়নি।

অর্জুন বই বন্ধ করল। এই বাড়ির পূর্বপুরুষের কী নাম ছিল? লক্ষ্মণ সেনের কে হতেন তিনি? মঙ্গলময়বাবুর লেখা চিরকুট প্রমাণ করছে যে, তিনি সেনবংশের এই শরিককে গবেষণার বিষয়বস্তু করেছিলেন। কেন? সেই ধন-সম্পদের সন্ধান নিতে কি চেয়েছিলেন? সে কারণেই কি তিনি নিজের বিপদের আশঙ্কা করেছিলেন?

ব্যাপারটা যদি এরকম হয়ে থাকে তা হলে মা জননীর সন্দেহ সঠিক। ওঁকে খুন করা হয়েছে। যে মানুষটির শরীর গাছে ওঠার পক্ষে অনুপযুক্ত, তিনি গাছ থেকে পড়ে গিয়ে মারা গেছেন বলা চলে না। কিন্তু তাঁর শরীর যেখানে পাওয়া গিয়েছে তার চেয়ে বহু দূরে ঝোপের মধ্যে তাবিজটাকে পাওয়া গেল কেন? চিরকুটের লেখার সঙ্গে তাবিজের কাগজের লেখার বিন্দুমাত্র পার্থক্য নেই।

Pathagar.net

সকালে নির্মল দেখা করতে এল, "কী রে, কী বুঝছিস?"

"এখনও অন্ধকারে।"

"সে কী?" নির্মল অবাক হল।

"এটা কি পি সি সরকারের ম্যাজিক?"

"না না, তা বলছি না।" নির্মল হাসার চেষ্টা করল।

"শোন," অর্জুন বলল, "আমি একবার থানায় যেতে চাই। গাড়ি পাওয়া যাবে?"

"নিশ্চয়ই। মা জননী বলেছেন, তোর যা দরকার তা তোকে দিতে। কখন যাবি?"

"এখনই। রোদ বাড়ার আগে ঘুরে আসি। তোদের ড্রাইভার নিশ্চয়ই থানার রাস্তা চেনে! ওকে বলে দে!"

"আমি সঙ্গে যাব?" নির্মল তাকাল।

"নাঃ। দরকার নেই।"

নির্মল বোধহয় একটু ক্ষুণ্ণ হল। কিন্তু কথা বাড়াল না।

ড্রাইভারের বয়স হয়েছে। গাড়িরও। খুব শান্ত ভঙ্গিতে গাড়িটা চলছিল। দু'পাশের বাড়িঘর পিছিয়ে গেলে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কতক্ষণ লাগবে?"

"গতি বাড়ালে তাড়াতাড়ি হবে।" বৃদ্ধ জবাব দিলেন।

তখনই খেয়াল হল, এই লোকটিকে তার কাছে অন্যান্যদের সঙ্গে পাঠায়নি নির্মল। ফলে এঁকে জেরা করা হয়নি।

"আপনি তো সেনবাড়িতেই থাকেন?"

"না। পাশের পাড়ায় আমার বাড়ি। রাত্রে ডিউটি না থাকলে বাড়ি ফিরে যাই।"

"রাত্রে কি প্রায়ই ডিউটি করতে হয়?"

"খুব কম।"

অর্জুন ইচ্ছে করেই আর কোনও প্রশ্ন করল না। কিন্তু ওর মনে হল ড্রাইভার ভদ্রলোক যেন আরও প্রশ্ন শুনবেন বলে তৈরি হয়ে আছেন।

"ওই যে থানা।" আঙুল তুলে দূরের বাড়িটাকে দেখালেন ড্রাইভার।

মাঠের একপাশে আমকাঁঠালের গাছের ছায়ায় সুন্দর একটা বাড়ি।

pathagar.net

দেখলে মনে হবে, কোনও মহাপুরুষের আশ্রম। সামনে যদিও একটা বোর্ডে লেখা রয়েছে, থানা।

গাড়ি থেকে নেমে কোনও পুলিশকে দেখতে না পেয়ে বারান্দায় উঠল অর্জুন।

ভিতর থেকে গলা ভেসে এল, "আসুন, ভিতরে আসুন।"

পরদা সরিয়ে ভিতরে ঢুকতেই তিনজন মানুষকে চোখ বন্ধ করে বসে থাকতে দেখল অর্জুন। সাধারণত কারও স্মৃতির উদ্দেশে সম্মান জানাতে নীরবতা অবলম্বনের সময় আমরা ওইরকম মুখ করে বসে থাকি। হঠাৎ কানে এল, 'আসুন, ভিতরে আসুন।"

মুখ তুলতেই দাঁড়ে বসা পাখিটাকে দেখতে পেল অর্জুন। ওর ডাকটাকেই সে মানুষের গলা বলে ভুল করেছে। এবার ওঁরা মৌনতা ভাঙলেন। মুখোমুখি বড় চেয়ারে যিনি বসে ছিলেন, তিনি বললেন, "কিছু মনে করবেন না। আমরা শহীদদের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানালাম। বসুন। এবার বলুন, কীভাবে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি? আমি এই থানার ওসি, আপনি?"

"নমস্কার। আমি ঘুমঘুম গ্রামের সেনবাড়িতে এসেছি।"

"ঘুমঘুম? আবার ঘুমঘুম? আই উইল বি ম্যাড! আরে মশাই, সবাই কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন রাখতে ভালবাসে, জানি। তাই বলে এতটা! নামের সঙ্গে বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই? আমি চেয়েছিলাম, পুরো একবছরে আমার এলাকায় একটাও ক্রাইম হবে না। নো খুন, নো চুরি, নো রেপ, নাথিং। ব্যস, বছরের শেষে আমি মহাশান্তির এপারে থেকে প্রাইজটা পেয়ে যাব! চাইলে কী হবে, হতে দেবে এরা? কী যেন বললেন, সেনবাড়িতে এসেছেন? কেন? কী জন্যে?" দারোগার চোখ ছোট হল।

"একটা মৃত্যুর তদন্ত করতে।"

"তদন্ত? আপনি কি আই পি এস অফিসার? সি আই ডি?"

"দুটোর কোনওটাই নয়। আমি সত্যসন্ধানী। আপনি যদি আমাকে একটু সাহায্য করেন, তা হলে আমার কাজের খুব সুবিধে হয়।" অর্জুন বলল।

"সত্যসন্ধানী? ডিটেকটিভ! খুব ইচ্ছে ছিল, বুঝলেন, খুব ইচ্ছে ছিল জেমস বন্ড হব। হওয়া হল না।" শ্বাস ফেলার আওয়াজ হল, "বলুন।"

"সেনবাড়ির প্রাক্তন ম্যানেজার মঙ্গলময় দত্তকে গাছে তুলেছিলেন কেন?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

Pathagar.net

"মঙ্গলময়? ও, হ্যাঁ। গাছে না উঠলে নীচে পড়বেন কেন?"

"আমি ওঠার কথা বলিনি। তোলার কথা বলেছি। উনি যে বয়সে পৌঁছেছিলেন তাতে ওঁর শরীর কিছুতেই নিজের চেষ্টায় গাছে উঠতে পারত না।" অর্জুন হাসল।

ওসি কয়েক সেকেন্ড এমন চোখে তাকালেন যেন আজব কিছু দেখছেন, "পঙ্গু যখন পাহাড় পেরিয়ে যায় তখন তো বিশ্বাস করতেই হয়, তাই না? আশি বছরের মানুষকে আমি ফুটবলের রেনবো কিক মারতে দেখেছি। মঙ্গলময়বাবু যে অবস্থায় মাটিতে পড়েছিলেন, সেটা একমাত্র উপর থেকে পড়লেই সম্ভব। আপনার কি মনে হয় কেউ ওঁকে চ্যাংদোলা করে উপরে তুলে আচমকা ফেলে দিয়েছিল? যত্তসব। অনেক তদন্ত করেছি, কিন্তু ওই ভদ্রমহিলা যদি আমার উপর আস্থা রাখতে না পারেন তা হলে আমার কিছু করার নেই।"

"ভদ্রমহিলা?" অর্জুন জেনেশুনেই জিজ্ঞেস করল।

"সেনবাড়ির মা জননী। প্রচুর টাকা, ছেলে বিদেশে; তবু যক্ষের মতো এই ঘুমঘুমে পড়ে আছেন। কেন? কেউ তো নেই এখানে। স্বামীর মৃত্যুর পর কেউ ওঁকে একদিনের জন্যেও সেনবাড়ির বাইরে যেতে দেখেনি। কেন?"

"এটা ওঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার অফিসার। কিন্তু আমার ধারণা মঙ্গলময়বাবুকে কেউ বা কারা ওই গাছের উপরে নিয়ে গিয়ে নীচে ফেলে দিয়েছিল।" অর্জুন গম্ভীর হল।

"আশ্চর্য! ওঁকে উপরে নেওয়া হল আর উনি চেঁচালেন না?" ওসি বিরক্ত।

"মাঝরাত্রে সেই চিৎকার শোনার জন্যে কেউ হয়তো ছিল না, অথবা শরীরে প্রাণ না থাকায় তিনি চিৎকার করতে পারেননি।" অর্জুন বলল।

"তার মানে?" চেঁচিয়ে উঠলেন ওসি, "ওঁকে মেরে ফেলে গাছের উপর থেকে ছেড়ে দিয়েছিল অ্যাকসিডেন্ট প্রমাণ করতে? দূর। এমন রিস্ক কেউ নেয়? গাঁজাখুরি চিন্তা। আপনার নামটা কী মশাই? কোত্থেকে আসছেন?"

"আমি অর্জুন। জলপাইগুড়ি থেকে আসছি।"

'জলপাইগুড়ি? ওটা তো মফস্‌সল শহর। ওখানে কোনও ডিটেকটিভ থাকে?"

"সত্যসন্ধানী।"

pathagar.net

এই সময় যে দু'জন উর্দিপরা মানুষ এতক্ষণ চুপচাপ বসেছিলেন তাঁদের একজন সাততাড়াতাড়ি উঠে ওসির কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে কিছু বলতেই ওসির চোখ বড় হল, "যাঃ।"

"হ্যাঁ, স্যার।" লোকটি মাথা নাড়ল।

"নমস্কার, নমস্কার অর্জুনবাবু, আসলে আপনি এত ইয়ং বুঝতে পারিনি। কে না শুনেছে আপনার নাম? আপনি নর্থবেঙ্গলের গর্ব। বাট মানুষ মাত্রই ভুল করে। আপনি, কিছু মনে করবেন না, মহামানুষ তো নন। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট বলছে উপর থেকে পড়ে গিয়ে হাড়গোড় ভেঙেছে, সাডেন শকে প্রাণ বেরিয়ে গেছে। হেঁ হেঁ। এটা বিজ্ঞানসম্মত ব্যাপার। চা খাবেন?" ওসি বিগলিত।

"ধন্যবাদ। আপনি কি খুব ব্যস্ত?"

"আমি? না। একেবারেই না। আসলে আমার এখানে কোনও ক্রাইম হয় না। তা বলুন, কী করতে হবে। আমাদের এস পি সাহেব আপনার কথা খুব বলেন।"

"চলুন, একটু ঘুরে আসি।" অর্জুন উঠে দাঁড়াল।

"চলুন।" ওসি উঠলেন। "এই, আমি একটু ওঁকে নিয়ে সাইটসিয়িং-এ যাচ্ছি। তোমরা থানায় থাকবে। চলুন। আমার জিপটাই নিই, রাস্তা ভাল নয়।"

সেনবাড়ির ড্রাইভারকে অপেক্ষা করতে বলে পুলিশের জিপে উঠে বসল অর্জুন। ড্রাইভারের পাশে ওসি, তাঁর পাশে অর্জুন।

"খারাপ লাগে, বুঝলেন, খুব খারাপ লাগে।" ওসি নিচুগলায় বললেন।

"কোন ব্যাপারে?" অর্জুন তাকাল।

"যখন দেখি আমাদের উপর মানুষের আস্থা নেই, তখন মুষড়ে পড়ি। গ্রামের মানুষ যখন জানবে সেন মা জননী আমার উপর আস্থা রাখতে না পেরে জলপাইগুড়ি থেকে আপনাকে এনেছেন রহস্য সমাধানের জন্যে, তখন, বুঝতেই পারছেন —!" ওসির গলাটা অন্যরকম শোনাল।

"এ কী বলছেন? আপনার সাহায্য ছাড়া আমার পক্ষে কোনও রহস্যের সমাধান করা সম্ভব নয়। এই আপনি আপনার গাড়িতে আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন, এটাই তো আপনার উদারতা। আপনারা পাঁচটা ঝামেলায় থাকেন, কখনও একটু-আধটু ভুল হতেই পারে। আমি তো ম্যাজিশিয়ান নই যে, আপনার চেয়ে বড় কিছু করে দেখাব। যদি ভুল হয়ে থাকে, তা হলে সত্যি

pathagar.net

কী ছিল সেটা দেখার চেষ্টা করি," সবিনয়ে বলল অর্জুন, তারপর একটু থেমে জিজ্ঞেস করল, "মঙ্গলময়বাবুকে যে গাছের নীচে পাওয়া গিয়েছে সেখানেই চলুন।"

"এতদিন পরে সেখানে কি কোনও ক্লু খুঁজে পাবেন?"

"কিছু কি বলা যায়?" অর্জুন হাসল।

দূর থেকেই জায়গাটাকে জনশূন্য মনে হয়েছিল। গাছের পাশে গাড়ি দাঁড় করালে অর্জুন ডালটাকে দেখাল, "মঙ্গলময়বাবুকে মাটিতে পড়তে হলে ওই ওটার উপরে উঠতে হবে। প্রশ্ন হল, কেন উঠবেন? ফলটল পাড়তে?"

"না না। তখন ফল ছিল না গাছে।" ওসি মাথা নাড়লেন।

"তা হলে? আশি পেরিয়ে যাওয়া শরীর উপরে তুলে উনি কি ব্যায়াম করছিলেন? অসম্ভব।" অর্জুন লাফিয়ে ডালটাকে স্পর্শ করল।

"হুঁ। তা হলে বলছেন ওঁর ডেডবডি নিয়ে আসা হয়েছিল এখানে। কিন্তু এখানে কেন? আরও তো কত গাছ আছে যাদের ডাল নিচুতে।" ওসি চিন্তায় পড়লেন, "কিন্তু ডেডবডি নিয়ে এল কোন পথ দিয়ে? উনি মারা গিয়েছিলেন কোথায়? ক'জন লোক ডেডবডি বয়ে এনেছিল? মরে গেলে শরীরের ওজন বেড়ে যায়। মঙ্গলময়বাবুর শরীরটাকে উপরে তুলতে কতজন লেগেছিল? সব রহস্যময় মনে হচ্ছে।"

অর্জুন হেসে ফেলল, "আপনি কিন্তু এখনও প্রমাণ পাননি যে, ওঁর মৃত শরীর এখানে বহন করে আনা হয়েছিল!"

"তার মানে?"

"ধরুন ওঁকে এখানেই মেরে ফেলা হয়। তারপর ওজন বাড়ার আগেই কোনওমতে উপরে তুলে নীচে ফেলে দিয়েছে।"

"হ্যাঁ। তাই তো! এটা মাথায় আসেনি। কিন্তু কারা মারল?"

"ঠিক। কারা মারল? কেন মারল? এই দুটো প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে ধরে নিতে হবে ওঁকে মারা হয়েছে। কিন্তু আপনি এখন একটা জরুরি প্রশ্ন করেছেন।"

"কীরকম?" ওসি তাকালেন।

"এত গাছ থাকতে এই গাছ কেন? তা হলে খুনিরা রাস্তা দিয়ে এখানে আসেনি। ওরা, ধরা যাক, পাশের মাঠটা পেরিয়ে রাস্তায় উঠতেই প্রথমে এই গাছটাকে পাওয়ায় আর সময় নষ্ট করেনি। তাই অন্য গাছের কথা ওদের মাথায় আসেনি।"

অর্জুন কথাটা বলতেই ওসি চকিতে মাঠটা দেখলেন, "খারাপ বলেননি, চলুন তো, মাঠটাকে ভাল করে দেখি। অবশ্য এত বড় মাঠ তবে ফসল তোলার পর তো কেউ মাঠে পা দেয়নি।" ওসি মাঠের দিকে পা বাড়ালেন।

লোকটি খারাপ ধরনের নন। জটিলতা নেই বললেই হয়। এখন যেভাবে ঝুঁকে ঝুঁকে মাঠের ঘাস দেখছেন তাতে বোঝা যায় নিজের তৈরি আত্মহত্যার থিয়োরিটা নিজেই এখন বিশ্বাস করছেন না। অর্জুন ওঁর পাশে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, শ্মশানটা কোথায়?"

"মাইল তিনেক দূরে, নদীর ধারে। কেন?"

"সেখানেই তো মঙ্গলময়বাবুর শেষকৃত্য হয়েছিল?"

মাথা নাড়লেন ওসি, "হ্যাঁ। শহরে পোস্টমর্টেম করিয়ে আবার বডি আনানো হয়েছিল। গ্রামের লোকজন কেউ বড় একটা যায়নি। সেনবাড়ির কাজের লোকরাই গিয়েছিল।"

মাঠের ভিতর সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া গেল না। অর্জুন মাঠ পেরিয়ে এদিকের জঙ্গুলে এলাকায় চলে এল। তখনই খুব বিরক্ত হয়ে একটি কালো সাপ শুকনো পাতায় শব্দ তুলে ঝোপের মধ্যে ঢুকে গেল।

খানিকটা এগোতেই অর্জুনের চোখ গেল যার উপর সেটা যে একটা রবারের জুতো তা বুঝতে খানিকটা সময় লাগল। ওসি এগোলেন আগে। সাপের কারণেই তাঁর হাতে এখন রিভলভার। জুতো ঠুকে রবারের জুতোটাকে সোজা করলেন। তারপর বললেন, "বহুৎ পুরনো জুতো। একপাটি। কার, কে জানে!"

"আচ্ছা, মঙ্গলময়বাবুর শরীর যখন পেয়েছিলেন তখন ওঁর পায়ে জুতো ছিল?"

অর্জুনের প্রশ্নে কপালে ভাঁজ পড়ল ওসির, "মনে করতে পারছি না। সম্ভবত না। কারণ গোড়ালি যে ভাঙা ছিল তা দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম। জুতো থাকলে তো সেটা চোখে পড়ত।" বলেই সজাগ হলেন ওসি, "এটা কি ওঁর একপাটি জুতো?"

"জানি না। উনি কী ধরনের জুতো পরতেন আমি দেখিনি। তা ছাড়া লোকে এক পায়ে জুতো পরে বাড়ি থেকে বের হয় না। দ্বিতীয় জুতোটা কোথায়?" অর্জুন চারপাশে তাকাল।

রবারের জুতোটা তুলে নিয়ে ওসি বললেন, "ওরা যখন মৃতদেহ বহন

pathagar.net

করে নিয়ে যাচ্ছিল তখন পা থেকে খসে পড়তে পারে। তা হলে দ্বিতীয়টাও কাছেপিঠে আছে।"

"যদি এটা মঙ্গলময়বাবুর জুতো হয়, তবেই।"

"না-ও হতে পারে বলছেন?" ওসি বিভ্রান্ত।

মাথা নাড়ল অর্জুন। ওসি বললেন, "দুর! ভাবলাম শেষপর্যন্ত একটা ক্লু পাওয়া গেল, আপনি আবার গোলমাল করে দিচ্ছেন।"

দ্বিতীয় জুতোটাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। কিন্তু খুঁজতে খুঁজতে ওরা রাস্তায় চলে এল। সুনসান রাস্তা। ওসি বললেন, "জিপটাকে মাঠের মধ্যে দিয়ে এদিকে নিয়ে আসতে বলি, নইলে ফেরার সময় অনেকটা হাঁটতে হবে।" তিনি চলে গেলেন মাঠের দিকে, ড্রাইভারকে নির্দেশ দিতে।

মিনিটদুয়েক যাওয়ার পর রাস্তাটা একটু বাঁক নিতেই জায়গাটাকে চিনতে পারল অর্জুন। সেই বেলগাছ। ভূতেদের সংলাপ অনুযায়ী যে গাছে এখন রাগি তান্ত্রিক এবং ভৈরবী বিশ্রাম নিচ্ছেন। যে গাছের কাছাকাছি ঝোপের মধ্যে সে রহস্যময় তাবিজটাকে কুড়িয়ে পেয়েছিল। অর্জুন গতকাল যেখানে বসেছিল আজও সেখানে বসল। তাবিজটাকে যখন এখানেই ওঁর শরীর থেকে ছিঁড়ে ছুড়ে ফেলা হয়েছিল তখন মঙ্গলময়বাবুকে এখানেই প্রাণ দিতে হয়েছে। কিন্তু মারার পর ওরা কষ্ট করে মাঠ পেরিয়ে ওই অত দূরের রাস্তায় নিয়ে গেল কেন? এখানেই তো ফেলে রাখতে পারত। পুরো ব্যাপারটা কীরকম গোলমেলে। এইসময় জিপের শব্দ কানে এল। তারপরেই ওসির চিৎকার, "উঠে আসুন, বসবেন না ওখানে।"

"কেন?" অর্জুন অবাক হল।

"সাপখোপ থাকতে পারে তো! কাছে আসুন, বলছি।" ওসি হাত নাড়লেন।

অর্জুন উঠে পড়ল। জিপের কাছে যেতেই ওসি বললেন, "জিপে উঠুন।"

"কেন?"

"আপনি তো বাইরের লোক, তাই জানেন না। গ্রামের মানুষ বিশ্বাস করে, এখানে, এই বেলগাছে সাধুসন্ন্যাসীদের আত্মা এসে কিছুদিন থাকেন।"

"মানে, ভূতপ্রেত?"

"দুর! পুলিশের ওসি হয়ে ভূতপ্রেতের কথা বলতে পারি? চাকরি থাকবে কি? গ্রামের মানুষেরা বিশ্বাস করে বলে এদিকে কেউ আসে না।" ওসি বললেন, "উঠুন।"

pathagar.net

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "বেলগাছটা যদিও ছোট নয়, তবু অনেক সাধুসন্ন্যাসীর আত্মা যদি একসঙ্গে চলে আসেন তা হলে সমস্যা হয় না?"

"আমি অত কথা জানি না। এখানে কোনও কুম্ভমেলা হয় না যে, প্রচুর সাধুর আত্মা একসঙ্গে চলে আসবেন। আমরা মশাই জলের মতো, যে পাত্রে রাখবেন সেই পাত্রের চেহারা নেব। এখানকার মানুষ এসবে বিশ্বাস করে, তাই আমরাও মুখে বলি। আবার কোনও জায়গায় গিয়ে যদি দেখি কেউ ভূতপ্রেতে বিশ্বাস করে না, তখন তাদের মতো করেই বলব।" চোখ বন্ধ করলেন ওসি।

"আপনি এগোন, আমি একটু এখানে থাকব।" অর্জুন বলল।

"কেন?"

"খুঁজব। আমার বিশ্বাস, দ্বিতীয় জুতোর পাটিটাকে এখানেই পাওয়া যাবে।"

"তা হলে তো আমাকেও থাকতে হয়। এই বেলগাছ থেকে ওই মহাবটবৃক্ষ পর্যন্ত রাস্তাটা মোটেই ভাল নয়।"

"গ্রামের মানুষ মনে করেন মারা যাওয়ার পর এখানকার আত্মারা কিছুদিন মহাবটবৃক্ষে অপেক্ষা করেন পরবর্তী আদেশের জন্যে।" অর্জুন বলল।

"আরে! আপনি তো সব খবর রাখেন।"

"তা হলে মহাবটবৃক্ষের কাছে গিয়ে আবেদন করলে মঙ্গলময়বাবুর আত্মা উপর থেকে নেমে এসে বলে দিতে পারেন কে বা কারা তাঁকে হত্যা করেছে!"

"এবার আপনি ইয়ারকি করছেন।" ওসি নেমে এলেন জিপ থেকে।

দ্বিতীয় জুতোটাকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

থানায় পৌঁছে ওসি বলেছিলেন, "যদি কোনও সাহায্যের প্রয়োজন হয় নিঃসংকোচে জানাবেন। আমি বিকেলের দিকে একবার সেনবাড়িতে গিয়ে দেখা করেও আসতে পারি। আপনাদের মতো মানুষের সঙ্গে গল্প করলে অনেক কিছু শেখা যায়।"

"অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু ওই একপাটি জুতো যে মঙ্গলময়বাবুর, তা যাচাই করা দরকার।"

pathagar.net

"সেইজন্যেই তো বিকেলে সেনবাড়িতে যাওয়ার কথা বললাম। আফটার অল জুতোটা এখন সরকারি সম্পত্তি। খুনের তদন্তে কাজে আসতে পারে। ওটার জন্যে তো আমাকেই যেতে হবে।" ওসি হাসলেন।

অর্জুনের মনে হল, উনি বলতে চাইছেন, জুতোটা তাকে নিয়ে যেতে দেবেন না। তাই হোক। যাচাই করলেই হল।

সূর্য মাথার উপর এখন। সেনবাড়ির ড্রাইভার একমনে গাড়ি চালাচ্ছেন। অর্জুন বলল, "আমরা সরাসরি বাড়ি ফিরছি না। আপনি নিশ্চয়ই মহাবটবৃক্ষ চেনেন?"

বৃদ্ধ ড্রাইভার তাকালেন অর্জুনের দিকে, মাথা নাড়লেন।

"ওই রাস্তায় একবার চলুন তো।"

গাড়ি চলল। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনি তো অনেক বছর সেনবাড়িতে কাজ করছেন!"

"হ্যাঁ। অনেক বছর। এর মধ্যে কত গাড়ির বদল হল। আগে ভারী ভারী গাড়ি ছিল। এখন তো পাখির মতো হালকা।" রাস্তায় নজর রেখে কথা বললেন ড্রাইভার।

"কাল রাত্রে আপনি গাড়ি বের করেছিলেন?"

"হ্যাঁ। মা জননীকে সদরে নিয়ে যেতে হয়েছিল।"

একটু অবাক হল অর্জুন। তার পরেই মনে হল, এ তো স্বাভাবিক ব্যাপার। যে-কোনও কারণে মা জননী সদরে যেতেই পারেন।"

"ফিরতে রাত হয়েছিল?"

"না। ডাক্তারের সঙ্গে আগেই কথা হয়ে থাকে। যাওয়ামাত্র দেখে ছেড়ে দেন।"

"প্রায়ই যান?"

"মাসে একবার।"

"দেখে তো মনে হয় না উনি অসুস্থ!"

"অসুখ না থাকলে কি কেউ শখ করে ডাক্তারের কাছে যায়!"

"তা হলে গত রাত্রে আপনি সেনবাড়িতেই থেকে গিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ।"

"মঙ্গলময়বাবুর সঙ্গে মা জননীর কীরকম সম্পর্ক ছিল?"

"কর্মচারীর সঙ্গে মালিকের যেরকম সম্পর্ক থাকে।"

"কখনও মা জননী তাঁকে বকাঝকা করতেন?"

Pathagar.net

"আমার গাড়িতে বসে কখনও করেননি।"

"আচ্ছা, গ্রামের মানুষের সঙ্গে সেনবাড়ির সম্পর্ক কীরকম?"

"প্রয়োজনের। যে-কোনও প্রয়োজনে চাঁদা নিতে হলে ওরা আসে, নিয়ে যায়।"

"নিত্য যাওয়া-আসা নেই?"

"কার কাছে আসবে? সম্পর্ক হয় সমানে সমানে, মা জননী তো ওদের চেয়ে অনেক উপরে। এই যে আমি এখানে চাকরি করি বলে গ্রামের লোক আমাকেই এড়িয়ে চলে। বড়লোকের উপর রাগ বলে বড়লোকের কর্মচারীকেও পছন্দ করে না। অথচ চাঁদা নেওয়ার সময় হাতের পাতা প্রতিবার বড় করছে, তার বেলায় লজ্জা নেই। এই যে, এসে গিয়েছি।" বৃদ্ধ ড্রাইভার গাড়ির গতি কমালেন।

অর্জুন দূর থেকেই মহাবটবৃক্ষকে দেখতে পেল। যেন আকাশ আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে। ড্রাইভার বললেন, "জায়গাটা ভাল নয় বাবু।"

"ভূতপ্রেতেরা থাকেন এখানে?" অর্জুন ইশারা করল গাড়ি থামাতে।

ড্রাইভার কিছু না বলে যেদিকে গাছ তার উলটোদিকে গাড়ি দাঁড় করালেন। দরজা খুলে অর্জুন নেমে এল। একেবারে গাছের নীচে চলে এসে উপরে তাকাতে সে আকাশ দেখতে পেল না। কিন্তু গাছটা তাকে টানছিল। কেবলই মনে হচ্ছিল, এই গাছ খুব রহস্যময়। সে ঘড়ি দেখল। নাঃ, গজেনদাদুর প্রাত্যহিক ভ্রমণ অনেক আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে।

এবং তখনই চোখে পড়ল ওর। একটা ঝোপের পাশে গজেনদাদু পাথরের মূর্তির মতো বসে আছেন। তাঁর লাঠি একপাশে পড়ে আছে। মাথা সামনে ঝুঁকেছে। সে দৌড়ে কাছে যেতে বুঝতে পারল বৃদ্ধ মারা যাননি। ওঁর বাঁ হাত সামান্য নড়ল। অর্জুন পাশে বসে নিচুগলায় ডাকল, "দাদু, কী হয়েছে আপনার?"

গজেনদাদু চোখ তুললেন। ঘোলা দৃষ্টি। চোখ লাল।

"আমি অর্জুন। গতকাল আলাপ হয়েছিল।"

"তাই! ভাল কথা।" বিড়বিড় করলেন বৃদ্ধ।

"আপনার কি শরীর খারাপ লাগছে?"

বৃদ্ধ একটু চুপ করে থাকলেন, তারপর মাথা নেড়ে না বললেন।

"আপনি উঠে দাঁড়াতে পারবেন?"

"শরীরের সব শক্তি উপরে চলে গেল হুস করে।" আঙুল তুলে

pathagar.net

গাছটাকে দেখালেন বৃদ্ধ। কথাগুলো বলছিলেন ফিসফিসিয়ে, খুব কষ্ট করে।

ইতিমধ্যে ড্রাইভার চলে এসেছেন সেখানে। এসেই চেঁচিয়ে উঠলেন, "সর্বনাশ। এ যে গজেনবুড়ো। হয়ে গেল, বুড়োর হয়ে গেল!"

অর্জুন ধমকাল, "চুপ করুন। কিছুই হয়নি। গাড়িটাকে এখানে নিয়ে আসুন, ওঁকে ওঁর বাড়িতে পৌঁছে দিতে হবে।"

"কেন ওঁকে কষ্ট দেবেন! মরে যাওয়ার পর ওঁর আত্মাকে তো ওই গাছেই আসতে হবে।" ড্রাইভার বলতে বলতে গাছের দিকে তাকালেন।

গজেনদাদু হাসলেন, "কী মজা! ওরা বলল আমি নাকি সব জানি। এতদিন যখন বেঁচে আছি তখন কি আর জানি না! আমি বললাম এই গাছটাকে প্রথম দেখি ল্যাংটা বয়সে। তা হলে গাছটা আমার থেকে বেশি জানে, ওকেই শুধোও।"

"কী শুধোবে?"

"তার আমি কী জানি। আদার ব্যাপারী জাহাজের খবর রাখব কী করে? সেনদের খবর সেনেরা জানে। আমরা তো ওদের প্রজা।"

গাড়ি নিয়ে এলেন ড্রাইভার। ধরাধরি করে গজেনদাদুকে তোলা হল পিছনের সিটে। তোলামাত্র শুয়ে পড়লেন তিনি।

"বুড়োর সময় হয়ে গিয়েছে বাবু। মুখে জল দেওয়া দরকার।"

অর্জুন কথা বলল না। কিছুটা ঘোরাঘুরি করে ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে যেতে পারল গজেনদাদুর বাড়ির কাছে। শোনামাত্র লোকজন ছুটে এল। ধরাধরি করে নামাল গাড়ি থেকে। অর্জুন তাঁদের মধ্যে যিনি বয়স্ক তাঁকে জিজ্ঞেস করল, "আপনারা যদি ওঁকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে চান তা হলে এই গাড়িতে নিয়ে যেতে পারেন।"

বয়স্ক মানুষটি বললেন, "কী হবে! যা বয়স তাতে কি আর ওষুধ কাজে লাগবে? তা ছাড়া দু'দিন আগে থেকেই উনি মরার জন্যে তৈরি হয়ে আছেন।"

"সে কী? কালও তো ওঁর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে!"

"গতকাল ওঁর শরীর যে কী করে মহাবটবৃক্ষের কাছে গেল, তা উনিই জানেন। আজ আমরা যেতে দিতে চাইনি, জোর করে গেছেন। ওই দিনদু'য়েক আগে রবারের জুতোটা নিয়ে আসার পর থেকেই মৃত্যু ওঁকে টানছে।"

"রবারের জুতো?" অর্জুন চমকে উঠল।

pathagar.net

"হ্যাঁ। একপাটি পুরনো রবারের জুতো। মহাবটবৃক্ষ থেকে ফেরার সময় হাতে করে নিয়ে এসেছিলেন। আজ সকালে বিড়বিড় করেছেন, এই জুতো পায়ে ফুড়ুত করে উড়ে যাব। কার জুতো জিজ্ঞেস করলে হেসেছেন, 'যে যায় তার'।"

ঘরের দাওয়ায় শোওয়ানো হয়েছে গজেনবুড়োকে। তাঁর বুক উঠছে নামছে। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "জুতোটা দেখতে পারি?"

বয়স্ক লোকটি একটি কিশোরকে বলতে সে ছুটে নিয়ে এল ভিতর থেকে। চিনতে অসুবিধে হল না অর্জুনের। সকালে যেটা পাওয়া গিয়েছিল, এটি তারই জোড়া। এদিকে তখন সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে পুরোহিত ডাকবে না কবিরাজকে ডেকে আনবে তার মীমাংসা করতে। অর্জুন জুতোটা নিয়ে গাড়িতে উঠল। গজেনদাদু কোথায় কেমন করে এই একপাটি জুতো পেয়েছিলেন তা জানতে পারলে কাজ হত। কিন্তু এখন আর কথা বলার অবস্থায় নেই বৃদ্ধ, বলতে পারলেও স্মৃতি ওঁকে বিন্দুমাত্র সাহায্য করবে না।

বাড়ি ফিরতে দুপুর প্রায় শেষ। স্নান-খাওয়া শেষ করে অর্জুন কাজের লোকটিকে বলে লাইব্রেরি ঘরের দরজা খুলিয়ে ভিতরে ঢুকল। নির্মলের সঙ্গে বাড়িতে ফেরার পর আর দেখা হয়নি। এম. স্কটের লেখা 'ডেজ় আফটার হি ফ্লেড' বইটি সে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। কৌতূহল হতে সে খাতা খুলল। বইটির নামের আদ্যক্ষর যখন ডি তখন সেই পাতা খুলে নজর বোলাতে লাগল। আঠারোটা বই রয়েছে যার নাম ডি দিয়ে শুরু, কিন্তু তাদের মধ্যে এই বইটির নাম নেই। তা হলে বইটি মঙ্গলময়বাবু পেলেন কোথায়? ১৯০৩ সালে লন্ডনে ছাপা এই বই নিশ্চয়ই এখনকার দোকানে কিনতে পাওয়া যাবে না। সেনবংশের খবরাখবর যে বইটিতে লেখা হয়েছে সেটির তো লাইব্রেরিতেই থাকার কথা। এ, এইচ, এফ অক্ষর দিয়ে শুরু যে সব বইয়ের নাম খাতায় রয়েছে সেগুলো যাচাই করে দেখে অর্জুন সন্তুষ্ট হল, এটি লাইব্রেরির সম্পত্তি নয়। মঙ্গলময়বাবু নিজস্ব সূত্রে জোগাড় করেছিলেন।

সে বইটি পড়া শুরু করল। প্রায় ঐতিহাসিক উপন্যাসের মতো টানটান গল্প, যার বাস্তবতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। লক্ষ্মণ সেন পালিয়ে গিয়েছিলেন বিপুল সম্পত্তি নিয়ে। সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী, সন্তানেরা এবং

এক অনুগত ভাই। কিন্তু তাঁর অন্য দুই ভাই দাদার অনুগামী হননি। তাঁরা বিচ্ছিন্নভাবে লুকিয়ে পড়েছিলেন বঙ্গভূমিতেই। স্কটসাহেব বিভিন্ন সূত্র থেকে বল্লাল সেন-লক্ষ্মণ সেনের ধনরত্নের একটা হিসেব সংগ্রহ করেছেন। লক্ষ্মণ সেন যা নেওয়ার নিয়ে যাওয়ার পরেও বাকি দুই ভাই যা হাতিয়ে লুকোতে পেরেছিলেন তার পরিমাণ কম নয়। শুধু হিরেই ছিল ১৯০৩ সালের হিসেবে পঞ্চাশ কোটি টাকার সমান। স্কটসাহেব বলতে পারছেন না এই ধনরত্ন দুই ভাই সমানভাবে ভাগ করে নিয়েছিলেন কি না। কিন্তু ওই দু'জনের একজন প্রতিবন্ধী ছিলেন এবং বিয়ে করেননি। কীভাবে দাদার চলে যাওয়ার পর ওঁরা আত্মগোপন করেছিলেন তার বর্ণনা বইটিতে রয়েছে। সেই সঙ্গে লক্ষ্মণ সেনের পালিয়ে যাওয়ার বিবরণও দিয়েছেন লেখক।

এই সেনবাড়ির পূর্বপুরুষ কে ছিলেন? কোন ভাই? ওই বিবাহিত জন না প্রতিবন্ধী যিনি পরে বিয়ে করে সংসারী হতে পারেন। যিনিই হোন, তিনি কি এই বাড়িতে ধনসম্পত্তি লুকিয়ে রেখেছেন? অসম্ভব। সেটা ছিল প্রায় এগারোশো বছর আগের ঘটনা। এই বাড়ি তখন কোথায়? অবশ্য এই বাড়ি তৈরির আগে সেনেরা যেখানেই থাকুন না কেন, বাবা তাঁর ছেলেকে, ছেলে তাঁর ছেলেকে, এইভাবে গোপন রত্নভাণ্ডারের হদিস দিয়ে যেতেই পারেন। এবং শেষপর্যন্ত যখন এই বাড়ি তৈরি হল, যিনি তৈরি করালেন তিনি সেই ধনসম্পত্তি এ বাড়িতে এনে রাখতেই পারেন। অর্জুন মাথা নাড়ল। একটার পর একটা কল্পনা জুড়ে যা তৈরি হচ্ছে তার সঙ্গে বাস্তবের কোনও মিল না থাকাটাই স্বাভাবিক। অমল সোম, তার গুরু, বলেছিলেন, যা চোখে দেখবে না, কানে শুনবে, তাকে বিশ্লেষণ করবে। মনে রেখো, দশতলার উপর থেকে একটা পাথর নীচে ফেললে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সেটাকে মাটির ঠিক এক জায়গায় প্রত্যেকবার ফেলবে না। পাথরটাকে ফেলার ধরন অথবা বাতাসের গতির হেরফেরে ওর পড়ার জায়গাটা বদলে যাওয়াই স্বাভাবিক। অতএব আগে থেকেই সিদ্ধান্ত পৌঁছে গেলে তোমার মতো বোকা আর কাউকে পাবে না।

কাজের লোকটি দরজায় দাঁড়াল, "বাবু।"

অর্জুন তাকাল। লোকটি বলল, "দারোগাবাবু এসেছেন। আপনাকে ডাকছেন।"

অর্জুন বাইরে তাকাল। ইতিমধ্যে কখন বিকেল হয়ে গিয়েছে টের পায়নি

pathagar.net

সে। বইটি টেবিলের উপর রেখে সে দরজা বন্ধ করতে বলে বাইরে চলে এল। গাড়িবারান্দার কাছে জিপের পাশে হেলান দিয়ে ওসি নির্মলের সঙ্গে কথা বলছেন হেসে হেসে। অর্জুনকে দেখে উঁচু গলায় বললেন, "শুনলাম পড়াশোনা করছিলেন! আমি মশাই আজকাল খবরের কাগজ পড়ারও সময় পাই না। তা আমাকে ছেড়ে কোথায় ঘুরে বেড়ালেন?"

"খবরটা পেয়ে গেছেন?"

"বাঃ। ঘুমঘুম কি বড় গ্রাম! এখন আপনার খুব প্রশংসা হয়েছে। লোকে বলছে আপনি মহাবটবৃক্ষের নীচ থেকে গজেনবুড়োকে তুলে না আনলে এতক্ষণে ভূত হয়ে ওর ডালে ঝুলে পড়তেন। যাক গে, আবার ওই অঞ্চলে গেলেন কেন?"

"গ্রামটাকে ভাল করে দেখতে।" অর্জুন হাসল।

"কিছু চেপে যাচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে। তবে একটা অনুরোধ, নিজে অপরাধীকে ধরতে যাবেন না। আগে থেকে খবর দিয়ে আমাকে ডেকে আনবেন।"

"মনে থাকবে।"

ওসি এবার নির্মলের দিকে তাকালেন। হাত বাড়িয়ে জিপের ভিতর থেকে একপাটি রবারের জুতো তুলে নিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "চেনা বলে মনে হচ্ছে?"

নির্মল অবাক হয়ে তাকাল, তারপর মাথা নেড়ে না বলল।

"যাচ্চলে! এ বাড়ির কেউ জুতোটা পরতেন?" ওসি চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন।

"আমি, মানে, ঠিক বুঝতে পারছি না।" নির্মল বিব্রত।

ওসি নির্মলের দিকে তাকালেন, "কী বুঝছেন। চাকরবাকরদের ডেকে ভেরিফাই করাবার দরকার আছে? ছাই ওড়ালেই যে সোনা পাওয়া যাবে তা সবসময় ঘটে না। কার না কার জুতো!"

"দাঁড়ান।" অর্জুন সোজা হেঁটে গেল আউট হাউসের দরজায়। ভিতরে ঢুকে জুতোর অন্য পাটি নিয়ে বেরিয়ে এসে বলল, "ওটা দিন তো।" তারপর দুটোকে পাশাপাশি মাটির উপর রাখল, "এবার কিছু মনে আসছে নির্মল?"

"হ্যাঁ। এই জুতো মঙ্গলময়বাবুর পায়ে দেখেছি।" নির্মল মাথা নাড়ল।

"আরে!" ওসি বিরক্ত হলেন, "এইমাত্র আপনি যে বললেন, ঠিক বুঝতে পারছেন না!"

"হ্যাঁ। একটা জুতোয় বুঝতে পারিনি। পাশাপাশি রাখার পরেই মনে হল। মঙ্গলময়বাবু যখন দাঁড়াতেন তখন ওইভাবে তাঁর পায়ে জুতো থাকত।" নির্মল বলল।

হঠাৎ খেয়াল হল ওসির, "কিন্তু, আমরা তো মাঠ চষে এক পায়ের জুতো পেয়েছিলাম। অন্যটা কোত্থেকে এল? বাড়িতে ছিল নাকি?"

অর্জুন হাসল, "বাড়িতে থাকলে ধরে নিতে হবে ভদ্রলোক এক পায়ে জুতো পরে হাঁটতে বেরিয়েছিলেন। দ্বিতীয় জুতোটা ছিল মহাবটবৃক্ষের কাছে।"

"সে কী! আধমাইলের ব্যবধানে ভদ্রলোক জুতো ফেলেছিলেন নাকি।"

"সেটা কি সম্ভব? ওঁর পা থেকে খুলে পড়েছিল। যারা ওঁকে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল তারা টের পায়নি।" অর্জুন গম্ভীর গলায় বলল।

"কারা নিয়ে গিয়েছিল?" ওসি পুলিশি গলায় জেরা করলেন।

অর্জুন হেসে ফেলল, "সেটা যদি জানা যেত তা হলে আপনার কাজ বেড়ে যেত।"

"মানে?"

"একজন মানুষের পক্ষে এই কাজ করা সম্ভব নয়। অন্ততপক্ষে দু'জন ছিল। ওরা কারা জানার পর ধরে ফেলার কাজটা তো আপনার।" অর্জুন বলল।

"দুর! আমি তো কোনও সূত্রই পাচ্ছি না। এই ঘুমঘুম গ্রামের মানুষদের কেউ যে এত প্ল্যান করে খুন করতে পারে তা আমি ভাবতেই পারছি না। গ্রামের নামের সঙ্গে এদের স্বভাবের কোনও পার্থক্য নেই।" ওসি বললেন।

নির্মল নিচুগলায় বলল, "বাইরের লোকের সঙ্গে তো ওঁর যোগাযোগ ছিল না। তা ছাড়া কেউ কাউকে খুন করে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। মঙ্গলময়বাবু কারও সাতেপাঁচে থাকতেন না। তা হলে উনি খুন হলেন কেন!"

অর্জুন নির্মলের মুখের দিকে তাকাল। খুব সরল প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তরটা কিন্তু খুব কঠিন। সে কিছু বলার আগে ওসি বললেন, "আজ সকাল পর্যন্ত আমি জানতাম ওঁর মৃত্যু দুর্ঘটনার জন্যে হয়েছে। অর্জুনবাবুর সঙ্গে কথা বলার পর ধারণাটা বদলাল। উনি খুন হয়েছেন তার দুটো কারণ, উনি কাউকে চটিয়েছিলেন, তারা যা করতে বলেছিল করেননি। না করে যদি বেঁচে থাকতেন তা হলে যারা প্রস্তাব দিয়েছিল তারা বিপদে পড়ত। তাই

সরিয়ে দিয়েছে ওঁকে। অথবা মঙ্গলময়বাবু কারও পথের কাঁটা হয়েছিলেন। কী, ঠিক বলছি কিনা?" অর্জুনের দিকে তাকিয়ে হাসলেন ওসি।

"আপনার অভিজ্ঞতা আমার চেয়ে অনেক বেশি।" অর্জুন আকাশের দিকে তাকাল।

ওসি বললেন, "তা হলে প্রমাণিত হল ওই জুতো মঙ্গলময়বাবুর। গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় ওগুলো পাওয়া গিয়েছে। মামলা হলে লাগবে, অতএব জুতো আমি নিয়ে যাচ্ছি।"

"কোনদিকে যাচ্ছেন?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"থানায়।"

"জরুরি কোনও কাজ আছে?"

"না। বলেছি আপনাকে। আমার এলাকা একেবারে ট্রাব্‌ল-ফ্রি।"

"চলুন তা হলে, একবার দক্ষিণপাড়া থেকে ঘুরে আসি।"

নির্মলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অর্জুন ওসির পাশে উঠে বসতেই জিপ রওনা হল। বিকেলবেলায় চায়ের দোকানের আড্ডা ভাল জমেছে। লোকগুলো পুলিশের জিপ দেখে যতটা অবাক হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি হয়েছে অর্জুনকে ওই জিপে বসে থাকতে দেখে।

ওসি জিজ্ঞেস করলেন, "দক্ষিণপাড়ায় কার কাছে যাবেন?"

"গজেনদাদুর বাড়িতে।"

"কেন?"

"আমার অনুমান, উনি আততায়ীদের দেখেছেন।"

"গজেনদাদু? আততায়ী? কী বলছেন আপনি? উনি তো ভাল করে হাঁটতেই পারেন না। আমি অবশ্য ওঁর বয়সে পৌঁছোবার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারি না। গজেনদাদুর সঙ্গে খুনিদের যোগাযোগ আছে এ আমি বিশ্বাস করতে পারব না।" ওসি কথাগুলো বলে জোরে জোরে মাথা নাড়তে লাগলেন।

"আমি বলিনি যোগাযোগ আছে। আমি অনুমান করছি, উনি ওদের দেখেছেন। আমার অনুমান ভুল হতে পারে। গিয়ে কথা বললে বোঝা যাবে।"

দূর থেকেই দেখা গেল বাড়ির সামনে বেশ ভিড়। কিছু লোক উত্তেজিত হয়ে কথা বলছে। পুলিশের জিপ দেখে কয়েকজন ছুটে এল। ওসি গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে? চেঁচামেচি কীসের?"

Pathagar.net

এইসময় ভিড় ঠেলে যে লোকটি সামনে এল তাকে অর্জুন দুপুরে দেখেছে। গজেনদাদুর ছেলে। হাতজোড় করে বলল, "আমার বাবা নেই!"

অর্জুন চমকে উঠল, "সে কী! আপনারা ডাক্তারকে ডাকেননি?"

"না। আপনি তখন বাবাকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। ওঁকে বারান্দায় শুইয়ে দেওয়া হয়েছিল। একটু একটু করে জ্ঞানও ফিরে এল। খেতে চাইলেন, দু'মুঠো ভাতও খাইয়ে দেওয়া হল। তারপর ঘুমোলেন। শান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছেন দেখে আমরা এদিক থেকে সরে গিয়েছিলাম যাতে ওঁর ঘুমের অসুবিধে না হয়। এই একটু আগে উনি কেমন আছেন দেখতে এসে বুঝলাম প্রাণ চলে গেছে। কিন্তু ভগবান ওঁর প্রাণ নেননি।"

ওসি অবাক হলেন, "তার মানে?"

ওঁর মাথার পাশ দিয়ে রক্ত বেরিয়েছিল। একটা সরু পাথর সেখানে বিঁধে আছে। দূর থেকে গুলতি ছুড়েছে কেউ।" বলতে বলতে লোকটি কেঁদে ফেলল।

ওসি ঘটনাস্থলে যেতে অর্জুন সঙ্গী হল। গজেনদাদু চিত হয়ে শুয়ে আছেন। রক্ত তাঁর কানের কাছ থেকে বেরিয়ে মাটিতে পড়েছে। চোখ বন্ধ, মুখ হাঁ করা। ওসি ক্ষতস্থান ভাল করে দেখে বললেন, এক ইঞ্চি সরু সুচলো পাথর! হুম। শুনুন, আপনারা বুঝতে পারছেন এই বৃদ্ধ মানুষটিকে হত্যা করা হয়েছে। এই কাজ যে করতে পারে বলে আপনাদের সন্দেহ হয় তার নাম নিঃসংকোচে আমাকে জানাতে পারেন। এরকম প্রকাশ্যে যদি না জানাতে চান, তা হলে কালকের মধ্যে থানায় জানাবেন। আর এই মৃতদেহে কেউ হাত দেবেন না। যেহেতু এটা স্বাভাবিক মৃত্যু নয় তাই ওঁর মৃতদেহ মালদায় পাঠাতে হবে পোস্টমর্টেমের জন্যে। সেই কাজ শেষ করে কাল বিকেলের মধ্যে যাতে সৎকারের জন্যে দেহ পান আমি তার চেষ্টা করব।"

জনতা যখন ওসির কথা শুনছে অর্জুন তখন ভিড় থেকে সরে এসে চারপাশে তাকাল। আশেপাশে বাড়িঘর। শুধু দুটো বড় আমগাছ রয়েছে পাশাপাশি। বৃদ্ধ যেখানে শুয়ে ছিলেন সেখানটা সহজেই ওই গাছদুটো থেকে গুলতির আওতায় আনা যায়। হত্যাকারী যে ওই গাছে উঠেছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এখন প্রশ্ন হল, বাইরে থেকে এসে কোনও উটকো লোক যদি ওই আমগাছে ওঠে, তা হলে কি পাড়ার লোকজনের চোখে পড়বে না! এরকম ঝুঁকি কি কোনও আততায়ী নেবে? অসম্ভব। গুলতি দিয়ে পাখি শিকার করে অল্পবয়সিরা। তাদের কেউ গজেনবুড়োকে

খুন করতে চাইবে কেন? তা হলে এই দক্ষিণপাড়ার কেউ, যে গাছে উঠলে কারও সন্দেহ আসবে না, তার পক্ষেই কাজটা করা সম্ভব।

ওসি অর্জুনের কাছে আসতেই তাঁকে ব্যাপারটা জানাল সে। সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক উপস্থিত জনতার দিকে তাকিয়ে উঁচু গলায় প্রশ্ন করলেন, "আজ দুপুরের পর আপনারা কি কাউকে ওই গাছে উঠতে দেখেছেন?"

কোনও জবাব এল না।

ওসি বললেন, "এইভাবে হবে না। প্রত্যেককে আলাদা করে জেরা করতে হবে। কিন্তু সন্ধে হয়ে এল। মালদায় খবর পাঠিয়ে গাড়ি আনাতে হবে। আমার এখনই থানায় যাওয়া দরকার। চলুন, আপনাকে সেনবাড়ির কাছাকাছি নামিয়ে দিচ্ছি।"

অর্জুন জনতার দিকে তাকাল। তারপর ইচ্ছে করেই জোরে জোরে বলল, "খুব খারাপ লাগছে। গজেনদাদু গতকালই আমাকে বলেছিলেন তিনি খুন হয়ে যেতে পারেন। আজ দুপুরে যখন ওঁকে মহাবটবৃক্ষের নীচে পেলাম তখনও ওঁর জ্ঞান ছিল। কিছু কথা বলেছিলেন জড়ানো গলায়।"

"কী কথা?" ওসি জিজ্ঞেস করলেন।

অর্জুন তাকাল, "সেই কথাগুলো আপনাকে ওঁর পোস্টমর্টেম হয়ে যাওয়ার পর বলব। চলুন।"

মৃতদেহ নিয়ে শেষবার নির্দেশ দিয়ে ওসি অর্জুনের সঙ্গে জিপে উঠলেন। গাড়ি চলতে শুরু করলে ওসি বললেন, "বেশ শান্তিতে ছিলাম মশাই, আপনি আসামাত্র ঘুমঘুম অশান্ত হয়ে উঠল।"

"আমি দুঃখিত।" অর্জুন বলল, "তবে ঘটনাটা ঘটতই।"

"হুম। কিন্তু কী কথা বুড়ো আপনাকে আজ বলেছিল, যা পোস্টমর্টেম না হওয়া পর্যন্ত আপনি বলতে চাইছেন না!"

অর্জুন হাসল, "আমি যখন ওঁকে পেয়েছিলাম তখন ওঁর জ্ঞান চলে যাচ্ছিল। অন্তত একটি কথাও ভেবেচিন্তে বলার ক্ষমতায় উনি ছিলেন না তখন।"

"তা হলে একটু আগে যে বললেন।"

"শোনাবার জন্যে বললাম। হত্যাকারী যদি ওই ভিড়ে মিশে থাকে তা হলে তার কানে কথাটা যাবে। এখানে না থাকলেও শুনতে পাবে। কৌতূহলী হবে, কী কথা গজেনদাদু আমাকে বলে গেছেন তা জানবার জন্যে। এমন কোনও কথা কি হতে পারে, যা ওদের ফাঁসিয়ে দিতে পারে!" অর্জুন বলল।

pathagar.net

ওসি বললেন, "তাই বলুন, টোপ ফেললেন। আচ্ছা, বলুন তো, আততায়ী এত ঝুঁকি নিয়ে ওঁকে মারল কেন। মহাবটবৃক্ষের কাছে যখন বুড়োকে পাওয়া যাচ্ছিল তখন সেখানেই শেষ করে দেওয়াটা তো সুবিধেজনক ছিল।"

"জানি না। হয়তো গজেনদাদুর শরীরের অবস্থা দেখে ভেবেছিল মাটিতে পড়ে গেছে যখন, তখন ওখানেই মরে যাবে। হয়তো ওঁর কাছের লোক, ওরা তাই স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু হচ্ছে মনে করে খুন করতে চায়নি। পরে আর ঝুঁকি নিতে চায়নি।" অর্জুন বলল।

গজেনবুড়ো মারা গিয়েছেন, এই খবরটা সমস্ত ঘুমঘুমের লোক ইতিমধ্যে জেনে গিয়েছে। ওসির জিপ থেকে নেমে হাঁটতে হাঁটতে চায়ের দোকানের সামনে এসে অর্জুন বুঝল খদ্দেররা ওই নিয়েই আলোচনা করছে।

অর্জুন দোকানদারকে এক গ্লাস চা দিতে বললে সেই পরিচিত লোকটি উদাস গলায় বলল, "কাল আপনি যার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন আজ তিনি পৃথিবীর মায়া ছেড়ে মহাবটবৃক্ষে উঠে বসেছেন।"

"মহাবটবৃক্ষে উঠে বসেছেন এমন কোনও তথ্য জানা নেই।"

"আপনারা বাইরের লোক, বুঝবেন না। আমরা বিশ্বাস করি।" লোকটি বলল।

"কিন্তু উনি তো স্বাভাবিকভাবে যাননি, ওঁকে খুন করা হয়েছে।"

সঙ্গে সঙ্গে আর একজন বলে উঠল, "অ্যাই দেখলে! ঠিক শুনেছি। কিন্তু খবরটা এদিকে আসার আগেই আপনি পুলিশের জিপে দক্ষিণপাড়ায় গেলেন কী করে?"

"আমরা ওঁর সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলাম। সুযোগ পেলাম না।"

"খুনটুন বাজে কথা। ওই হেজে-যাওয়া বুড়োকে খুন করবে কে? কেন করবে? ওই বয়সের লোক চলে ফিরে বেড়াচ্ছে বলে গ্রামের লোক গর্ব করত।" প্রথম জন মাথা নাড়তে নাড়তে বলল।

চাওলা চায়ের গ্লাস অর্জুনের হাতে দিয়ে বলল, "তেনে ভূতপ্রেতের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল বুড়োর। অনেকের অনেক রহস্যের কথা জানত। আপনি যে বাড়িতে উঠেছেন সেই সেনবাড়ির আগের ম্যানেজারবাবু বিকেলে বেড়াতে যেতেন মহাবটবৃক্ষের দিকে। গজেনবুড়োর সঙ্গে তাঁর কথা

হত। ব্যস। গাছ থেকে পড়ে তিনি মারা গেলেন। সাপুড়ে যেমন সাপের ছোবলে মরে, ভূতপ্রেত নিয়ে যারা কারবার করে তাদেরও একই দশা হয়।"

অর্জুন কথা না বাড়িয়ে চা শেষ করে দাম দিয়ে বাড়ির পথ ধরল। হঠাৎই একটা তথ্য পাওয়া গিয়েছে। মঙ্গলময়বাবুর সঙ্গে গজেনদাদুর যোগাযোগ ছিল। কেন? কী কারণে? জমিদারের ম্যানেজারের সঙ্গে একজন প্রজার যে যোগাযোগ সেইরকম নিশ্চয়ই নয়। নির্মল কাজে যোগ দেওয়ার পর মঙ্গলময়বাবু তো সেই ভূমিকায় ছিলেন না। দুপুরে শোনা কথাগুলো মনে পড়ল, "ওরা বলল আমি নাকি সব জানি। এতদিন যখন বেঁচে আছি তখন কি আর জানি না! আদার ব্যাপারী জাহাজের খবর রাখব কী করে? সেনেদের খবর সেনেরা জানে। আমরা তো ওদের প্রজা!"

'সেনেদের খবর সেনেরা জানে।' হঠাৎ এই কথাটা কেন বলেছিলেন বৃদ্ধ? যাঁরা ওঁর কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল তারা কি সেনদের খবর জানতে চেয়েছিল? অবশ্যই। নইলে কথাগুলো বলতেন না উনি। আর যেটা জানতে চেয়েছিল সেটা বাইরের লোক জানবে না, সেনরাই জানবে। এ ব্যাপারে বৃদ্ধ কি নিশ্চিত ছিলেন? তখন তাঁর মাথা কাজ করছিল না। ভুল বকছিলেন। ওঁর কথা কি বিশ্বাসযোগ্য!

ঘরে ফেরামাত্র কাজের লোকটি এসে জিজ্ঞেস করল চা আনবে কিনা। অর্জুন মাথা নাড়ল, তারপর বলল, সে লাইব্রেরিতে যেতে চায়।

চাবি নিয়ে এসে লোকটি দরজা খুলে দিয়ে আলো জ্বেলে দিল। সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে অর্জুন দুপুরে রেখে যাওয়া বইটি খুঁজতে গিয়ে অবাক হল। বই নেই।

অর্জুনের স্পষ্ট মনে আছে সে কোথায় বইটি রেখে গিয়েছিল। বই নেই মানে এই ঘরে কেউ ঢুকেছিল, যে বই চুরি করেছে। অর্জুন দরজার সামনে গিয়ে কাজের লোকটিকে ডাকল। সে কাছে আসতেই জিজ্ঞেস করল, "এখান থেকে কোনও বই তুমি নিয়েছ?"

"আমি? না তো। এখানকার কোনও কিছুতেই আমি হাত দিই না।"

"বিকেলে পুলিশের ওসি এসেছেন শুনে আমি যখন এই ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলাম তার কত পরে তুমি দরজা বন্ধ করেছিলে?"

"আপনি বেরিয়ে যাওয়ামাত্র তালা দিয়েছিলাম।"

"ভাল করে ভেবে বলো।"

"ভগবানের দিব্যি বাবু। আমি তো হাত দিইইনি, কেউ ঢুকতেও পারেনি।"

"আশ্চর্য! বইটা এমনি এমনি উধাও হয়ে গেল? নির্মলবাবুকে ডাকো।"

নির্মল এল হন্তদন্ত হয়ে, "কী হয়েছে অর্জুন? বই চুরি গিয়েছে?"

"হ্যাঁ। মা জননী আমাকে পড়তে দিয়েছিলেন। ইংরেজিতে লেখা সেনবংশের পূর্বপুরুষদের ইতিহাস। কিছুটা পড়ার পর ওসি এসেছেন শুনে এখানে বইটা রেখে আমি বেরিয়ে গিয়েছিলাম। এখন ফিরে এসে দেখি সেটি উধাও।"

নির্মল ঘুরে কাজের লোকটির দিকে তাকাল, "মা জননীর কানে গেলে কী অবস্থা হবে তোমার বুঝতে পারছ? বই কোথায়?"

লোকটি কেঁদে ফেলল, "বিশ্বাস করুন বাবু, আমি জানি না। আমি কেন ইংরেজি বই নিতে যাব? আমি তো পড়তেই পারব না।"

অর্জুনের মনে হল লোকটি সত্যি কথা বলছে।

অথচ বইটি যে উধাও হয়েছে সেটাও ঠিক। হঠাৎ নির্মল আবিষ্কার করল বাগানের দিকের জানলা ভেজানো, ভিতর থেকে বন্ধ করা হয়নি। সে দ্রুত সেখানে গিয়ে পাল্লা খুলতেই অন্ধকারে ডুবে থাকা গাছপালা দেখা গেল।

"এই জানলা বন্ধ করোনি?" কাজের লোকটির কাছে কৈফিয়ত চাইল সে। লোকটি স্পষ্টতই বিভ্রান্ত। এগিয়ে এল কয়েক পা।

অর্জুন দেখল। জানলার ওপাশে দাঁড়িয়ে একটা লাঠির সাহায্যে টেবিল থেকে বই তুলে নিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু কেন নেবে? ওই বইটিতে যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে সেটা চোর জানবে কী করে? যদি জেনে থাকে তা হলে বুঝতে হবে সে যথেষ্ট বুদ্ধিমান এবং ওয়াকিবহাল।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "একটা টর্চ দিতে পারবে?"

নির্মলের হুকুমে কাজের লোকটি টর্চ নিয়ে এল। সেটি জ্বেলে অর্জুন বাইরে বেরিয়ে বাগানে চলে এল। জানলার এপাশে এসে সে টর্চের আলো ফেলল। সদ্য মাটি খোঁড়ার কারণে ওখানে ঘাস জন্মায়নি। জানলার নীচের মাটিতে মানুষের দাঁড়াবার প্রমাণ স্পষ্ট। কোনও পায়ের ছাপ নয়, লোকটির পায়ে জুতো ছিল। কিন্তু জুতোর আদল স্পষ্ট নয়। বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষার সুযোগ থাকলে অবশ্যই ছাপটা পাওয়া যেত। তার জন্যে আগামীকাল মালদা শহর থেকে বিশেষজ্ঞ আনাতে হয়। অর্জুন আশেপাশে টর্চ ফেলতে লাঠিটা খুঁজে পেল। লাঠির একটা মুখে দড়ি দিয়ে আঁকশি তৈরি করা

BANGLA EBOOK DOWNLOAD.COM
FREE BANGLA

হয়েছে। বইটি নিয়ে ফের আঁকশি খুলে ফেলার প্রয়োজন বোধ করেনি। এই লাঠিতে নিশ্চয়ই হাতের ছাপ পাওয়া যাবে। কিন্তু তা পরীক্ষা করার সুযোগ আপাতত এখন নেই।

অর্জুন ঘরে ফিরে এলে নির্মল জিজ্ঞেস করল, "কিছু পেলি?"

"হ্যাঁ। তোর কাজের লোকটিকে নির্দোষ বলেই মনে হচ্ছে। চোর জানলা দিয়ে আঁকশির সাহায্যে বইটা নিয়ে গিয়েছে।"

"কী ছিল বইটায়?" নির্মল জিজ্ঞেস করল।

"এই বংশের পূর্বপুরুষ কত ধনসম্পদের মালিক ছিলেন তার ইতিহাস।"

"কিন্তু এরকম একটা বইয়ের কথা চোর জানবে কী করে?"

"সেটাই ভাবছি। বইয়ের কথা জানতেন মঙ্গলময়বাবু। তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। তারপর মা জননীকে দেন। মা জননী হলেন দ্বিতীয়জন যিনি বইটির কথা জানেন। তৃতীয়জন আমি। তুই কি জানতিস?" অর্জুন তাকাল।

মাথা নাড়ল নির্মল, "না।"

"তা হলে এই তিনজন, একজন পৃথিবীতে নেই। অবশ্য

নির্মলের দিকে তাকিয়ে অর্জুন বলল, "আর একজন জেনে থাকতে পারেন। তিনিও এখন পৃথিবীতে নেই। চায়ের দোকানে শুনলাম মঙ্গলময়বাবু গজেনদাদুর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। কী বিষয়ে আলোচনা করতেন, জানি না। যদি সেনবাড়ি নিয়ে কথা হয়ে থাকে, তা হলে এই বইটির উল্লেখ করতে পারেন।"

"গজেনদাদু তো আজ মারা গিয়েছেন।" নির্মল বলল।

"হ্যাঁ, তাঁর পক্ষে এখানে এসে বই চুরি করা সম্ভব ছিল না। উনি অবশ্য আজ আমাকে বলেছেন, সেনেদের খবর সেঁনেরা জানে। সেটা ওই বইকে ভেবে বলা কিনা, তা আমি জানি না।"

"ওঁর কাছ থেকে শুনেও তো কেউ আসতে পারে।"

"পারে। কিন্তু সে জানবে কী করে আমি এই লাইব্রেরির ঘরের চেয়ারে বসে ওই বিশেষ বইটি পড়ছি? গজেনদাদুর পক্ষে বইটির নামও ঠিকঠাক বলা সম্ভব নয়। যে চুরি করেছে সে বইটিকে চিহ্নিত করবে কী করে? নাঃ। ব্যাপারটা আদৌ সহজ নয়। মা জননীর সঙ্গে দেখা করা যাবে?"

ঘড়ি দেখল নির্মল, "ওঁর শরীর ভাল নয়। বলছিলেন ডাক্তারের কাছে যেতে পারেন। যদি যান, তা হলে

pathagar.net

"উনি তো গতরাত্রেও গিয়েছিলেন।"

নির্মল হাসল, "ওষুধে কাজ না হলে পরপর দু'দিন যেতে কী অসুবিধে! মুশকিল হল, রবিবার ছাড়া ডাক্তার এখানে আসতে পারেন না।" নির্মল বলল, "আমি দেখছি। যদি দেখা করতে চান তা হলে তোকে খবর দেব।"

লাইব্রেরির দরজায় তালা দেওয়া হল দেখে অর্জুন ফিরে এল নিজের ঘরে। এখন পর্যন্ত তার হাতে তেমন কোনও তথ্য নেই। যেটুকু পেয়েছে তা হল, হত্যাকারী এই ঘুমঘুম গ্রামেই আছে। নইলে গজেনদাদু খুন হতেন না। দ্বিতীয়ত, লোকটা বা ওদের মধ্যে অন্তত একজন মোটামুটি শিক্ষিত, ইংরেজিটাও জানে।

কিছুক্ষণ পরে নির্মল এসে জানাল, মা জননী অর্জুনের জন্যে অপেক্ষা করছেন। অর্জুন উঠে দাঁড়াতেই সে বলল, "তোকে বলতে খারাপ লাগছে, বইয়ের ব্যাপারটা ওঁকে না জানালেই নয়?"

"কেন বল তো?"

"কর্তব্যে গাফিলতির অপরাধে লোকটার চাকরি যাবে। ও কেন জানলাটা বন্ধ করে দরজায় তালা দেয়নি! মা জননী খুব কড়াধাতের মানুষ।"

অর্জুন হাসল, "অন্যায় করলে তো শাস্তি পেতেই হবে। কিন্তু একজন সাধারণ কাজের লোকের চাকরির জন্যে তুই এত চিন্তিত হয়ে উঠেছিস কেন?"

"না না। আমার কী! চাকরি গেলে আমার কাছেই কান্নাকাটি করবে, সেটাকে এড়াবার জন্যে, থাক তোর যা করা উচিত বলে মনে হয় তাই কর।"

"উনি শহরে ডাক্তার দেখাতে যাচ্ছেন না?"

"না। তুই কথা বলতে চাইছিস শুনে বললেন আমি গিয়ে যেন ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করে ওঁর অসুবিধের কথা বলি। অবশ্য বলা মানে, উনি ওঁর অসুবিধের কথা লিখে দেবেন চিঠিতে, আমি খামটা পৌঁছে দিয়ে ওষুধ নিয়ে আসব।"

মা জননী বসে ছিলেন তাঁর দামি বসার ঘরে। প্রথমবারেও লক্ষ করেছিল, আজও অর্জুন দেখল, ভদ্রমহিলা বাড়িতেও সাজগোজ করে থাকা পছন্দ করেন।

"আসুন। কতদূর এগোলেন?"

pathagar.net

"গোলকধাঁধায় আছি।" অর্জুন বলল, "আপনি শুনলাম অসুস্থ?"

"হ্যাঁ। বয়স তো হচ্ছে, শরীর আর কত একা লড়বে! ওষুধ খেতে হচ্ছে।" পাশের টেবিল থেকে একটা খাম তুলে নির্মলের দিকে এগিয়ে ধরলেন মা জননী, "আর দেরি করবেন না। যদি উনি বলেন কাল সকাল থেকে ওষুধ খেলে চলবে তা হলে আজ আর বিরক্ত করবেন না। আসুন।"

খামটা নিয়ে মাথা নেড়ে বেরিয়ে গেল নির্মল।

"বলুন।" মা জননী তাকালেন।

"প্রথমেই ক্ষমা চাইছি। 'ডেজ় আফটার হি ফ্রেড' বইটা আমার কাছে এখন নেই। আজ বিকেলে লাইব্রেরি ঘরে বসে পড়ছিলাম। কাজের লোক এসে জানাল থানা থেকে ওসি এসেছেন। বইটি টেবিলে রেখেই উঠে যাই। কিছুক্ষণ আগে লাইব্রেরি ঘরের তালা খুলিয়ে ভিতরে গিয়ে দেখি বই উধাও। পাশের জানলা বন্ধ ছিল না। ওখান থেকে সহজেই বই নিয়ে যাওয়া যায়। আপনি কি আমাকে ছাড়া আর কাউকে বইটির কথা বলেছেন?" অর্জুন তাকাল।

চোখ বন্ধ করলেন মা জননী। তারপর মাথা নাড়লেন, "না। কাউকে বলিনি। তবে, তবে আমার ছেলে তো বিদেশে থাকে, তাকে ই-মেলে জানিয়েছিলাম।"

"আপনি নিজে মেল করেছিলেন?"

মাথা নাড়লেন মা জননী, "না। কম্পিউটারে আমি হাত দিই না। একটা ল্যাপটপ আছে। ম্যানেজারবাবু সেটা নিয়ে প্রয়োজনীয় কাজ করেন। উনিই আমার হয়ে মেল পাঠান। হ্যাঁ, ছেলেকে জানাতে গিয়ে উনিও জেনেছেন।"

"হুঁ। বইটি পড়লে মনে হবেই লক্ষ্মণ সেনের ভাইরা যে বিপুল ধনরত্ন নিয়ে এখানকার গ্রামগুলোতে আত্মগোপন করেছিলেন নবাবের লোকজনকে এড়াতে তাঁরা সেই ধনরত্ন ব্যবহার করেননি। একেবারে সাধারণ মানুষের মতো থেকে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেই ধনরত্ন তাঁরা লুকিয়ে রেখেছিলেন এই মালদার মাটিতেই। চোর ভেবেছিল বইটি থেকে হয়তো কোনও ক্লু খুঁজে পাবে যা ধরে এগোলে সে ধনরত্নের হদিস পাবে। তার মানে এখনও সেগুলো অনাবিষ্কৃত রয়েছে। মঙ্গলময়বাবু খুন হয়েছেন, কারণ সম্ভবত তিনি ধনরত্নের হদিস পেয়ে গিয়েছিলেন।" অর্জুন বলল।

"এটা কি আপনার অনুমান?"

"কিছুটা। মঙ্গলময়বাবু ওই বইটি লাইব্রেরি থেকে নিয়ে আপনাকে

পড়তে দেননি। কারণ বইটি লাইব্রেরিতে কখনওই ছিল না।"

"সে কী?" অবাক হলেন মা জননী।

"হ্যাঁ। ওই বই তিনি বাইরে থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। আপনার লাইব্রেরির বুকলিস্টে 'ডেজ় আফটার হি ফ্লেড'-এর এন্ট্রি নেই। আমার ধারণা, উনি লাইব্রেরিতে বসে এই নিয়েই পড়াশোনা করতেন। মাঝে মাঝে জট ছাড়াতে তিনি যেতেন গজেনদাদুর সঙ্গে কথা বলতে।"

"গজেনদাদু?"

"ঘুমঘুম গ্রামের সবচেয়ে বয়স্ক মানুষ। যিনি আজ বিকেলে মারা গিয়েছেন!"

"কীভাবে মারা গেলেন?"

"স্বাভাবিকভাবেই মারা যেতেন। ওই বয়সে তো সবাই পৌঁছোয় না। দুপুরে খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। আমার সঙ্গে ওঁর যোগাযোগ হয়েছে জানার পর আততায়ী আর ঝুঁকি নিতে চায়নি। জ্ঞান ফিরে এলে যদি ওঁর মুখ থেকে আমি কথা বের করে ফেলি সেই আশঙ্কায় গুলতি দিয়ে সুচলো পাথর ছুড়ে ওঁকে মেরে ফেলেছে।"

"সর্বনাশ। কে এই কাজ করতে পারে? এই গ্রামের কেউ?"

"সেটা এখনও জানি না। তবে আজ ওর বা ওদের সঙ্গে সম্ভবত গজেনদাদুর দেখা হয়েছিল। কথাও হয়েছিল। ওরা কিছু জানতে চেয়েছিল। যার উত্তরে গজেনদাদু বলেছিলেন, সেনেদের খবর সেনেরা জানেন।"

"তার মানে?"

"আততায়ীরা যা জানতে চাইছে তা শুধু আপনারাই জানেন।"

"আমরা?"

"হ্যাঁ। সেনবাড়ির মানুষ বলতে তো আপনারাই।"

"বাঃ। সেনবাড়ির মানুষ বলতে এখন আমরা তিনজন। কিন্তু এই গ্রামে সেন টাইটেল আছে এমন অনেক পরিবার বাস করেন।"

"ও!" অর্জুনের কপালে ভাঁজ পড়ল। এটা কেন সে চিন্তা করেনি!"

"আপনারা তিনজন মানে?"

"আপনাকে বলেছিলাম। আমার এক মানসিক প্রতিবন্ধী দেওর আছেন এখানে। আর আমার একমাত্র সন্তান থাকে শিকাগোতে। দূরে থাকলেও সে এই বাড়ির উত্তরাধিকারী। তাই তিনজন বলেছি।"

pathagar.net

"ও হ্যাঁ। আপনাকে একটা অনুরোধ, যে কাজের লোকটির গা ফিলতিতে বই চুরি হয়ে গেছে ওকে ওখান থেকে সরিয়ে দিন।"

"সরিয়ে দেব? কাল সকালেই ওকে এ বাড়ি থেকে চলে যেতে হবে।"

"প্লিজ ওকে চাকরি থেকে ছাড়াবেন না। বরং অন্য কাজে বদলি করুন। ওর জায়গায় বকু নামের লোকটিকে কাজ করতে বলুন।"

"বকু? বকুকে আপনি দেখেছেন?"

"হ্যাঁ।"

"লোকটির চেহারা দেখে ভাববেন না খুব সাহসী, বরং উলটোটা। তা ছাড়া ও গোয়ালঘরের কাজ জানে। বুদ্ধিও কম।"

"ঘরদোরের তালা খোলা, আউট হাউসের দেখাশোনা করার কাজ পারবে।"

"কেন এরকম চাইছেন?"

"লোকটির চাকরি না গেলে সে কৃতজ্ঞ বোধ করবে। কৃতজ্ঞ মানুষেরা উপকারী হয়।"

মা জননী অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে হাত নাড়লেন। মুখে কিছু বললেন না।

অর্জুন বলল, "এই গ্রামের অন্যান্য সেনপরিবারও কি লক্ষ্মণ সেনের বংশধর?"

"ভুল করলেন। লক্ষ্মণ সেনের বংশধররা এদিকে ছিলেন না। কারণ লক্ষ্মণ সেন তাঁর পরিবার নিয়ে পদ্মা পেরিয়ে পূর্ববঙ্গে চলে যান।"

"ও হ্যাঁ, তাই তো, ঠিক আছে।" অর্জুন উঠে দাঁড়াল।

"আপনার তদন্ত শেষ করতে আর কতদিন লাগবে?"

"এখনই বলতে পারছি না। গজেনদাদু আজ মারা না গেলে বলতাম আর চব্বিশ ঘণ্টায় আপনাকে সব জানাতে পারব।"

রাত বারোটা নাগাদ গাড়িটা ফিরে এল। এখান থেকে মালদা শহরের যে দূরত্ব তাতে গিয়ে কাজ শেষ করে ফিরে আসতে এরকম রাতই হবে। অর্জুন জানলার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। গেট পেরিয়ে গাড়িটা গাড়িবারান্দার নীচে দাঁড়াতেই অন্ধকারে আলো জ্বলে উঠল ভিতরে। দরজা খুলেছে যে, তাকে চিনতে অসুবিধে হল না। আদেশ পালন করে ফিরে এসেছে নির্মল। দ্রুত পায়ে ভিতরে চলে গেল।

প্রৌঢ় ড্রাইভার গাড়ি বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল একটু। তারপর গেট বন্ধ করে বাইরে চলে গেল। লোকটা বলেছিল দেরি হয়ে গেলে রাত্রে এখানেই থেকে যায়। রাত বারোটা কি ওর কাছে দেরি নয়?

pathagar.net

সকালে ঘুম ভেঙেছিল রোদ ওঠার আগেই। তৈরি হয়ে অর্জুন বেরিয়ে পড়ল। বাগানে ঘুরতে ঘুরতে গোয়ালঘরের কাছে পৌঁছোতেই বকুকে দেখতে পেল। মাটিতে উবু হয়ে বসে আছে, গালে হাত। ওই ভয়ংকর চেহারার লোকটিকে শিশুর মতো দেখাচ্ছে।

"কী ব্যাপার বকু, আজও ভূত দেখেছ নাকি?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

বকু তাকাল। তারপর নিস্তেজ গলায় বলল, "আমার চাকরি চলে গেছে বাবু।"

"সে কী? কী করে জানলে? কে বলেছে?"

"একটু আগে হরিধনদা এসে বলে গেল, আটটার সময় মা জননী ডেকেছেন।"

"তাতে কী করে বুঝলে চাকরি চলে গেল!"

"এ বাড়ির কাজের লোকদের মা জননী তখনই ডাকেন যখন তাদের চাকরি যায়।"

"আচ্ছা! অন্য কারণও থাকতে পারে। হরিধনদা কে?"

"মা জননীর খাস চাকর। উপরে থাকে।"

"আগে থেকে মন খারাপ কোরো না, তোমার চাকরি যায়নি।"

"আপনি কী করে বলছেন?"

"আমি জানি। আচ্ছা বলো তো, আগের বুড়ো ম্যানেজারবাবু কোন ঘরে থাকতেন?"

"ওই ওপাশের ঘরে।"

অর্জুন দেখল। একতলার একেবারে পিছনদিকের কোনার ঘর। সে বলল, "তোমার তো আটটা পর্যন্ত কোনও ভয় নেই। তার দেরি আছে অনেক। আমার সঙ্গে এসো।"

অনিচ্ছাসত্ত্বেও বকু সঙ্গে এল।

দরজাটায় শেকল টানা, তালা নেই। অর্জুনের নির্দেশে শেকল খুলল বকু। ঘরের ভিতরটা অন্ধকার। জানলা খুলতেই একটা তক্তাপোশ, আলনা আর টেবিল চেয়ার দেখতে পেল অর্জুন। আলনায় কিছু ধুতি পাঞ্জাবি আর চাদর ঝুলছে। ঘরের একপাশের দড়িতে শেষবার শুকোতে দেওয়া গামছা এখনও রয়েছে। তক্তাপোশের উপর বিছানাটা গোটানো। টেবিলের ড্রয়ার অর্ধেক খোলা। কিছু কাগজ নীচে পড়ে রয়েছে।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "উনি মারা যাওয়ার পর পুলিশ কি এখানে এসেছিল?"

pathagar.net

"না বাবু। নতুন ম্যানেজারবাবু আর হরিধনদা এসে কী সব খুঁজছিলেন।"

অর্জুন বুঝল, এতদিন পরে এই ঘরে কোনও সূত্র পাওয়া সম্ভব নয়।

"আরে! সাতসকালে এই ঘরে কী করছিস?" দরজায় এসে দাঁড়াল নির্মল।

"যিনি খুন হয়েছেন তাঁর ঘরটা দেখতে এলাম।" বলতে বলতে অর্জুন দেখল বকু সন্তর্পণে নির্মলকে কাটিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

"অ। মা জননী বলেছিলেন ওঁর কোনও আত্মীয়স্বজনের হদিস পাওয়া যায় কিনা এই ঘরে খুঁজে দেখতে। আমরা খুঁজেছিলাম, পাইনি।" নির্মল বলল।

"আমরা মানে?"

"ও, আমি আর মা জননীর খাস চাকর হরিধন। লোকটার কোনও পাস্ট রেকর্ড নেই, বুঝলি?"

"এই ঘরে কোনও জুতো নেই। অথচ ডেডবডির পায়ে জুতো ছিল না। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই খালি পায়ে বাইরে যাননি। এটা লক্ষ করিসনি?"

"না। আরে বাবা, আমি কি তোর মতো বুদ্ধি রাখি? তা হলে আর এই চাকরি করব কেন?" নির্মল শব্দ করে হাসল।

অর্জুন বেরিয়ে এল ঘর থেকে, "তুই দেখছি খুব সকাল সকাল উঠে পড়িস!"

"হ্যাঁ। উঠে বাগানে হাঁটি। চা খেয়েছিস?"

"না।" অর্জুন ঘুরে দাঁড়াল, "নির্মল, আমি একজনের সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

"কার সঙ্গে?"

"মা জননী বলেছিলেন, ওঁর এক দেওর এই বাড়িতে থাকেন।"

"কিন্তু..."

"জানি। উনি বলেছিলেন, ভদ্রলোক মানসিক প্রতিবন্ধী।"

"হ্যাঁ। কারও সঙ্গে কথা বলেন না, টিভি চালিয়ে বসে থাকেন সারাদিন, দেখেন বলে মনে হয় না।" নির্মল জানাল।

"বিকেলে ছাদে ওঠেন হাঁটার জন্যে। কিন্তু কিছুতেই ছাদের ধারে যান না।"

নির্মল মাথা নাড়ল, "তা হলে তো সবই জানিস।"

"জেনেই যেতে চাইছি।"

pathagar.net

"ঠিক আছে। মা জননীর সঙ্গে কথা বলে নিচ্ছি।"

"একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষমানুষের সঙ্গে দেখা করতে গেলে ওঁর সঙ্গে কথা বলতে হবে কেন? তা ছাড়া উনি তো তোর সামনেই আমাকে বলেছেন, সমস্তরকমের সহযোগিতা করা হবে। খামোখা ওঁকে বিরক্ত করবি কেন?"

"বেশ। কখন যেতে চাইছিস?"

"কখন আবার? এখনই চল।"

একটু ইতস্তত করেও পা বাড়াল নির্মল। বাড়ির পিছনদিকে জমাদারদের উপরে ওঠার সিঁড়িটার দিকে একবার তাকাল সে। তারপর মাথা নেড়ে অর্জুনকে নিয়ে বাড়ির সামনে চলে এল। এখনও রোদ ওঠেনি। চারধার ছায়াছায়া। সিঁড়ি ভেঙে বন্ধ দরজার কাছে এসে বেল বাজাল নির্মল। মিনিট দেড়েকের মধ্যে গোলগাল চেহারার একটি মধ্যবয়সি লোক দরজা খুলে তাদের দেখে একপাশে সরে দাঁড়াল।

"মা জননী কি ঘুম থেকে উঠেছেন হরিধন?"

"না। এখনও সময় হয়নি।" হরিধন জিজ্ঞেস করল, "উঠলে কিছু বলব?"

"না। এমনিই জিজ্ঞেস করছিলাম। আয়।"

অর্জুনকে ইশারা করে সে সিঁড়িতে পা দিল। এই পথে অর্জুন এসেছে। দোতলায় মা জননী থাকেন। সেদিকে না গিয়ে ডানদিকের সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে এল নির্মল।

সিঁড়ির মুখের দরজাটা বন্ধ। নির্মল শব্দ করলে ভিতর থেকে তালা খোলার শব্দ হল। একজন প্রৌঢ় কাজের লোক বেশ অবাক হয়ে তাদের দেখল।

নির্মল জিজ্ঞেস করল, "ছোটবাবু কী করছেন?"

"টিভি দেখছেন। মানে..."

"ঠিক আছে। আয়।"

করিডর দিয়ে এগিয়ে যে ঘরের দরজায় নির্মল দাঁড়াল তার ভিতর থেকে শব্দ ভেসে আসছে। কেউ বক্তৃতা করছে হিন্দিতে। অর্জুন সেখানে পৌঁছে দেখল টিভি চলছে আর তার সামনের চেয়ারে বসে আছেন যে ভদ্রলোক তাঁর চোখ টিভির পরদায়। পাঞ্জাবি পরা মানুষটি বেশ রোগা, চুল সাদা।

pathagar.net

নির্মল বলল, "ওঁর সঙ্গে কথা বলে কোনও লাভ হবে না। উনি সাড়া দেবেন না।"

অর্জুন এগিয়ে গিয়ে টিভিটাকে বন্ধ করে দিয়েই মানুষটির দিকে তাকাল। কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। অন্তত মিনিটখানেক। তারপর হাই তুললেন শব্দ করে। চেয়ার ছেড়ে উঠে ওদের দিকে তাকালেন, কিন্তু বোঝাই গেল কিছুই দেখলেন না।

অর্জুন পাশে গিয়ে দাঁড়াল, "নমস্কার মিস্টার সেন।"

ভদ্রলোক মুখ ফিরিয়ে অর্জুনকে দেখলেন। তারপর নিঃশব্দে হাসলেন। সে হাসির কোনও মানে হয় না।

এইসময় কাজের লোকটি ট্রেতে চায়ের কাপ আর বিস্কুট নিয়ে এল। টেবিলে ট্রে রেখে চায়ের কাপ তুলে ভদ্রলোকের ঠোঁটের সামনে ধরল। কয়েক সেকেন্ড পাথরের মতো স্থির থেকে খুব বড় চুমুক দিলেন উনি।

নির্মল জিজ্ঞেস করল, "মুখ পুড়ে যাবে না তো?"

"ঠান্ডা করে এনেছি। উনি গরম খেতে পারেন না।"

লোকটি যত্ন করে চা বিস্কুট খাইয়ে চলে গেল। নির্মল জিজ্ঞেস করল, "আর কিছু দেখার বাকি আছে?"

"থাকি না একটু।" অর্জুন বলল।

"আমার জরুরি কাজ আছে..."

"তা হলে তুই চলে যা। ওই লোকটাকে বলে যা আমাকে নীচে নামিয়ে দিতে।"

"তোর কি সন্দেহ হচ্ছে মঙ্গলময়বাবুর মৃত্যুর কোনও হদিস ইনি দিতে পারবেন?"

"দ্যাখ, আমাদের মনে রাখতে হয় যে, কেউ সন্দেহের বাইরে নয়। অবশ্য তোর যদি আপত্তি থাকে তা হলে আমি চলে যাচ্ছি।" অর্জুন বলল।

"না না। আসলে উনি মানসিক প্রতিবন্ধী। কথা বলেন না বলাই ঠিক। হাজার প্রশ্ন করেও ওঁর কাছ থেকে তুই একটাও উত্তর বের করতে পারবি না। এই বাড়িতে মঙ্গলময়বাবু বলে কেউ ছিলেন এবং তিনি মারা গিয়েছেন, এইসব তথ্যে ওঁর কোনও আগ্রহ নেই। তাই বলেছিলাম। ঠিক আছে, থাক তুই।" নির্মল ঘর থেকে বেরিয়ে কাজের লোকটিকে নির্দেশ দিল, "নতুনবাবুকে এক কাপ চা করে দাও আর উনি যখন নীচে যেতে চাইবেন তখন পৌঁছে দিয়ো।"

নির্মল চলে গেলে অর্জুন ঘরের কোণের চেয়ারটায় গিয়ে বসল, কিছুক্ষণ পরে তার মনে হল সে একটি জীবন্ত পুতুল দেখছে। এক পা সামনে ফেলে দাঁড়িয়ে পড়ছেন ভদ্রলোক। দাঁড়িয়েই থাকছেন। দুটো হাত ডানার মতো তুলে রাখছেন কিছুক্ষণ। তারপরই হেসে নামিয়ে নিচ্ছেন। শেষপর্যন্ত চেয়ারে গিয়ে বসলেন, টিভির দিকে তাকালেন। এবার ওঁর চোখমুখে বিরক্তি ফুটল। অর্জুন উঠে গিয়ে রিমোট টিপে টিভি চালু করতেই সেটা চলে গেল। উনি টিভির দিকে তাকিয়ে আছেন, কিন্তু কিছুই দেখছেন না।

লোকটি ঘরে ঢুকল ট্রে নিয়ে। একটা টুল অর্জুনের সামনে রেখে তার উপর ট্রে নামাল। চায়ে চুমুক দিয়ে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "তুমি ওঁর সঙ্গে কতদিন আছ?"

"তা বাবু তিরিশ বছর।"

"এতদিন?"

"হ্যাঁ। তখন আমি যুবক ছিলাম। ছোটবাবুরও তখন জোয়ান বয়স। মাথায় চোট পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। তখন বড়বাবু বেঁচে। কত ডাক্তার-বদ্যি করলেন, কলকাতায় নিয়ে গেলেন, কিন্তু কোনও কাজ হল না। সেই থেকে আমি এখানে।"

"উপরে আর কেউ নেই?"

"না। কথা বলতে হলে ছোটবাবুর সঙ্গে বলে যাই, শুনুক বা না-শুনুক তবু মানুষটা তো জ্যান্ত। এখানে থাকতে থাকতে এমন অভ্যেস হয়ে গিয়েছে, আর বাইরে যেতে ইচ্ছে করে না। অন্য লোকেরা আমাকেও আধা-পাগল ভাবে।"

"ছোটবাবুর মাথায় চোট লেগেছিল কী করে?"

"আমগাছ থেকে পড়ে গিয়ে।"

"সে কী! কীভাবে পড়লেন?"

"কেউ দ্যাখেনি। আর উনি তো পরে কথাই বলতে পারলেন না।"

"ওঁকে রোজ ছাদে নিয়ে যাও?"

"হ্যাঁ। কিন্তু ছাদে উঠে কিছুতেই ধারে যাবেন না। হয়তো উপর থেকে নীচে পড়ার ভয়টা মনে থেকে গেছে। ঠিক মাঝখানে হাঁটবেন।"

কথাটা শোনার পর এবার খেয়াল হল। মা জননীও একই কথা বলেছিলেন। কিন্তু তখন সে ধ্যান দেয়নি। যার ব্রেন একেবারে মৃত, তার মনে কী করে পড়ে যাওয়ার স্মৃতি কাজ করবে? যদি কাজ করে, তা হলে

pathagar.net

বুঝতে হবে কোনও কোনও স্মৃতি এখনও সক্রিয়। অর্থাৎ ব্রেন পুরো মৃত নয়।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "ছাদে একা-একাই হাঁটেন?"

"হ্যাঁ। সে হাঁটার ধরন যদি দেখতেন।"

"কীরকম?"

ডান দিক দিয়ে হাঁটতে শুরু করেন, পরপর কয়েকটা মোড় নেন, তারপর বাঁ দিকে চলে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন। তারপর আবার ঘুরে সেই একইরকমভাবে ফিরে আসেন আগের জায়গায়। যতক্ষণ ছাদে থাকেন ততক্ষণ ওই একই জায়গা দিয়ে হাঁটেন। কেন ওরকম হাঁটেন, কে জানে।"

"রোজ?"

"হ্যাঁ বাবু। রোজ। আমি লক্ষ করেছি আগের দিন যেখানে যেমনভাবে পা ফেলেছিলেন পরেরদিনও সেখানে পা ফেলেন। একটুও ভুল হয় না।"

"হয়তো এটা ওঁর খেয়াল।" অর্জুন বলল, "তুমি দেখাতে পারবে?"

"এখন ছাদে যাবেন?" লোকটির মুখের অভিব্যক্তিতে আপত্তি।

"না। এখানেই দেখাও।"

"এই ঘরে অত জায়গা যে নেই।"

"যা আছে তাতেই দেখাও।"

লোকটি ঘরের ডান দিকের কোণে চলে গেল। তারপর গোড়ালির উপর ভর করে দ্রুত হাঁটতে হাঁটতে পরপর কয়েকটা মোড় নিয়ে বাঁ দিকে চলে এসে দাঁড়াল। এইসময় ছোটবাবু মুখ ফেরালেন। লোকটি যখন আবার পিছন ফিরে ওইভাবে হাঁটতে শুরু করেছে তখন একটা গোঙানি ছিটকে বেরোল ছোটবাবুর মুখ থেকে। সঙ্গে সঙ্গে নেমে গিয়ে লোকটা বলল, "সর্বনাশ, রেগে গিয়েছে।"

ছোটবাবু ততক্ষণে রিমোটটা তুলে শূন্যে ছুড়েছেন। অর্জুন সেটাকে লুফে নিয়ে লোকটিকে বলল, "ওকে শান্ত করো।"

ছোটবাবুকে শান্ত করতে লোকটির অনেক সময় লাগল। চুপচাপ দেখে গেল অর্জুন।

একঘণ্টা পরে সে যখন নীচে নামল তখন রোদ ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত পৃথিবীতে। অর্জুন ফিরে এল নিজের ঘরে। একটা কথা তার মাথায় কেবলই ঘুরপাক খাচ্ছিল, কাজের লোক তাঁকে নকল করে দেখাচ্ছে দেখে ছোটবাবু অত খেপে গেলেন কেন? ওঁর ব্রেন যদি কাজ না করে, তা হলে খেপে

যাওয়ার তো কোনও কারণ থাকে না। এ কথা ঠিক, মঙ্গলময়বাবুর খুন হওয়ার সঙ্গে ছোটবাবুর কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে না। প্রতিবন্ধী হয়ে থাকার ব্যাপারটা যদি ওঁর অভিনয় হয়েও থাকে, তা হলেও ওই শরীর নিয়ে মৃতদেহ বহন করা সম্ভব নয়।

এখানে বেশ ক'দিন থাকা হয়ে গেল কিন্তু রহস্য এখনও রহস্যই রয়ে গেছে। সে শুধু প্রমাণ করতে পেরেছে দুর্ঘটনায় মানুষটি মারা যাননি, তাঁকে খুন করা হয়েছে এবং খুনের কারণ হল সেনবাড়ির লুকোনো ধনসম্পদের হদিস তিনি জানতে পেরেছিলেন এবং কাউকে জানাতে চাননি। মঙ্গলময়বাবু সেটা জানতে পেরেছিলেন একবছর আগেই। প্রাণের আশঙ্কা করে 'ডেজ় আফটার হি ক্রেড' বইটির সঙ্গে যে চিরকুট তিনি মা জননীকে পাঠিয়েছিলেন, তাতে আশঙ্কার কথা লিখেছিলেন। মা জননী কেন তখন চিরকুটটি পড়েননি তার কারণ বোঝা যাচ্ছে না। নাকি পড়েও গুরুত্ব দেননি তখন, আজ অন্য কথা বলছেন! অর্জুনের মনে পড়ল, মা জননী বলেছেন, ওই ঘুমঘুম গ্রামে সেন পদবির অনেক পরিবার রয়েছেন। তাঁরা কারা? খবরটা নেওয়া দরকার।

কাউকে কিছু না বলে ব্রেকফাস্ট না খেয়ে অর্জুন বেরিয়ে পড়ল। চায়ের দোকানের সামনে এসে সে দেখল আজ ভিড় নেই। দোকানদার ছাড়া আর একজন খদ্দের রয়েছেন। অর্জুন হাসল, "আজ আড্ডা জমেনি কেন?"

"আজ যে হাটবার। মাইল দুয়েক দূরে দুই গ্রামের মধ্যে হাট বসে। সবাই গিয়েছে সেখানে। বিকেলে পাবেন।"

"আচ্ছা, এখানে সেন পদবির লোকজন কীরকম আছেন?"

দোকানদার একটু ভাবল, "বেশ কয়েকজন। সবাই ওই সেনবাড়ির প্রজা ছিল। জমিদারি প্রথা উঠে যাওয়ার সময় সেনকর্তা তাদের নামে জমি ট্রান্সফার করিয়ে রেখেছিলেন। এখনও সেইসব জমির ফসলের শতকরা কুড়ি ভাগ সেনবাড়িকে দিতে হয়।"

"দেয় কেন?"

"অনেক টাকা ধার নিয়েছে বলে লিখিয়ে নিয়েছিল যে। ফসল না দিলে মামলা করে ঘটিবাটি চাটি করে দেবে।"

"এর প্রতিবাদ কেউ করে না?"

"মেনে নিয়েছে সবাই। আসলে একই রক্ত তো।"

"একই রক্ত মানে?"

pathagar.net

"লক্ষ্মণ সেনের ভাইদের বংশধর তো সবাই।"

"তা হলে এদের অবস্থা এত ভাল আর বাকিদের সাধারণ কেন?"

"তা জানি না। বাপ ঠাকুরদারা বলতেন দুই-আড়াইশো বছর আগে হঠাৎ ওই সেনদের পূর্বপুরুষ মাটি থেকে মণিমাণিক্য কুড়িয়ে পায়। পেয়ে তাদের অবস্থা ফিরিয়ে নেয়।" দোকানদার হাসল, "আমারও পদবি সেন।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ। আমি চা বিক্রি করি। দিনে চল্লিশ টাকা আয় করতে উদয়াস্ত খাটি। আর ওদের কাছে চল্লিশ হাজার টাকা হাতের ময়লা।" দোকানদার এমনভাবে হাসলেন, যেন তাঁর কোনও আফশোস নেই।

চায়ের দোকান ছাড়িয়ে অর্জুন বুঝতে পারল আজ গ্রামের পথঘাট বেশ ফাঁকা। বেশিরভাগ মানুষই হাটে গিয়েছেন। সে দক্ষিণপাড়ায় না ঢুকে একটু ঘুরে মহাবটবৃক্ষের কাছে চলে এল। দু'পাশে গাছপালা, মাঝখানে রাস্তা। জায়গাটা একদম সুনসান। রোজ এখানে আসতেন গজেনদাদু, আর আসবেন না। পোস্টমর্টেম হয়ে যাওয়ার পর ওঁর শরীর গ্রামে নিয়ে আসা হবে। সেটা কখন, কে জানে? সে মহাবটবৃক্ষের দিকে তাকাল। এর ডালে-ডালে ভূতপ্রেত ঝুলে থাকে। গল্পটা কবে চালু হয়েছিল? গজেনদাদু থাকলে ওঁর মুখে শোনা যেত। এখন এখানকার অনেকেই ভাবছে গজেনদাদুর আত্মার জায়গা হয়েছে ওই ডালে। ওঁর আত্মাকে ভয় পেয়েই বোধহয় কিছুদিন এপাশে লোকজন কম আসবে।

অর্জুন অনেকটা হেঁটে সেই বেলগাছটার কাছাকাছি আসতেই রাস্তার একপাশে সাইকেল দাঁড় করানো দেখতে পেল। সাইকেল আছে, মানুষ নেই কেন? হয়তো প্রাকৃতিক প্রয়োজনে নেমে গিয়েছে পাশের ঝোপে।

অর্জুন সতর্ক হল। রাস্তা ছেড়ে সে পাশের বুনো ঝোপের জঙ্গলে নেমে গেল চট করে। নিজেকে আড়াল করে দাঁড়াল যেখানে, সেখান থেকে সাইকেলের চারপাশ স্পষ্ট দেখা যায়। মিনিট পাঁচেক দাঁড়াবার পর অদ্ভুত ঘটনাটা ঘটল। বেলগাছ থেকে একটা বেল আচমকা খসে পড়ল সাইকেলের উপরে। তার ধাক্কায় সাইকেলটা উলটে পড়ে গেল মাটিতে। তার পিছনের চাকার ঠেকনাটা ভার সইতে পারল না। সাইকেল পড়ার শব্দ শুনেই একটা লোক দ্রুত বেরিয়ে এল ওপাশের ঝোপ থেকে। বিস্মিত হয়ে চারপাশে তাকিয়ে শেষপর্যন্ত বেলটাকে দেখতে পেয়ে গাছের দিকে তাকাল। তারপর সাইকেল তুলে গাছের নীচ থেকে অনেকটা এদিকে এনে

দাঁড় করিয়ে আবার ফিরে গেল ঝোপের দিকে। অর্জুন বুঝল লোকটা প্রাকৃতিক প্রয়োজনে ঝোপের ভিতর যায়নি। সে নিঃশব্দে ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে রাস্তা দিয়ে অনেকটা কাছে চলে এসে ঝোপের ভিতর ঢুকতেই দেখতে পেল লোকটাকে। মধ্যতিরিশেক বয়স। উবু হয়ে কিছু খুঁজছে। পাথর, পাতা সরিয়ে দেখছে। অর্জুনের মনে পড়ল। ঠিক ওই জায়গা থেকেই সে তাবিজটা খুঁজে পেয়েছিল। লোকটা কি তাবিজ খুঁজছে? সরাসরি চ্যালেঞ্জ করা যায়, কিন্তু লোকটা যদি অস্বীকার করে তা হলে কিছুই করা যাবে না। সে নিঃশব্দে সাইকেলটাকে সরিয়ে আনল ঝোপের মধ্যে, তারপর বেলটা তুলে ঝোপের ভিতর গিয়ে আবিষ্কার করল সেখানেও দুটো বেল পড়ে আছে। লোকটা তখন উঠে দাঁড়িয়ে কোমরে হাত রেখে মাটির দিকে তাকাচ্ছে। অর্জুন বেশ জোরে বেলটা ছুড়ল ওর মাথা লক্ষ্য করে।

"ওরে বাবার! গেছি রে, মরে গেছি রে।" বলে চিৎকার করে ওই হাতে মাথা টিপে ধরল লোকটা। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় বেলটা ছুড়ল অর্জুন। লোকটা দৌড়ে ঝোপের বাইরে চলে এসে চিৎকার করল, "সাইকেল। আমার সাইকেল।"

লোকটা ওপাশে তাকাতেই তৃতীয় বেল ছুড়ল সে। সঙ্গে সঙ্গে লোকটা "ভূত, ভূত" বলে চোঁ চোঁ দৌড় লাগাল খানিকটা। তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে মাঠের ভিতরে নেমে দৌড়োতে লাগল। এই লোকটা অবশ্যই গ্রামের লোক। বেলগাছে রাগি আত্মা আর মহাবটবৃক্ষে প্রেতেরা থাকে, তা জানে। তাই ওখান থেকে ও মহাবটবৃক্ষের দিকে দৌড়ে কথাটা মনে পড়ে যাওয়ায় দিক্‌বদল করেছে। ওরকম প্রাণ হাতে করে দৌড়তে অর্জুন কাউকে দেখেনি। লোকটা যখন মাঠের ওপাশে মিলিয়ে গেল তখন সে ঝোপ থেকে সাইকেল বের করল। একটু চিন্তা করে সে সাইকেলে চেপে বসল। সাঁতার আর সাইকেল একবার শিখলে এক জীবনে ভোলা যায় না।

সাইকেলে চেপে থানায় পৌঁছে অর্জুন ওসিকে পেল না। তিনি এখনও মালদা শহর থেকে ফিরে আসেননি। সে একজন সেপাইকে সাইকেল পাওয়ার ঘটনাটা জানাল।

"ওই বেলগাছের তলায় রাস্তায় পড়ে ছিল সাইকেলটা?"

pathagar.net

"হ্যাঁ। কোনও মালিক খুঁজে না পেয়ে থানায় নিয়ে এলাম।"

"দয়া করে আপনি আপনার কাছে রেখে দিন।"

"অন্য লোকের জিনিস আমি নেব কেন?"

"আপনাকে নিতে বলছি নাকি, কাছে রাখতে বলছি। ওই বেলগাছের নীচে পড়ে ছিল, মালিক নেই, ও জিনিস থানায় রাখতে পারব না।"

অতএব সাইকেল চালিয়ে সেনবাড়ির সামনে চলে এল অর্জুন। এখন চায়ের দোকান বন্ধ। গেট খুলে সাইকেলটাকে বাগানের মধ্যে রেখে সে নিজের ঘরে চলে এল। বেশ খিদে পেয়েছে। তাড়াতাড়ি স্নান সারতেই দরজায় টোকা পড়ল। সেটা খুলে দেখল বকু দাঁড়িয়ে আছে।

"কী ব্যাপার বকু?"

"আপনার খাবার নিয়ে আসব?"

"হ্যাঁ। আচ্ছা, তুমি তা হলে এই কাজে এসেছ? তোমার চাকরি যায়নি?"

বকু একগাল হাসল, "সকালে খুব ভয় পেয়েছিলাম বাবু, এখন গোরুগুলোর জন্য খুব মন কেমন করছে। একসঙ্গে ছিলাম তো, কীরকম সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছিল।"

"ও।" এরকম সরল বাক্যে আজকাল আর মজা পায় না অর্জুন, খারাপ লাগে। সে কথা ঘোরাবার জন্যে বলল, "নির্মল, মানে ম্যানেজারবাবু খেয়েছেন?"

"উনি তো সদরে গিয়েছেন। যাওয়ার আগে আমায় বলেছেন আপনার দেখাশোনা করতে।"

খাওয়া শেষ করে অর্জুন বকুকে বলল, "একটা সাইকেল কুড়িয়ে পেয়ে বাগানে এনে রেখেছি। কেউ যদি এসে বলে তার সাইকেল হারিয়েছে তা হলে তাকে দিয়ে দিয়ো।"

বিন্দুমাত্র অবাক না হয়ে মাথা নাড়ল বকু।

অনেকক্ষণ অভুক্ত থাকায় পেট ভরে খাওয়ার কারণে ঘুম এসে গিয়েছিল। যখন ঘুম ভাঙল তখন বিকেল চারটে। সে তৈরি হয়ে দরজা খুলে সামনেই বকুকে দেখতে পেল, "বাবু, চা?"

"এখন নয়। সাইকেলটাকে দেখেছ?"

"হ্যাঁ বাবু। একটা বাচ্চা ছেলে এসে বলল তোমাদের বাড়িতে আমাদের সাইকেল আছে, দাও। দিয়ে দিলাম।" বকু বলল, "বারো-তেরো বছরের ছেলে।"

Pathagar.net

"সর্বনাশ। তুমি আমাকে জিজ্ঞেস না করে দিয়ে দিলে?"

"আপনি তো জিজ্ঞেস করতে বলেননি। চাইলে দিয়ে দিতে বলেছিলেন।"

ভুলটা তারই। বকুকে যা বলা হয় তার বাইরে ওর পক্ষে ভাবা মুশকিল।

"ছেলেটাকে চেনো?"

"না বাবু। আমি তো এই বাড়ির বাইরে যাই না।"

"কীরকম দেখতে?"

বকু চোখ বন্ধ করল, "ওর মাথায় ন্যাড়া হওয়ার পর একটু চুল উঠেছে।"

অর্জুন স্বস্তি পেল। ঘুমঘুম গ্রামের সব ছেলে নিশ্চয়ই ন্যাড়া হয়নি। কিন্তু ওই বাচ্চা ছেলেটির সঙ্গে তাবিজ-খোঁজা লোকটির কী সম্পর্ক? হঠাৎই মাথায় বিদ্যুচ্চমকের মতো লাইন ভেসে উঠল। সে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল। তাবিজের ভিতর থেকে উদ্ধার করা কাগজটা বের করে আবার দেখল সে। লাইনটা কাগজের বাঁ দিক থেকে শুরু হয়ে কয়েকটা মোড় নিয়ে ডান দিকে চলে গিয়েছে। যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে ঝাঁঝরির মতো কিছু আঁকা। সন্তর্পণে কাগজটি ভাঁজ করে সে ছোটবাবুর কাজের লোকটির নকল করে দেখানো হাঁটার ভঙ্গি ভাবল। ডান দিক থেকে শুরু করে কয়েকটা মোড় নিয়ে বাঁ দিকে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন ছোটবাবু। প্রতিদিন বিকেলে ছাদে গিয়ে ওই একই হাঁটা হাঁটেন।

বকু গিয়ে খবর দিয়েছিল হরিধনকে। হরিধন এসে জানাল মা জননী অপেক্ষা করছেন। দোতলায় উঠতেই মা জননীর মুখোমুখি হল অর্জুন।

"কী ব্যাপার?"

"আমি একবার ছাদে যেতে চাই।"

"এ বাড়ির ছাদে কি মঙ্গলাবাবুর খুনের ক্লু পাওয়া যাবে বলে মনে করছেন?" মা জননী হাসলেন, "আজ সকালেও তো আপনি ছোটবাবুর কাছে গিয়েছিলেন!"

"হ্যাঁ। ওঁকে দেখতে ইচ্ছে হয়েছিল।"

"কী দেখলেন?"

"ওঁর ব্রেন পুরোটা অসাড় বলে আমি মনে করি না।"

"তার মানে? বড় বড় ডাক্তাররা যা বলেছেন তা সত্যি নয়?"

"আমি জানি না।" অর্জুন হাসল, "আপনিও চলুন না আমার সঙ্গে।"

মা জননী এক মুহূর্ত ভাবলেন। তারপর সিঁড়িতে পা রাখলেন।

Pathagar.net

ছাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন ছোটবাবু, দু'হাত ডানার মতো মেলে। অর্জুন নিচু গলায় বলল, "দেখুন, উনি ডান দিক দিয়ে হাঁটতে শুরু করবেন। ঠিক বারবার মোড় নেবেন, তারপর বাঁ দিকে কয়েক পা গিয়ে নেমে যাবেন।"

অর্জুনের কথা শেষ হওয়ামাত্র ছোটবাবু গোড়ালির উপর ভর দিয়ে হাঁটতে শুরু করে অর্জুন যেমন বলেছিল অবিকল তেমনই হাঁটলেন।

অর্জুন বলল, "এই হাঁটাটা যদি খামখেয়ালিতে হয় তা হলে লক্ষ করুন, এখনই উনি যেখানে যেখানে পা ফেলেছিলেন ঠিক সেখানেই পা ফেলে ফিরে আসবেন।"

মা জননী সেটা দেখলেন। তারপর ইশারায় দূরে দাঁড়ানো কাজের লোকটাকে কাছে ডেকে বললেন, "উনি কতদিন এভাবে হাঁটছেন?"

"অনেকদিন মা। তা প্রায়," লোকটা আকাশের দিকে মুখ তুলে ভাবল, "প্রায় দশ বছর।"

"আমাকে বলোনি কেন?" মা জননী বেশ রেগে গেলেন।

লোকটা মুখ নিচু করে দাঁড়াল। এটা যে বলার মতো কথা তা সে বোঝেনি। মা জননী আর দাঁড়ালেন না। লম্বা লম্বা পা ফেলে নীচে নেমে গেলেন।

অর্জুন দেখল ছোটবাবু আবার আগের জায়গায় ফিরে এসে দাঁড়িয়ে আছেন। সে একেবারে উলটোদিকে চলে গিয়ে ওঁর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে মঙ্গলময়বাবুর তাবিজে আঁকা লাইনের মতো হেঁটে এল বাঁ দিক থেকে ডান দিকে। সেটা দেখামাত্র ছোটবাবুর চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হল। তিনি আবার হাঁটা শুরু করলেন। ওই একই ভঙ্গিতে হেঁটে অর্জুনের সমান্তরাল রেখায় এসে দাঁড়িয়ে ছাদের দিকে তাকালেন। তারপর ধীরে ধীরে বসে পড়লেন। এখন তাঁকে একেবারে স্ট্যাচুর মতো দেখাচ্ছে।

এইসময় লোকটি অর্জুনের কাছে এসে বলল, "এখন অন্তত আধঘণ্টা উনি ওইভাবে বসে থাকবেন। রোজ দেখছি।"

অর্জুন নেমে এল। লোকটি ছোটবাবুকে ছেড়ে নামতে পারল না অর্জুনকে এগিয়ে দিতে। অর্জুন সোজা ছোটবাবুর ঘরে ঢুকে গেল। তার কেবলই মনে হচ্ছিল গত দশ বছরে সবার অজান্তে ছোটবাবুর মস্তিষ্ক কিছুটা সক্রিয় হয়েছে। এবং তিনি মঙ্গলময়বাবুর মতো রত্নভাণ্ডারের হদিস কিছুটা জানেন। যেহেতু এখনও তাঁর মস্তিষ্ক পুরো সুস্থ নয়, তাই অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে ভাবনাগুলো।

pathagar.net

এই ঘরে জিনিসপত্র বেশি নেই। একটা আলমারিতে কিছু বই আছে। রবীন্দ্র রচনাবলী, বঙ্কিমচন্দ্র এবং শরৎচন্দ্রের বই। একটি বইয়ের নাম দেখে আলমারি খুলে বইটা বের করল সে। 'আলালের ঘরের দুলাল', ১৮৬১ সালে প্রকাশিত। অর্থাৎ এই বিশেষ বইটি নীচের লাইব্রেরি থেকে নিয়ে এসেছিলেন ছোটবাবু। মঙ্গলময়বাবু সম্ভবত ওই খবর জানতেন না, তাই আর একটা বই কিনে দিয়েছেন লাইব্রেরিকে। কিন্তু সেটা খাতায় এন্ট্রি করেননি কেন? বইটির পাতা ওলটাতে লাগল অর্জুন। একেবারে শেষ পাতায় এসে স্থির হল অর্জুন। একটা বাড়ির নকশা সম্ভবত খাগের কলমে আঁকা। লক্ষ করে বুঝতে পারল এটা সেনবাড়ির নকশা। বাড়ির সামনে বাগান। আনাড়ি হাতে আঁকা হলেও বোঝা যাচ্ছে। বাগানটা লক্ষ করতে-করতে সোজা হল অর্জুনের মেরুদণ্ড। ওটা কী? ঝাঁঝরি? এই ঝাঁঝরিতেই তো শেষ হয়েছে মঙ্গলময়বাবুর তাবিজের কাগজে-আঁকা লাইন। বইটাকে ঠিক জায়গায় রেখে দিল অর্জুন।

দুপুরেই দাহ হয়ে গিয়েছিল গজেনদাদুর মৃতদেহ।

সন্ধের আগে ওসির জিপে বসে অর্জুন গ্রামে ঢুকল। সাইকেলের ঘটনাটা শুনে ভদ্রলোক খুব উত্তেজিত। জিজ্ঞাসাবাদ করে দুটো সদ্য-ন্যাড়া-হওয়া কিশোরকে তিনি বের করে ফেললেন। দু'জনেই অস্বীকার করল। তারা কোনও সাইকেল নিতে সেনবাড়িতে যায়নি। ওসি যখন প্রায় হতাশ তখন অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "তোমাদের দু'জনের কে গুলতিতে ভাল টিপ করতে পারে?"

প্রশ্ন শোনামাত্র একটু বড় যে, সে বলল, "ও। এক টিপে ডাহুক মারতে পারে।"

থানায় নিয়ে আসা হল ছেলেটিকে। মিনিট পনেরো জেরার পর ভেঙে পড়ল ছেলেটি। তাকে পাঁচশো টাকা দেওয়া হয়েছিল গাছে উঠে গজেনদাদুর মাথা লক্ষ করে গুলতি ছুড়তে। টাকাটা দিয়েছিলেন ঘুমঘুম প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক মধুসূদন সেন। ওসি আর সময় নষ্ট না করে সন্ধের পরেই মধুসূদন সেনকে থানায় নিয়ে এলেন। তাঁকে দেখে চিনতে পারল অর্জুন। এই লোকটিই বেলগাছের নীচে তাবিজ খুঁজছিল।

অর্জুন তাঁকে জিজ্ঞেস করল, "আপনি ভূতে বিশ্বাস করেন?"

উনি হাসলেন, "এই যুগে কেউ ওসব বিশ্বাস করে?"

"বেশ। আজকের রাতটা মহাবটবৃক্ষ অথবা বেলগাছের নীচে বসে থাকতে পারবেন?"

লোকটিকে নার্ভাস দেখাল, "আমাকে কেন ডেকেছেন?"

"আপনি আজ বেলগাছের কাছে সাইকেল ফেলে পালিয়ে গিয়েছিলেন। কেন?"

"আমাকে বেল ছুড়ে মারছিল।"

"কে?"

"জানি না। লোকে বলে ওখানে অপদেবতা আছে।"

"আপনি তো বিশ্বাস করেন না।" ওসি সেপাইকে বললেন ছেলেটিকে ওই ঘরে নিয়ে আসতে, "একে পাঁচশো টাকা দিয়ে বলেছিলেন গজেনবুড়োকে গুলতি ছুড়ে মাথা ফাটাতে?"

"মিথ্যে কথা।"

"মধুসূদনবাবু, গতকাল মহাবটবৃক্ষের কাছে গজেনবাবুর সঙ্গে দেখা করে আপনি কীসের সন্ধান করেছিলেন?"

"আমি আমি ...।"

মধুসূদন আর শেষপর্যন্ত মিথ্যে বলতে পারলেন না। সাইকেল সেনবাড়িতে ঢুকেছে শুনে ছেলেটিকে পাঠিয়েছিলেন নিয়ে আসতে। বলেছিলেন ওর অন্যায় কেউ জানতে পারবে না তা হলে। এখানেই তাঁর ভুল হয়ে গিয়েছিল।

আধঘণ্টা পরে ওসির জিপ ছুটল সেনবাড়ির দিকে। গেট খুলে ভিতরে ঢুকতেই নির্মল এগিয়ে এল, "কী ব্যাপার? তুই কোথায় ছিলি?"

অর্জুন বলল, "কাজ করছিলাম। এই বাড়িতে যত লোক কাজ করে তাদের এখানে ডাক। লাইন করে দাঁড়াক। মা জননীকে খবর দেওয়ার দরকার নেই।"

অনিচ্ছা সহকারে নির্মল সবাইকে গাড়িবারান্দার আলোর নীচে দাঁড় করাল। অর্জুন তাদের দিকে তাকিয়ে নির্মলকে জিজ্ঞেস করল, "ছোটবাবুর কাজের লোকটি কোথায়?"

"ও তো ছোটবাবুকে ছেড়ে আসতে পারে না।"

"ওকে ডাকো।"

"মা জননীকে জানাতে হবে।"

"জানাও।"

ওই রাত্রে মা জননী নেমে এলেন নীচে, "এসব কী হচ্ছে!"

pathagar.net

"আপনি আমার উপর যে দায়িত্ব দিয়েছেন তাই পালন করার চেষ্টা করছি।"

লোকটি নেমে এল চোরের মতো। লাইনে দাঁড়াল।

মধুসূদনকে একজন সেপাই জিপ থেকে নামিয়ে আনলে তাঁকে বলা হল শনাক্ত করতে। তিনি ইশারায় ছোটবাবুর কাজের লোকটিকে চিনিয়ে দিতেই সে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। ওসি তাকে একটা চড় মারতেই সে ভেঙে পড়ল, "আমাকে লোভ দেখিয়েছিল। অনেক ধনরত্ন দেবে, এই চাকরি থেকে ছুটি পাব। অন্য জায়গায় চলে যেতে পারব।"

মা জননী অবাক হয়ে বললেন, "কী করেছিল ও?"

অর্জুন বলল, "মঙ্গলময়বাবুকে যারা খুন করেছিল তাদের একজন এই লোকটি।"

"সে কী? ও তো নীচে নামে না।"

"সেই রাত্রে নেমেছিল। প্রয়োজন হলেই নামে।"

"ছোটবাবু আমাকে হুকুম করেছিলেন। আর ..."

"কী বাজে কথা বলছ? যে কথা বলতে পারে না, সে হুকুম করবে?"

"পারেন। এ কথা আমি জানি, আর ম্যানেজারবাবু জানেন।"

সঙ্গে সঙ্গে নির্মল চেঁচিয়ে উঠল, "মিথ্যে কথা। কী আজেবাজে বলছ!"

ওসি মা জননীকে বললেন, "ছোটবাবুর সঙ্গে কথা বলতে চাই।"

মা জননী বিস্ময়ে পাথর হয়ে গিয়েছিলেন। ওসি যখন ছোটবাবুকে নামিয়ে আনলেন তখন তাঁর পরিবর্তন দেখে সবাই অবাক। নীচে নেমে তিনি সোজা নির্মলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, "আপনাকে আমি সতর্ক করেছিলাম। খুনের রক্ত কথা বলে। বলেছিলাম, যত বন্ধু হোক, যেচে ডিটেকটিভ নিয়ে আসা মানে খাল কেটে কুমির আনা। শোনেননি। আমার কী! এত বছর উপরের ওই ঘরে বাস করলাম। বাকি জীবনটা জেলে থাকতে অসুবিধে হবে না। চলুন ওসি, আমি তৈরি।"

কাজের লোকটি, ছোটবাবু এবং নির্মলকে হাতকড়া পরিয়ে ওসি চলে যাওয়ার আগে বললেন, "অনেক ধন্যবাদ অর্জুনবাবু। কাল চলে যাওয়ার আগে দয়া করে থানায় আসবেন। কাগজপত্র ঠিক করে নিতে হবে।"

দশ মিনিট পরে দোতলায় মা জননীর সামনে বসে ছিল অর্জুন। ভদ্রমহিলা তখনও ধাতস্থ হননি। অর্জুন বলল, "মঙ্গলময়বাবুকে খুন করেছে একাধিক লোক, এটা আমি সন্দেহ করেছিলাম। মধুসূদন সেন তার বাবার কাছে শুনেছিল, এই বাড়িতে ধনরত্ন আছে। সে নির্মলের কানে খবরটা দিয়েছিল। নির্মল

জেনেছিল মঙ্গলময়বাবু সব জানেন। এ কথাটা জানতেন ছোটবাবু। ওঁর মস্তিষ্ক ধীরে ধীরে অনেকটাই সুস্থ হয়ে গিয়েছিল। সেটা আবিষ্কার করে নির্মল তাঁর ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। মধুসূদন আর ছোটবাবুর কাজের লোক মঙ্গলময়বাবুকে খুন করে দুর্ঘটনা সাজিয়েছিল। মঙ্গলময়বাবু যেহেতু গজেনদাদুর সঙ্গে কথা বলতেন, তাই ওরা ওঁকে ধরেছিল। তিনি সেটা আমাকে বলে দেবেন এই ভয়ে ওরা খুন করল। নির্মল ভাবতে পারেনি আমি রহস্য উদ্ধার করতে পারব।" পকেট থেকে সদ্য-আঁকা একটা ম্যাপ বের করে অর্জুন এগিয়ে দিল, "ধনরত্ন কী আছে জানি না কিন্তু যা আছে তা এই ম্যাপ অনুসরণ করে মাটি খুঁড়লেই পেয়ে যাবেন। এবার আমার ছুটি।"

মা জননী ম্যাপটা নিয়ে বললেন, "কী বলে ধন্যবাদ জানাব জানি না।"

পরেরদিন থানা ঘুরে মালদা যাওয়ার জন্য অর্জুন যখন গাড়িতে উঠছে তখন হরিধন নমস্কার করে একটা খাম ওর হাতে দিল। খাম থেকে চেকটা বের করে হাসল অর্জুন। আজ অবধি কোনও কেসের পরে এত টাকা সে পায়নি।

pathagar.net

গল্প

pathagar.net

আমি অর্জুন

কদমতলার মোড়ে পানুর চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে বসে আড্ডা মারছিল অর্জুন। অনেকদিন বাদে স্কুলের বন্ধুরা একসঙ্গে হওয়ায় আড্ডাটা জমেছিল। কলেজ পার হয়ে ওদের অনেকেই এখন ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে ভাল চাকরি করছে। জলপাইগুড়িতে আসাই হয়ে ওঠে না, যখন আসে তখন সবাই একসঙ্গে হয় না। এবার হয়েছে। শঙ্কর বলল, "তুই বেশ আছিস অর্জুন!"

"কীরকম?" অর্জুন চায়ে চুমুক দিল।

"গোলামি করতে হয় না। সবসময় অ্যাডভেঞ্চারের মধ্যে থাকিস। আর সেইসঙ্গে বিদেশে ঘুরে আসছিস। কপাল করেছিলি বটে!"

সুবোধ বলল, "তবু কিন্তু ওর নিশ্চয়তা নেই। মানে, কাল কোনও কেস আসবেই এমন তো কথা নেই। না এলে ঝুঁকি বাড়বে। আমাদের মতো মাস গেলে মাইনের নিশ্চয়তা ওর নেই।"

শঙ্কর প্রতিবাদ করল, "একজন উকিল বা ডাক্তারও একই কথা বলতে পারেন। আর অর্জুনের প্রফেশন ততদিন থাকবে যতদিন পৃথিবীতে মানুষ বাস করবে। খুনখারাপি এবং প্রতারণা তো বন্ধ হবে না কখনও।"

অর্জুন কিছু বলছিল না। সে মিটিমিটি হাসছিল আর চা খাচ্ছিল। সত্যসন্ধানী হওয়ার পর আত্মীয়স্বজনের ধারণা হয়েছে অর্জুনের ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই। এ-দেশে শার্লক হোমস হওয়ার চেষ্টা করা বোকামি। কিন্তু অর্জুন সেই বোকামিই করতে চায়।

অজিত বলল, "এতদিন পরে আমরা একসঙ্গে হলাম, চল ডুয়ার্সের কোনও

pathagar.net

বাংলোয় গিয়ে আমরা একরাত কাটিয়ে আসি।"

ব্যাপারটা সবার মনে ধরল। কোন বাংলোয় যাওয়া হবে এই আলোচনা চলল। সবাই কথা বলছে তাদের স্কুলজীবনের শোনা অভিজ্ঞতা থেকে। শেষপর্যন্ত অর্জুন বলল, "যেতে হলে চাপড়ামারি চল।"

অজিত জিজ্ঞেস করল, "চাপড়ামারি?"

অর্জুন বলল, "জলপাইগুড়ি থেকে তিস্তা নদী পেরিয়ে বার্নিশ, ময়নাগুড়ি, লাটাগুড়ি হয়ে হাইওয়ে ধরে ডানদিকে ঘুরে খুনিয়ার মোড়। সেখান থেকে বিন্দুর দিকে কিছুটা এগিয়ে গেলে ডানদিকে চামড়ামারি ফরেস্ট। জঙ্গলটা বেশ ঘন, প্রচুর বন্যপ্রাণী ঘুরে বেড়ায়।"

শঙ্কর জিজ্ঞেস করল, "কীভাবে যাব আমরা?"

অজিত বলল, "একটা অ্যাম্বাসাডারেই সবাই যেতে পারব। কাকার গাড়িতে হয়ে যাবে। জঙ্গলে গিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে শুধু আড্ডা মারব। আঃ!"

গাড়িটা অজিতই চালাচ্ছিল। ওর কাকার বুড়ো ড্রাইভারকে সঙ্গে আনেনি, এতে একটু জায়গা যেমন বাড়ল তেমনই বন্ধুদের মধ্যে খোলামনে কথাও বলা যাবে। অর্জুন ডি এফ ও অফিসে ফোন করে বাংলোয় জায়গা করে রেখেছিল। ওরা রওনা হয়েছিল দুপুরে, খেয়েদেয়ে। লাটাগুড়ি বাজারে পৌঁছে গাড়ি থামাল অজিত। ভালমন্দ খেতে হলে এখান থেকে বাজার করে নিয়ে যেতে হবে। সুবোধ আর শঙ্কর বেরিয়ে পড়ল।

অজিত বলল, "জায়গাগুলো খুব পালটে গেছে, তাই না?"

অর্জুন বলল, "পালটালেও মূল চরিত্র একই আছে।"

অজিত বলল, "ডুয়ার্সের সৌন্দর্য অসাধারণ। ঠিকমতো প্রচার হলে টুরিস্টরা দলে দলে আসবে। কেন যে প্রচার হয় না?"

ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল তার সামনেই একটা চায়ের দোকান। দোকানের বাইরে বেঞ্চিতে তখন একজনই খদ্দের বসে চা খাচ্ছিলেন। তার দিকে তাকিয়ে অর্জুনের মনে হল, ইনি স্থানীয় মানুষ নন। সঙ্গে একটা ঝোলা আর ক্যামেরা নিয়ে স্থানীয় মানুষ এখানে বসে চা খাবেন না।

মাঝবয়সি ভদ্রলোক চায়ের দাম মিটিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন। অর্জুন বুঝল উনি বাসের জন্যে অপেক্ষা করছেন।

এই সময় সুবোধরা ফিরে এল। এক রাতের জন্যে ওরা যা বাজার করেছে

pathagar.net

তার অর্ধেকও শেষ হবে না। মুরগিই নিয়েছে তিন-তিনটে। ওগুলো গাড়ির ডিকিতে তুলতেই ওই ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন, "এক্সকিউজ মি।"

শঙ্কর সাহেবি কেতায় মাথা নাড়ল, "ইয়েস।"

ভদ্রলোক ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা কি ন্যাশনাল হাইওয়ের দিকে যাচ্ছেন? আসলে আমি এখানে আউটসাইডার। বাস কখন আসবে বুঝতে পারছি না। যদি আপনাদের অসুবিধে না হয় তা হলে একটা লিফ্‌ট চাই।"

অজিত জিজ্ঞেস করল, "আপনার পরিচয়?"

ভদ্রলোক কার্ড বের করে অজিতকে দিলেন। অজিত সেটা দেখে অর্জুনকে দিল। অর্জুন পড়ল, আর এন প্রসন্ন, ফ্রিলান্স জার্নালিস্ট, হিন্দু অ্যান্ড ন্যাশনাল জিওগ্রাফি। বাঙ্গালোরের ঠিকানা।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনি এখানে?"

"ছবি তুলতে। ডুয়ার্সের জঙ্গলের ওপর স্টিল ছবি তুলে যদি মনে হয় ইন্টারেস্টিং তা হলে পরে ভিডিয়ো নিয়ে আসব ডিসকভারি চ্যানেলের জন্যে। আমি জলদাপাড়া থেকে আসছি। যে ট্যাক্সিটা নিয়েছিলাম সেটার ইঞ্জিন গোলমাল করাতে ড্রাইভার আমাকে এখানে নামিয়ে দিয়ে গেল।"

"আপনি এখন কোথায় যাবেন?"

"ম্যাপ বলছে ন্যাশনাল হাইওয়ের ওপাশে গভীর জঙ্গল আছে। ওখানে যদি থাকার জায়গা পাওয়া যায় তা হলে—।"

"পাশেই তো গোরুমারা ফরেস্ট রয়েছে। সেখানে যাচ্ছেন না কেন?"

"জলদাপাড়ায় যাওয়ার পথে গিয়েছিলাম। বড্ড ফাঁকা, ইন্টারেস্টিং ফিচার কিছু পাইনি। বড্ড বেশি মানুষের যাতায়াত ওখানে।"

অর্জুন বলল, "ঠিক আছে, আপনি গাড়িতে উঠতে পারেন।"

ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, "অনেক ধন্যবাদ আপনাদের।"

গাড়ি চালাতে চালাতে অজিত জিজ্ঞেস করল, "আপনি যখন বাঙ্গালোরের তখন এরাপল্লি প্রসন্ন নিশ্চয়ই আপনার কেউ হন, তাই না মিস্টার প্রসন্ন?" অজিতের ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটেছে, আয়নায় দেখতে পেল অর্জুন।

"নো, নো। উনি কত বড় ক্রিকেটার। আমরা ওঁর জন্যে গর্বিত! কিন্তু আমার সঙ্গে আত্মীয়তা দূরে থাক, আলাপ পর্যন্ত নেই।" মিস্টার প্রসন্ন বললেন।

"কিন্তু আপনি যদি বলতেন উনি আপনার বন্ধু, তা হলে আমরা তাই মেনে নিতাম, আপনারও খাতির বেড়ে যেত।" অজিত হাসল।

"সরি মিস্টার। আমি যা নই তা সাজার মতো ইচ্ছে যেন কখনও আমার না হয়। মিথ্যে কথা বলা আমি ঘেন্না করি।" বেশ জোরের সঙ্গে কথাগুলো বললেন মিস্টার প্রসন্ন।

ভদ্রলোককে ভাল লেগে গেল অর্জুনের। বাঙ্গালোরের একটি মানুষ এতদূরে এসেছেন জঙ্গলের ছবি তুলবেন বলে, এটাও তো কম কথা নয়!

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "মিস্টার প্রসন্ন, আপনি কী খুব অল্পে উত্তেজিত হন?"

ভদ্রলোক হকচকিয়ে গেলেন, "কেন?"

"আমার বন্ধু আপনার সঙ্গে রসিকতা করছে। আপনি কিছু মনে করবেন না।" অর্জুন কথাগুলো বলতেই মিস্টার প্রসন্ন হাসলেন।

দু'-পাশে জঙ্গল, মাঝখানে সরু পিচের রাস্তা ধরে গাড়ি ছুটে যাচ্ছিল। গোরুমারা ফরেস্টে ঢোকার পথটা পেরিয়ে এল ওরা। অজিত বলল, "ছেলেবেলায় তো কেউ আমাদের জঙ্গলে নিয়ে যায়নি। তখন গোরুমারার নাম শুনলেই মনে হত জঙ্গলের গোরুদের বাঘ মেরে খেয়ে নেয় বলেই ওই নামকরণ।"

সুবোধ হাসল, "তা হলে সেগুলো বুনো গোরু।"

সবাই হাসল। শুধু মিস্টার প্রসন্ন চুপচাপ। তিনি বাংলা বোঝেন না।

হাইওয়েতে পড়ে ডানদিকে বাঁক নিয়েই অর্জুন বলল, "মিস্টার প্রসন্ন, আমরা চাপড়ামারি ফরেস্টে যাচ্ছি। আপনি কোথায় যাবেন?"

মিস্টার প্রসন্ন একটা নোটবই বের করে দেখে নিয়ে খুব খুশি হয়ে বললেন, "তা হলে তো খুব ভাল হল। ওই ফরেস্টের নাম আমার ডায়েরিতে রয়েছে। ওখানেই যাই তা হলে।"

শঙ্কর বলল, "কিন্তু থাকবেন কোথায়? আপনার তো বুকিং নেই।"

মিস্টার প্রসন্ন মাথা নাড়লেন, "একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।"

অর্জুন বুঝল এইভাবে বাংলো পর্যন্ত মিস্টার প্রসন্নের সঙ্গে জুটে যাওয়া বন্ধুরা পছন্দ করছে না। কিন্তু ভদ্রলোককে তো জোর করে নামিয়ে দেওয়া যায় না। খুনিয়ার মোড় থেকে বিন্দুর রাস্তাটা আরও সুন্দর। সোজা গেলে জলঢাকা হাইড্রোইলেকট্রিক্যাল প্রজেক্টে পৌঁছনো যায়। দু'পাশে শুধু জঙ্গল। বাঁক ঘুরতেই অজিত ব্রেক কষল। তিরিশ গজ দূরত্বে রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল এক হাতি। তার মুখ গাড়ির দিকে। অজিত চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, "কী করব?"

সুবোধ ফিসফিস করল, "ব্যাক কর। বুনো হাতি। ডেঞ্জারাস।"

অর্জুন বলল, "না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাক। এখন নড়াচড়া করলেই ও তেড়ে আসবে। স্টার্ট বন্ধ করে দে।"

অজিত তাই করল। হাতিটা নড়ছে না। মিনিট-তিনেক সময়কে অনন্তকাল বলে মনে হচ্ছিল ওদের। তারপর শুঁড় তুলে হাতিটা আওয়াজ করতেই পাশের জঙ্গল থেকে পিলপিল করে গোটা দশেক হাতি বাচ্চাসমেত বেরিয়ে এল। তারপর লাইন বেঁধে রাস্তা পার হয়ে উলটো দিকের জঙ্গলে ঢুকে গেল। শেষ হাতিটি চলে গেলে শুঁড়টি নেড়ে বড় হাতিটি রাস্তা ছেড়ে অনুসরণ করল সঙ্গীদের।

ইতিমধ্যে ক্রমাগত ক্যামেরার শাটার টেপার আওয়াজ হচ্ছিল। রাস্তা ফাঁকা হয়ে গেলে শঙ্কর বিরক্ত হয়ে বলল, "আপনি তো অদ্ভুত লোক। ক্যামেরার শব্দ শুনে হাতি যদি এগিয়ে আসত তা হলে আমরা সবাই মারা পড়তাম। এইসময় কেউ ছবি তোলে?"

কথাগুলো ইংরাজিতে বলায় মিস্টার প্রসন্ন বিনয়ের সঙ্গে উত্তর দিলেন, "শাটারের শব্দ তো খুব হালকা, ও শুনতে পায়নি। তা ছাড়া এত কাছ থেকে ওদের দেখে ছবি না তুললে সারাজীবন আফসোস থেকে যেত। কিন্তু একটি ব্যাপার আমাকে খুব অবাক করেছে।"

অজিত গাড়ি চালাতে চালাতে জিজ্ঞেস করল, "সেটা কী?"

"ওদের লিডারের শরীরের পেছন দিকে কিছু একটা আটকে আছে। জিনিসটা কী বুঝতে পারিনি। কিন্তু কোনও ফরেন এলিমেন্ট হাতি শরীরে কিছুতেই রাখবে না। অথচ এ রেখেছে।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনি সেটার ছবি তুলেছেন?"

"হ্যাঁ। জুম করে ওটাকে ধরেছি। কিন্তু প্রিন্ট না করা পর্যন্ত বোঝা যাবে না।" বিষণ্ণ দেখাল মিস্টার প্রসন্নকে।

অর্জুন অজিতকে বলল, "এই, গাড়ি ঘোরা।"

"কেন?" অজিত অবাক হল।

"নাগরাকাটায় যাব। কাছেই। আধঘণ্টা নষ্ট হবে।"

pathagar.net

চামড়ামারি ফরেস্ট বাংলোটি সত্যি সুন্দর। বাংলোকে ঘিরে প্রায় পনেরো ফুট লম্বা দশ ফুট গভীর খাদ কাটা রয়েছে, যাতে বন্যজন্তু ঢুকতে না পারে। একটা

কাঠের সাঁকো দিনের বেলায় খাদের ওপর ফেলে রাখা হয় যাতায়াতের জন্য। নীচের লনে নুড়ি-পাথর ছড়ানো। খাদের চারপাশে ঘন জঙ্গল, শুধু সামনের দিকটায় ঢালু জমি নেমে গিয়েছে বিরাট এক জলাশয়ে। প্রথম ও শেষ রাতে ওখানে বনের পশুদের জল খাওয়ার আসর বসে।

বাংলোর ওপরে দুটো ঘর, চারটে বিছানা। সামনে বারান্দা। সেখানকার বেঞ্চের চেয়ারে বসে গল্প করছিল ওরা। মিস্টার প্রসন্ন ওপরে ওঠেননি। তিনি গাড়ি থেকে নেমেই তাঁর ক্যামেরা নিয়ে ঢুকে গেছেন জঙ্গলে। এইসময় চৌকিদার চা নিয়ে এল, "উনি কোথায় গেলেন?"

প্রশ্নটা যাঁকে নিয়ে তিনি এ-দলের কেউ নন তা লোকটা জানে না। অর্জুন বলল, "বোধ হয় ছবি তুলতে গিয়েছেন।"

"তা হলে ওঁকে ডাকুন স্যার। ক'দিন থেকে একটা চিতাবাঘ এদিকে ঘুরছে। হাতির সঙ্গে লড়াই করে জখম হয়েছে বেচারা। মাথা ঠিক নেই।"

সুবোধ বলল, "হাতির সঙ্গে লড়াই করেছে কেন?"

চৌকিদার হাসল, "কখনও কখনও এমন হয় স্যার। ওঁকে ডাকুন।"

অর্জুন বলল, "আমরা কোথায় খুঁজব ওঁকে?"

কিন্তু কিছুই করতে হল না। মিস্টার প্রসন্নকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল পাশের জঙ্গল থেকে। তাঁর বাঁ হাতে ক্যামেরা আর ডান হাতে একটা লম্বা সাপের মাথা মুঠোয় ধরা।

অজিত উঠে দাঁড়িয়ে রেলিংয়ে ঝুঁকে চেঁচাল, "এ কী! আপনি সাপ ধরেছেন? কী সাপ ওটা?"

"আমি সাপ চিনি না। এ-ব্যাটা আমাকে দেখে ছোবল তুলেছিল, আমি চট করে ধরে ফেললাম। এখন ছাড়তে পারছি না। আপনারা আমাকে সাহায্য করবেন? প্লিজ!" মিস্টার প্রসন্ন চেঁচিয়ে বললেন।

ওরা চা ফেলে রেখে দুদ্দাড় করে নীচে নেমে এল। মিস্টার প্রসন্ন তখন কাঠের সাঁকোর ওপর এসে দাঁড়িয়েছেন। চৌকিদার বলে উঠল, "আই বাপ! এ তো শঙ্খচূড়। ভগবানের সাপ। একবার দাঁত বসালে ভগবানও বাঁচাতে পারবে না। আপনি এঁকে ধরেছেন? সাপুড়েরাও ওঁকে ধরতে ভয় পায়।" কথাগুলো বলতে বলতে লোকটা বারংবার নমস্কার করে যাচ্ছিল।

শঙ্খচূড়। অর্জুন ভাল করে দেখল। শরীর থেকে অনেকটা দূরে হাত সরিয়ে রাখায় সাপটা কোনও অবলম্বন না পেয়ে ক্রমাগত বেঁকেচুরে যাচ্ছে। শঙ্খচূড়ের মাথায় যে ছাপ থাকে তা দেখা যাচ্ছে না ওটা মুঠোর মধ্যে আটকে

pathagar.net

থাকায়। মিস্টার প্রসন্ন আবার বললেন, "হেল্প মি প্লিজ।"

ততক্ষণে চৌকিদার একটা দড়ি নিয়ে এসেছে। দড়িটা সাপের শরীরের মাঝ বরাবর তিনবার ফাঁস দিয়ে আটকে তার এক প্রান্ত সামনের গাছের ডালে বেঁধে দিল সে। দিয়ে বলল, "সাপকে ছেড়ে দিয়ে দৌড়ে সরে যান।"

মিস্টার প্রসন্ন বাংলা না বুঝলেও ব্যাপারটা অনুমান করতে পারলেন। চকিতে হাত ছেড়ে দৌড়ে গেলেন তিনি খানিকটা দূরে। সাপটা এবার গাছের ডালে বাঁধা দড়ির শেষে ঝুলতে লাগল। প্রাণপণে সে মাথাটাকে ওপরে তুলে দড়িটাকে জড়িয়ে ধরতে চাইছিল। ওর পেটে দড়ি চেপে বসে যাওয়ায় শক্তি যথেষ্ট কমে গিয়েছিল কিন্তু তাতে রাগ পড়েনি। মাঝে মাঝেই তার আস্ফালন শোনা যাচ্ছিল।

মিস্টার প্রসন্ন কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "এটা কি বিষাক্ত সাপ!"

অর্জুন দোলনার মতো দুলতে থাকা সাপটার দিকে তাকিয়ে বলল, "হ্যাঁ। কামড়ালে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।"

"মাই গড।"

কিন্তু ওইভাবে সাপটাকে ঝুলিয়ে না রেখে মেরে ফেলাই ভাল। অর্জুন সেটা বলতে চৌকিদার তীব্র আপত্তি করল। ওটা ভগবানের সাপ, মারলে ভগবানই মারবেন। ও যাতে কাউকে না কামড়ায় তাই এই ব্যবস্থা। ওকে মারলে ওর জোড়া সাপটি যদি দেখতে পায় তা হলে আর রক্ষা থাকবে না। বরং এইভাবে ঝুলতে ঝুলতে ও আপনিই মরে যাবে।

অর্জুনের ভয় হচ্ছিল। কেউ যদি না দেখে ওর কাছাকাছি চলে আসে তা হলে নির্ঘাত সাপের ছোবল খাবে। এটা শুনে সুবোধ বলল, "ভালই হল। আমাদের আর একজন পাহারাদার বাড়ল।"

মিস্টার প্রসন্ন সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে ফেললেন। তারপর চৌকিদারের সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন। তিনি নাকি নীচের ডাইনিং রুমেই রাত কাটাবেন। ডাইনিং রুমটি মন্দ নয়। মেঝের ওপর কার্পেট পাতা, টেবিল-চেয়ারের সঙ্গে লম্বা সোফাও রয়েছে।

বিকেল হয়ে গিয়েছিল। চার বন্ধু বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে সামনের জলাশয়ের দিকে তাকিয়ে ছিল। ঝিঁঝির বীভৎস একটানা তীক্ষ্ণ শব্দ ছাপিয়ে এখন শয়ে শয়ে পাখির ডাকে চারপাশ মুখরিত। সন্ধের মুখে যে যার গাছের ডালে ফিরে আসছে ওরা। গোটা পঞ্চাশেক টিয়া জলাশয়ের ওপর চার-পাঁচবার এমনভাবে পাক খেয়ে গেল যেন তারা সার্কাসের খেলা

pathagar.net

দেখাচ্ছে। সামনের গাছের ডালে সাপটা তখনও লড়ে যাচ্ছে প্রাণপণে।

ঝুপঝুপ করে সন্ধে নয়, একেবারে রাত নেমে গেল জঙ্গলে। প্রথমেই ঘন অন্ধকার। বাংলোয় ইলেকট্রিক নেই। চৌকিদার দু'-দুটো বড় হ্যারিকেন জ্বেলে দিয়ে গেল দু'-ঘরে। অর্জুন তাকে জিজ্ঞেস করল, "ফোটোগ্রাফার সাহেব কী করছেন?"

"ডাইনিং রুমের সোফায় শুয়ে আছেন।"

"এখানে কী কী দেখতে পাওয়া যায় ভাই?" সুবোধ জানতে চাইল।

"কপাল ভাল হলে হাতি, বাইসন, হরিণ তো পাবেনই, ভেতরের দিকে চিতাও দেখতে পাবেন। আজ তো দেরি করে চাঁদ উঠবে।"

ঘন অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে অজিত বলল, "চাঁদ উঠবে!"

"হ্যাঁ। দু'দিন আগে পূর্ণিমা গেল না?"

চৌকিদার নীচে নেমে গেলে অর্জুনরা গল্প শুরু করল। তাদের স্কুলজীবনের মাস্টারমশাইদের গল্প। সুশীলবাবু, কমলাকান্তবাবু, সুধাময়বাবু, শিশিরবাবু থেকে হেডমাস্টারমশাই নারায়ণচন্দ্র চন্দ মশাইয়ের কথা আন্তরিকভাবে বলাবলি করতে লাগল ওরা। অর্জুনের ভাল লাগছিল। তারপরই হঠাৎ আলোচনা বাঁক ঘুরে চলে গেল অর্জুনের গল্পে। সবাই জানতে চাইল লাইটার রহস্যের সমাধানে আমেরিকায় গিয়ে কী অভিজ্ঞতা হয়েছিল? হঠাৎ অর্জুন কী করে সত্যসন্ধানের ক্ষমতা অর্জন করল? অমল সোম লোকটি কীরকম? ইত্যাদি।

নিজের কথা বলতে অস্বস্তি হয় অর্জুনের। তবু বন্ধুদের কৌতূহল সে মেটাচ্ছিল। এইসময় একটা ইঞ্জিনের আওয়াজ হল। তারপর জঙ্গলের মধ্যে আবছা আলো দ্রুত এগিয়ে আসছে—দেখতে পেল ওরা। হঠাৎই জঙ্গল ছেড়ে সেই আলো গাড়ির হেডলাইট হয়ে জলাশয়ের ওপর বাঁক খেয়ে বাংলোর ওপর আছড়ে পড়ল। এখন খাদের ওপর সাঁকোটা নেই। সন্ধের আগেই ওটাকে সরিয়ে রেখেছে চৌকিদার। হেডলাইট না নিভিয়ে হর্ন বাজাতে লাগল গাড়িটা।

অর্জুন উঠে দাঁড়িয়েছিল। সে দেখল চৌকিদার বাংলো থেকে বেরিয়ে নুড়িপাথরের ওপর এসে দাঁড়াল।

গাড়ি থেকেই হুকুম হল "ব্রিজ লাগাও।" হুকুমটা হল হিন্দিতে।

"বাংলোতে জায়গা নেই স্যার।"

"জায়গা আছে কি না আমরা বুঝব। যা বলছি তাই করো।"

pathagar.net

"কিন্তু স্যার অর্ডার নিয়ে বাবুরা এসে গিয়েছেন। তাঁদের ঘর খুলে দিয়েছি। আপনারা অন্য কোথাও চেষ্টা করুন।" চৌকিদার বলল।

"এটা দেখতে পাচ্ছ? কথা না শুনলে তোমাকে মরতে হবে। আমরা এখানে থাকতে আসিনি। কাজ শেষ করে চলে যাব।" লোকটা জানলা দিয়ে তার যে হাতটি বাড়িয়ে ধরল তাতে কিছু একটা ধরা আছে। চৌকিদার এবার কাঠের সাঁকো টেনে খাদের ওপর তুলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থেকে চারজন নেমে পড়ল।

সুবোধ বলল, "মনে হচ্ছে এরা গুন্ডা। কী করবি?"

অর্জুন বলল, "কিছু করার দরকার নেই। চুপচাপ বসে থাক!"

ওরা বেতের চেয়ারে বসতেই লোকগুলো দুপদাপ শব্দ করে ওপরে উঠে এল। একজনের হাতে রিভলভার, বাকিরাও হিংস্র প্রকৃতির সন্দেহ নেই। ওরা পাশাপাশি ঘর, টয়লেট দেখে বাইরে এল। রিভলভারধারী হিন্দিতে বলল, "টর্চ ফেল।"

সঙ্গে সঙ্গে টর্চের আলো পড়ল অর্জুনদের মুখে। একে একে চারজনকে দেখে নিল ওরা। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার? কী চাইছেন আপনারা?"

"লোকটা কোথায়?" চাপা গলায় বলল রিভলভারধারী।

"কোন লোক?"

"দেখুন ভাই, আপনাদের সঙ্গে আমার কোনও শত্রুতা নেই। কিন্তু আজ এখানে আসার সময় লাটাগুড়ির বাজারে দাঁড়িয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ।"

"সেখানে একজন লোক, ফোটোগ্রাফার আপনাদের কাছে লিফ্‌ট চেয়েছিল?"

অর্জুন এতক্ষণে বুঝতে পারল, "আপনারা জানলেন কী করে?"

"লোকটা যে চায়ের দোকানের চা খেয়েছে তার দোকানদার মিথ্যে কথা বলবে না। তার জানের ভয় আছে।"

"আচ্ছা। হ্যাঁ, ওঁকে লিফ্‌ট দিয়েছি আমরা।"

"কেন?"

"আশ্চর্য! উনি এদিকের লোক নন, বিপদে পড়ে সাহায্য চাইছেন, গাড়িতে যখন জায়গা আছে তখন না বলব কেন?"

"লোকটা কোথায় নামল?"

pathagar.net

"আপনি তখন থেকে রিভলভার উঁচিয়ে কথা বলছেন এটা আমার ভাল লাগছে না। ওটা নামিয়ে ভদ্রভাবে কথা বলুন।" অর্জুন বলল।

সঙ্গে সঙ্গে একটা বিশ্রী গালাগাল করল লোকটা। করে বলল, "আমার সঙ্গে কেউ এভাবে কথা বলার সাহস করে না। লোকটা কোথায় না বললে তোকেই মালবাজারে তুলে নিয়ে যাব।"

"আচ্ছা! মালবাজারের লোক আপনারা। কার লোক? সুচা সিংহ না লড্ডন খান? এর বাইরে তো ওখানে কারও দল নেই।"

লোকটা বেশ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "আপনি লড্ডন খানকে চেনেন?"

"চিনি। আপনি ওকে ওর্জুনের নাম বলবেন। আর সেই সঙ্গে বলবেন এইভাবে রিভলভার দেখিয়ে তুই-তোকারি করছেন কিন্তু আমি ভদ্রতা বজায় রেখেছি।"

লোকটা কিছু ভাবল। তারপর রিভলভার পকেটে ঢুকিয়ে বলল, "মনে হচ্ছে আপনি জানাশোনা লোক। কিন্তু ওই লোকটাকে আমার চাই।"

"কেন?"

"ও জলদাপাড়ায় যেসব ছবি তুলেছে তারপর ওকে ছেড়ে দেওয়া যায় না।"

"কী ছবি তুলেছে?"

"তা আমি জানি না। যে আমাকে কাজটা দিয়েছে সেটা তার সমস্যা। শুধু ওকে খুঁজে দেওয়াই আমার কাজ।"

"তার মানে তুমি টাকা নিয়ে কাজটা করছ?"

"যার যা কাজ তা তাকে করতেই হয়।" লোকটা বলল, "কিন্তু লোকটাকে এখানে খুঁজে পাচ্ছি না। অবশ্য এই অন্ধকারে জঙ্গলে গিয়ে লুকিয়ে পড়লে ওকে পাওয়া যাবে না।"

এইসময় নীচ থেকে একটা চিৎকার ভেসে এল। ওরা কাঠের রেলিং ধরে নীচের দিকে তাকাতেই দেখতে পেল চতুর্থ লোকটি চৌকিদারকে চেপে ধরেছে এবং সে যন্ত্রণায় চিৎকার করতে করতে বলছে, "একটু আগে নীচেই ছিল, এখন কোথায় গিয়েছে বলতে পারব না।"

সঙ্গে সঙ্গে এই তিনজন নীচে নেমে গেল। বাংলোর চারপাশে গভীর খাদ। সেটা ডিঙিয়ে বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়। ওরা বাংলোচত্বর, চৌকিদারের ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজল, কিন্তু মিস্টার প্রসন্নকে কোথাও পাওয়া গেল না।

Pathagar.net

শেষ পর্যন্ত ওদের নেতা কাঠের সাঁকোর দিকে তাকাল। তারপর বলল, "আমরা যখন ভেতরে ঢুকেছিলাম তখন ও কোথাও লুকিয়ে ছিল, ফাঁক বুঝে ওই ব্রিজ দিয়েই বাইরে চলে গিয়েছে।"

"তা হলে কী হবে ওস্তাদ?" একজন জানতে চাইল।

"যাবে কোথায়? জঙ্গলের ভেতরে ঢুকলে মারা পড়বে আর হাইওয়ের দিকে গেলে আমরা আছি। নাঃ, আজ রাতের ঘুমটা আর হবে না। চলো।" বলে সে চৌকিদারের দিকে ঘুরে দাঁড়াল, "আমরা চলে গেলে এই ব্রিজটা তুলে নেবে। কাল সকালের আগে যেন এটা আর না লাগে। বুঝতে পেরেছ?"

চৌকিদার মাথা নাড়তেই ওরা কাঠের সাঁকো বেয়ে এগোতেই চাঁদ উঠল। হালকা আলো ফুটল জঙ্গলে। দু'জন গাড়িতে উঠল, আর বাকি দু'জন বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল নিচু গলায়। বাংলোর বারান্দা থেকে অর্জুনরা কোনও সংলাপই শুনতে পাচ্ছিল না।

অর্জুন জঙ্গলের দিকে তাকাল। চাঁদ উঠলেও তার শরীর এখন ছোট। যে হালকা জ্যোৎস্না এখন পৃথিবীতে নেমেছে তা জঙ্গলের শরীর ভেদ করতে অক্ষম। ফলে গাছপালাকে জমাট অন্ধকার বলেই মনে হচ্ছে। তার কোথায় মিস্টার প্রসন্ন লুকিয়ে আছেন তা কেউ বলতে পারবে না। হঠাৎ একটা আর্ত চিৎকার চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল। এমনকী পাখিরাও চমকে ডেকে উঠল গাছে গাছে। ততক্ষণে গাড়ির ভেতর থেকে টর্চের আলো পড়েছে বাইরে। একটি লোক হাত চেপে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। আর টর্চের আলোয় দেখা গেল শঙ্খচূড়টা প্রবলভাবে দুলছে দড়িতে বাঁধা অবস্থায়। কিন্তু দড়ির বাঁধন অনেক নীচে নেমে গিয়েছে। দুলতে দুলতে ঝুপ করে পড়ে গেল সাপটা। সঙ্গে সঙ্গে রিভলভারের গর্জন শোনা গেল।

বন্ধুরা ওপরে দাঁড়িয়ে থাকলেও অর্জুন দ্রুত নীচে নেমে এল। যে লোকটি ছোবল খেয়েছে সে মাটিতে ছটফট করছে। একটু দূরেই মৃত সাপটা পড়ে রয়েছে। তিনজন লোক কী করবে বুঝতে পারছিল না। অর্জুন দৌড়ে বাইরে এসে লোকটার জামা ছিঁড়ে দেখল কনুইয়ের কাছে দাঁত বসেছে। অর্জুন সঙ্গে সঙ্গে ছেঁড়া জামার টুকরো দিয়ে কনুইয়ের ওপরে বাঁধন দিতে লাগল। তারপর চেঁচিয়ে বলল গাছের দড়িটা টেনে নামাতে। সেটা নামানো হলে আরও শক্ত বাঁধন কনুই থেকে প্রায় কাঁধ পর্যন্ত সে শক্ত করে বাঁধল। লোকটা গোঙাচ্ছে। অর্জুন বলল, "তাড়াতাড়ি ওকে হাসপাতালে নিয়ে যান। বিষ যদি এর মধ্যে ভেতরে চলে না গিয়ে থাকে তা হলে ও বেঁচে যাবে।"

তাড়াতাড়ি করে লোকটাকে গাড়িতে তুলল ওরা। তীব্রবেগে গাড়ি ঘুরিয়ে চলে গেল হেড লাইটের আলোয় অন্ধকার কেটে।

ততক্ষণে বন্ধুরা নেমে এসেছে নীচে। অজিত বলল, "আশ্চর্য ব্যাপার। ওই সাপটা এতক্ষণ বেঁচে ছিল? লোকটা ঠিক মরে যাবে।"

"সম্ভবত নয়।" অর্জুন বলল।

ঠিক তখনই মিস্টার প্রসন্নকে দেখা গেল। পাশের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, "প্লিজ, আমাকে বাঁচান।"

উনি হাঁটতে পারছিলেন না ভাল করে। কোনওরকমে বাংলোর একতলায় নিয়ে আসার পর দেখা গেল ওঁর সমস্ত শরীরে মোটা মোটা পাহাড়ি জোঁক ঝুলছে। এমনকী জামাপ্যান্টের ভেতরেও ঢুকে গেছে সেগুলো। রক্ত খেয়ে ফুলে ঢোল হয়ে গেছে। সুবোধ বলল, "এত জোঁক ধরল কী করে?"

ডাইনিং টেবিল থেকে লবণ নিয়ে জোঁক ছাড়াতে ছাড়াতে অর্জুন বলল, "ভয়ে নড়াচড়া করতে পারেননি। শব্দ হলে ধরা পড়ে যেতেন।"

সুবোধ শুনল। প্রায় ছত্রিশটা জোঁক ছাড়ানো হল মিস্টার প্রসন্নর শরীর থেকে। চৌকিদার আলু কেটে তার রস ক্ষতস্থানগুলোতে লাগিয়ে দিতে দিতে বলল, "দু'দিনেই ঠিক হয়ে যাবে।"

কাঠের সাঁকোটা খুলে নেওয়া হল। রাত বাড়লে খাওয়া দাওয়ার পর পর মিস্টার প্রসন্ন একটু সুস্থ হলেন। সুস্থ হয়েই ব্যাগ থেকে একটা টিউব বের করে মলম লাগাতে লাগলেন ক্ষতস্থানগুলোতে। অর্জুন তাঁর পাশে এসে বসল, "কী হয়েছিল?"

মিস্টার প্রসন্ন মাথা নাড়লেন, "বিশ্বাস করুন, আমি কিছু জানি না।"

"নিশ্চয়ই অকারণে ওরা এতদূরে ছুটে আসেনি?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "ওরা আপনাকে জলদাপাড়ায় কিছু বলেনি?"

"হ্যাঁ বলেছে। পরশু বিকেলে আমি জঙ্গলে ঢুকে ছবি তুলছিলাম। তুলতে তুলতে সন্ধে হয়ে গেল। আমি হলংয়ের বাংলোয় জায়গা পেয়েছিলাম। হঠাৎ একটা লোক এসে আমাকে বলল আজ যেসব ছবি আমি তুলেছি তার ফিল্ম দিয়ে দিতে হবে। আমি রাজি না হওয়ায় সে খুব শাসাল। সে চলে যাওয়ার পর একটা নেপালি কর্মচারী এসে চুপিচুপি বলে গেল, 'সাব আপ ভাগ যাইয়ে। আপকো জান খতরেমে হ্যায়।' শোনার পর সত্যি আমি ভয় পেলাম। আমার তোলা ছবিগুলো কেন ওদের দরকার বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু আমি পালালাম। হলংয়ের জঙ্গল এত ঘন নয়। মাদারিহাটে পৌঁছে সেই

রাত্রেই একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে অনেকটা পথ চলে এসেছিলাম। ভোরের দিকে ট্যাক্সি খারাপ হল। তারপর হাঁটতে হাঁটতে লাটাগুড়িতে পৌঁছে অনেকক্ষণ বিশ্রাম করে ভেবেছিলাম ওদের হাত থেকে বাঁচতে পেরেছি। কিন্তু ওরা যে এখানেও পৌঁছে যাবে তা আমি বুঝতে পারিনি।" মিস্টার প্রসন্ন বললেন।

"ঠিক আছে। আপনি আজ বিশ্রাম করুন। আপনার কোনও ভয় নেই।" অর্জুন উঠে গেল।

রাত্রে ওরা হাতিদের জল খাওয়া দেখল জ্যোৎস্নায়। হাতিরা চলে গেলে এল বাইসনদের দল। নিজেদের মধ্যে মারামারি করল তারা। তারপর এল হরিণের ঝাঁক। ভোরের দিকে তখন।

সকালে চা দিতে এসে চৌকিদার জানাল মিস্টার প্রসন্ন নেই। খাদের ওপর কাঠের সাঁকো টেনে তিনি বেরিয়ে গেছেন।

অর্জুন বলল, "অনুমান করেছিলাম। তাড়াতাড়ি চা খেয়ে বেরিয়ে পড়। ভদ্রলোক হেঁটে নাগরাকাটায় পৌঁছবার চেষ্টা করছেন।"

"কেন?" অজিত জিজ্ঞেস করল।

"যে-কোনও শিল্পীর যেমন তাঁর সৃষ্টির ওপর সবচেয়ে বেশি দরদ থাকে ঠিক তেমনই মিস্টার প্রসন্নর আগ্রহ ও মমতা থাকবে নিজের তোলা ছবিগুলোকে পাওয়ার। গতকাল এখানে আসার পথে আমরা নাগরাকাটার ফোটোর দোকানে যে ফিল্মগুলো প্রিন্ট করতে দিয়ে এসেছিলাম সেগুলো উনি হাতছাড়া করতে চাইছেন না। সেটাই স্বাভাবিক।"

গাড়ি চালাতে চালাতে অজিত বলল, "একদিনেই দারুণ অভিজ্ঞতা হল। তুই যেখানেই যাবি সেখানেই এরকম হবে, তাই না অর্জুন?"

অর্জুন হাসল। গাড়ি জঙ্গলের পথ ধরে এগোচ্ছিল। হঠাৎ একটা গাছের নীচে কিছু একটা পড়ে থাকতে দেখে গাড়ি থামাতে বলল অর্জুন। নেমে কাছে গিয়ে দেখল একটা বড় ঝোলা। তাতে জামাপ্যান্ট ইত্যাদি। সে ওপরের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করল, "মিস্টার প্রসন্ন নেমে আসুন।"

অনেক ওপরে ভদ্রলোককে দেখা গেল। অসহায়ভাবে ডাল ধরে বসে আছেন। কোনওরকমে নেমে এলেন। এবার তাঁর শরীর জুড়ে লাল পিঁপড়ে দেখা গেল। ওদের কামড়ে মুখ ফুলে ঢোল। জানা গেল ভোরের পথে চলতে চলতে হাতির দলের সামনে পড়েছিলেন। প্রাণ বাঁচানোর জন্যে গাছে ওঠার সময় ঝোলা পড়ে গিয়েছিল নীচে।

Pathagar.net

তাঁকে গাড়িতে তুলে অর্জুন বলল, "আমাদের অবিশ্বাস করলেন কেন? আপনার তোলা ছবি আপনারই থাকবে।"

মিস্টার প্রসন্নকে এখন খুব লজ্জিত এবং সংকুচিত দেখাল।

নাগরাকাটার ছবির দোকান খুলল সকাল দশটায়। প্রিন্ট হয়ে গিয়েছিল। প্যাকেট বের করে প্রৌঢ় দোকানদার জিজ্ঞেস করলেন, "এই ছবি কোন জঙ্গলে তোলা হয়েছিল?"

অর্জুন বলল, "কেন?"

"এ ছবি আমি দিতে পারব না। আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। আমি থানা হয়ে আসছি। ওই যে পুলিশ এসে গিয়েছে।"

দোকানদার বলতেই একটি পুলিশের জিপ এসে দাঁড়াল। দারোগাবাবু দোকানে ঢুকে জিজ্ঞেস করলেন, "কই, কী ছবি দেখি?"

দোকানদার দেখালেন। দারোগা বললেন, "আরে। এ তো লড্ডন খান। পরিষ্কার মার্ডার। এঁরা কে?"

দোকানদার বললেন, "এঁরাই প্রিন্ট করতে দিয়েছিলেন।"

অর্জুন বলল, "ইনি প্রফেশনাল ফোটোগ্রাফার। জঙ্গলের ছবি তুলেছিলেন। ছবিটা দেখতে পারি? হ্যাঁ, এটি লড্ডন খান। মুখ পরিষ্কার উঠেছে।"

দারোগা জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা। আপনি লড্ডনকে চেনেন? মহাশয়ের নাম কী জানতে পারি।"

"আমি অর্জুন। জলপাইগুড়িতে থাকি।"

"অর্জুন? মানে—মানে—মানে!"

অজিত বলল, "হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন।"

দারোগা উচ্ছ্বসিত, "আরে মশাই, আপনার নাম এত শুনেছি। উঃ! চোখে দেখব ভাবতে পারিনি। লড্ডনকে ফাঁসাতে পারছিলাম না। এই ছবি খুব কাজে লাগবে। আপনারা আসুন, থানায় বসে এক কাপ চা খেয়ে আমাকে ধন্য করুন।"

অর্জুন বলল, "শুধু চা হলে চলবে না। ব্রেকফাস্ট চাই।"

"অবশ্যই।"

থানার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল দুটো গাড়ি। মিস্টার প্রসন্ন নিচু গলায় অজিতকে জিজ্ঞেস করলেন, "আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। উনি কী

বললেন? আমি অর্জুন। মানে কী? অর্জুন তো মহাভারতের চরিত্র। আমি মানে কী?"

অজিত হাসল। তারপর বলল, "আমি মানে আই। আই অ্যাম অর্জুন। আন্ডারস্ট্যান্ড?"

pathagar.net

অর্জুন হতভম্ব

বারান্দায় চোরের মতো দাঁড়িয়েছিল লোকটা। দরজা খুলে একপলক দেখে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "বলুন, কী দরকার?"

লোকটি পিটপিট করে তাকাল। তারপর হাতজোড় করে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, "আপনি আমাকে বাঁচান বাবু। আমি মরে গিয়েছি।"

রোগা এবং বেঁটে লোকটির পরনে সস্তার শার্টপ্যান্ট। দেখলেই বোঝা যায়, অবস্থা ভাল নয়। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আমি যে আপনাকে বাঁচাতে পারি, এ-কথা কে বলল?"

"আপনার কথা আমি আগেই শুনেছিলাম। আমার এক শালা রূপমায়া সিনেমাতে টিকিট ব্ল্যাক করে, ও আপনার খুব প্রশংসা করে। বাবু, আমি বড় বিপদে পড়েছি।" লোকটি তখনও হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে।

"আপনার নাম কী?"

"যজ্ঞেশ্বর মাইতি।"

"কী করেন?"

লোকটি মুখ নামাল, "বলতে সংকোচ হয়, তবু বলি, আমি চুরি করি বাবু।"

"চুরি করেন? চোর!" অর্জুন অবাক।

"আজ্ঞে হ্যাঁ। কাজকর্ম পাইনি, পয়সাও নেই যে দোকান-টোকান দেব, তাই চুরি করে পেট ভরাই। বাড়িতে বউ আর দুই ছেলেমেয়ে। মুখ দেখে তো কেউ খেতে দেবে না!"

"আপনার বিপদটা কী? পুলিশ?"

pathagar.net

"না বাবু, চুরির জন্যে পুলিশ আমাকে ধরলে আপনার কাছে আসতাম না।" রাস্তার দিকে চট করে তাকিয়ে নিল যজ্ঞেশ্বর, "এখানে দাঁড়িয়ে বলা কি ঠিক হবে? কেউ যদি শুনে ফেলে!"

অর্জুনদের বাড়ি গলির একটু ভেতরে। গলিটা চওড়া, রিকশা যাচ্ছে, মানুষজন হাঁটছে। একটা চোরকে বাড়ির ভেতর নিয়ে গিয়ে বসাতে প্রথমে ইচ্ছে হচ্ছিল না, পরে মত বদলে সে ডাকল, "ভেতরে আসুন।"

যজ্ঞেশ্বর সন্তর্পণে ভেতরে ঢুকতেই চেয়ার দেখিয়ে দিল অর্জুন, "বসুন।"

"না, না আমি ঠিক আছি, আপনি বসুন বাবু।"

অর্জুন আর অনুরোধ না করে চেয়ার টেনে নিল, "আপনার নাম নিশ্চয়ই পুলিশের খাতায় আছে?"

"তা তো থাকবেই বাবু। এর আগে চারবার জেল খেটেছি। তবে ওই তিন থেকে ন' মাস। বড় কাজ তো কখনও করিনি। এবার করতে গিয়েছিলাম।" যজ্ঞেশ্বর হাতজোড় করেই বলল, "ওই যে কথায় বলে না বামনের চাঁদে হাত দেওয়ার শখ, তাই হয়েছিল আমার। সেটা করতে গিয়ে ফেঁসে গেছি বাবু।"

"ফেঁসে গেছেন?" অর্জুন মাথা নাড়ল, "তা আমার কাছে কেন এসেছেন?"

"আপনি ছাড়া আমাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। পুলিশের বড়কর্তারা আপনাকে খুব খাতির করে, আপনি বললে ওরা শুনবে।" কঁকিয়ে উঠল যজ্ঞেশ্বর।

"যারা অন্যায় কাজ করে আমি তাদের সাহায্য করি না।" অর্জুন ঘুরে দাঁড়াল।

"বিশ্বাস করুন, বাবু, আমার বাচ্চার দিব্যি, গত রাত্রে আমি কোনও অন্যায় করিনি!"

"তা হলে আপনি কীসের ভয় পাচ্ছেন?"

এবার যজ্ঞেশ্বর সব কথা খুলে বলল। গত রাত্রে সে চুরি করতে গিয়েছিল শিল্পসমিতি পাড়ায়। কয়েকদিন থেকে লক্ষ করছিল ওই বাড়িতে প্রচুর গাড়ি আসছে যাচ্ছে। বাড়িটার সামনে পাঁচিলঘেরা বাগান আছে। বাগানের গেট, লোহার। আগে কোনওদিন দারোয়ান ছিল না, গাড়িগুলোর আসা-যাওয়া শুরু হওয়ার পর একটা নেপালি দারোয়ান রাখা হয়েছে। বাড়ির মালিক দীর্ঘকাল জলপাইগুড়িতে ছিলেন না। যজ্ঞেশ্বর খবর পেয়েছে তিনি আমেরিকায় ব্যবসা করেন বলে নিজের শহরে এতকাল আসতে পারেননি। যজ্ঞেশ্বর বুঝতে পারছিল, তার জন্য অনেক সম্পদ ওই বাড়িতে অপেক্ষা করছে। একে

আমেরিকার ব্যবসাদার, তার ওপর গেটে দারোয়ান বসানো, এ-সবই ইঙ্গিত করছে ওই বাড়িতে এখন দামি-দামি জিনিসপত্র এসেছে। এই শহরের যে-কোনও বাড়ির ভেতরের ছক জেনে নিতে যজ্ঞেশ্বরদের বেশি সময় লাগে না। ওই বাড়িটারও জোগাড় হয়ে গেল। দারোয়ান থাকলেও সে পরোয়া করেনি। রাতের অন্ধকারে পাঁচিল টপকে নিঃশব্দে ঢুকে পড়েছিল বাগানে। দারোয়ান টের পায়নি। তারপর জলের পাইপ বেয়ে সোজা তিনতলায় সে দোতলায় নামেনি। কারণ সেখানে আলো জ্বলছিল। তিনতলাটা অন্ধকারে পড়েছিল। ব্যালকনিতে নেমে সে স্থির হয়ে কিছুক্ষণ সব জরিপ করে নিল। ব্যালকনি থেকে ভেতরের ঘরে যাওয়ার দরজাটা বন্ধ। এবং সেটা ভেতর থেকেই। অর্থাৎ ওই পথ যজ্ঞেশ্বর ব্যবহার করতে পারবে না। শেষপর্যন্ত তাকে দোতলায় নেমে আসতে হল। পাইপ ধরে ঝুলে থেকে যখন নিঃসন্দেহ হল বারান্দায় আশেপাশে কেউ নেই, তখন সে দোতলায় নামল। ওইভাবে নেমে দাঁড়িয়ে থাকলে বিপদে পড়তে হবেই, যজ্ঞেশ্বর দ্রুত একপাশে সরে এল। ভেতরে কারও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। এ-সময় অবশ্য গৃহস্থ জেগে থাকে না, কিন্তু কেউ তো এত আলো জ্বালিয়ে রেখে ঘুমোয় না। একটু অপেক্ষা করে সে উঁকি মারল। ঘরটি খালি। সেটা ডিঙিয়ে সে যে-ঘরে এল, সেখানে অনেক আসবাব। একটি আলো জ্বলছে। যজ্ঞেশ্বরের অস্বস্তি হল। অন্ধকার ছাড়া চুরি করতে সে কখনওই পারে না। ঠিক ওই সময় একটা আর্তনাদ তার কানে এল। প্রাণের দায়ে মানুষ এমন আওয়াজ করতে পারে।

কিন্তু চিৎকারটা সম্পূর্ণ হল না। কেউ যেন মুখ চেপে ধরেছিল। যজ্ঞেশ্বর পা টিপে টিপে পাশের ঘরে দরজায় গিয়ে উঁকি মারল। একটা ষণ্ডামার্কা লোকের হাতের থাবা চেপে রয়েছে শুয়ে থাকা বৃদ্ধের মুখে। বৃদ্ধটির হাত-পা খাটের সঙ্গে বাঁধা। একটু দূরে ইজিচেয়ারে বসে খিলখিল করে হাসছে গোল আলুর মতো দেখতে একটি লোক। লোকটি বলছে, "কেটে টুকরো টুকরো করে তিস্তায় ভাসিয়ে দেব। আমার সঙ্গে চালাকি? অষ্টধাতুর ব্রজগোপালের মূর্তিটা কোথায়? এখনও সুযোগ দিচ্ছি, বলে ফেলো। হাত সরাও।"

"আমি জানি না। তুমি তো তোমার মায়ের শ্রাদ্ধের সময় আসনি, এলে তখনই জানতে পারতে ওঁর মৃত্যুর দু'-দিন আগে থেকেই মূর্তিটা নেই। সেই শোকে সেই সতীলক্ষ্মী হার্টফেল করলেন।" ষণ্ডামার্কা হাত সরাতে কঁকিয়ে কঁকিয়ে বললেন বৃদ্ধ। সঙ্গে সঙ্গে গোল আলু বলল, "নাভিতে পিন ফোটা।"

ষণ্ডামার্কা হুকুম তামিল করতেই আবার চিৎকার, আবার মুখ চেপে ধরা।

গোল আলু এবার রেগে গেছে। "ব্রজগোপালের অষ্টধাতু-টাতু সব বাজে, ফালতু। আই-ওয়াশ। ওর পেটের মধ্যে ছিল দামি হিরে। অনেকদিন আগে মুঘলদের কাছ থেকে ডাকাতি করে ওটা পেয়েছিল আমার পূর্বপুরুষ। পেয়ে লুকিয়ে রেখেছিল জিনিসটা, ব্রজগোপালের পেটে। তুমি ছাড়া কেউ এ-বাড়িতে ছিল না। অতএব না বলা পর্যন্ত তোমাকে আমি ছাড়ছি না।"

এসব কাণ্ড দেখে যজ্ঞেশ্বর বুঝল, ভুল জায়গায় এসে পড়ছে। হাতের কাছে যা পাবে তাই নিয়ে কেটে পড়লেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। সে চটপট একটা আলমারি খুলল। জামাকাপড়ে ঠাসা। হঠাৎ তার মনে হল বড্ড বেশি লোভী হয়ে পড়েছে। ওই ষণ্ডামার্কা লোকটার হাতে পড়লে তার বারোটা বেজে যাবে। সে দ্রুত ব্যালকনিতে বেরিয়ে এল। ওই সময় একটা চেয়ারে তার পা ঠুকে যাওয়ায় শব্দ হল। সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে গোল আলু চিৎকার করে উঠল, "কে কে ওখানে?" আর কোনওদিকে না তাকিয়ে পাইপ বেয়ে নীচে নেমে বাগান পেরিয়ে পাঁচিল ডিঙিয়ে পালিয়ে এসেছে যজ্ঞেশ্বর।

অর্জুনের বেশ লাগছিল একজন চোরের আত্মকাহিনী শুনতে। এবার বলল, "আপনাকে তো কেউ দেখেনি, ধরতেও পারেনি। তা হলে ফেঁসে গেলেন কী করে?"

"ওই তো বিপদ। ওই হাঁক শুনে পালাবার সময় ভয়ের চোটে তাড়াহুড়োতে আমার তালা খোলার যন্ত্রটা ফেলে এসেছি।" কঁকিয়ে উঠল যজ্ঞেশ্বর।

"ওটা যে আপনার, তা কী করে লোকে জানবে?"

"পুলিশ জানে। এই শহরের সব চোরের হাতিয়ার পুলিশের জানা।"

অর্জুন স্থির করতে পারছিল না সে কী করবে। অন্যের বাড়িতে চুরি করার জন্য গভীর রাত্রে ঢুকে যজ্ঞেশ্বর নিশ্চয়ই অপরাধ করেছে। অপরাধীকে বাঁচানো তার কাজ নয়। কিন্তু একজন বৃদ্ধকে বেঁধে রেখে হিরের জন্য অত্যাচার করা নিশ্চয়ই ন্যায়কর্ম নয়। যজ্ঞেশ্বর যা বলল তা যদি সত্যি হয় তা হলে চুপচাপ বসে থাকার কারণ নেই।

অর্জুন বলল, "আপনি আমার সঙ্গে চলুন।"

"কোথায়?" ভয় পেয়ে গেল যজ্ঞেশ্বর।

"থানায়। পুলিশকে এসব কথা খুলে বলবেন।"

pathagar.net

"ওরে বাব্বা! পুলিশ আমাকে ফাটকে ঢুকিয়ে দেবে।"

"আপনি নিশ্চয়ই অন্যায় করেছেন। পুলিশ তা করতেই পারে। কিন্তু আমি আপনাকে এছাড়া অন্য কোনওভাবে সাহায্য করতে পারছি না।"

শোনামাত্র যজ্ঞেশ্বর বারান্দা থেকে নেমে চোঁ-চোঁ দৌড় দিল। চোখের পলকে উধাও হয়ে গেল লোকটা।

অর্জুনের এবার অস্বস্তি শুরু হল। মাথার ভেতর কিছু ঢুকে গেলে সেটা না বের হলে স্বস্তি নেই তার। মোটরবাইক বের করে থানায় চলে এল সে!

বাইক থামাতেই বড়বাবুর সঙ্গে দেখা। বেজার মুখে তিনি জিপের দিকে এগোচ্ছিলেন! অর্জুনকে দেখে হাসার চেষ্টা করলেন, "কী ব্যাপার! সাত সকালে?"

"আপনার কাছেই এসেছি। চললেন কোথায়?"

"আর বলবেন না। আমাকে আজকাল ছোটখাটো অপরাধের তদন্তেও যেতে হচ্ছে। ভদ্রলোক আবদার করেছেন, এস আই পাঠালে চলবে না, আমাকেই যেতে হবে। শুনছি উনি খুব ইনফ্লুয়েনশিয়াল লোক। তাই।"

"কার কথা বলছেন?"

"এস পি সেন। আমেরিকার বড় ব্যবসায়ী। শিল্পসমিতি পাড়ায় ওঁর আদি বাড়িতে এসেছেন। কাল রাত্রে নাকি সেই বাড়িতে চোর ঢুকেছিল।"

অর্জুন খুশি হল, "আমি যদি আপনার সঙ্গে যাই তা হলে অসুবিধা হবে?"

"অসুবিধে? না, না। কিন্তু এটা চুরিটুরির কেস। খুনটুন তো নয়।"

"তাতে কী?"

বড়বাবু অবাক হয়ে বললেন, "বেশ, চলুন।"

বড়বাবুর জিপটাকে অনুসরণ করে বাইকে চেপে অর্জুন শিল্পসমিতি পাড়ার যে বাড়িটায় পৌঁছল সেটি সদ্য সারানো এবং সাজানো হয়েছে। পুলিশ দেখে দারোয়ান গেট খুলে দিল। ভেতরে ঢুকে অর্জুন আন্দাজ করে নিল, কাল রাত্রে যজ্ঞেশ্বর কোন পথে ওপরে উঠেছিল।

এস পি সেন লোকটিকে গোল আলু বলেছে যজ্ঞেশ্বর। একবর্ণ মিথ্যে কথা বলেনি। বসার ঘরে সোফায় শরীর ডুবিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, "হোয়াট ইজ দিস? জলপাইগুড়ি শহরের ল অ্যান্ড অর্ডারের অবস্থা এইরকম? আমি সি এম-কে জানাব। এন আর আইদের উনি দেশে ফিরতে বলছেন, কিন্তু কোন ভরসায় আসব?"

বড়বাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কী কী চুরি গিয়েছে আপনার?"

pathagar.net

"চুরি করতে পারেনি। তাড়া খেয়ে পালিয়ে গেল। যাওয়ার আগে একটা দিশি যন্ত্র ফেলে গিয়েছে। টমি!" চিৎকার করলেন এস পি সেন।

যজ্ঞেশ্বর যাকে ষণ্ডামার্কা লোক বলেছিল, তাকে দেখতে পেল ওরা। লোকটা দুটো লোহার সরু শিকগোছের জিনিস টেবিলে রাখল। দুটো হলেও মাথাটা একটা তারে বাঁধা। যজ্ঞেশ্বর এই দিয়ে তালা খোলে।

বড়বাবু সেটা তুলে দেখলেন, "একদম পাতিচোর। একে নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। ক্লু যখন রেখে গিয়েছে, তখন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই ধরা পড়ে যাবে।"

"তাই? লোকটা কে, জানতে পারলেই আমাকে জানিয়ে দেবেন অফিসার।"

এবার অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "ও কোন ঘরে ঢুকেছিল।"

"দোতলায়। পাইপ বেয়ে উঠেছিল।"

"একটু দেখা যেতে পারে?"

"শিওর। টমি, এদের নিয়ে যাও।"

দোতলায় উঠে এল ওরা। যজ্ঞেশ্বরের বর্ণনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। বড়বাবু বললেন, "চুরি যখন করতে পারেনি তখন এখানে সময় নষ্ট করে লাভ কী?" এটা একদম ছিঁচকে ব্যাপার। পেছনে কোনও ব্রেন নেই।"

"তা ঠিক। আচ্ছা, ওপাশের ঘরে কে থাকে?" অর্জুন টমিকে প্রশ্ন করল।

"কেউ না।"

উত্তরটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে অর্জুন দরজার পাল্লা টেনে উঁকি মারল। না। ঘরে কেউ নেই। অথচ যজ্ঞেশ্বরের বর্ণনা অনুযায়ী ওই ঘরেই বৃদ্ধের ওপর অত্যাচার হয়েছিল। বৃদ্ধকে কোথায় সরাল ওরা?

সে জিজ্ঞেস করল, "এ-বাড়িতে কে কে থাকেন?"

টমি বলল, "কয়েকজন কাজের লোক, আমি আর সাহেব।"

"আগে একজন বৃদ্ধ এখানে থাকতেন। তিনি কোথায়?"

"আমি জানি না। বোধ হয় দেশে চলে গিয়েছে।"

"দেশ! দেশ কোথায়"

"আমি জানি না।"

নীচে নেমে এস পি সেন কিছু বলার আগেই অর্জুন বলল, "আমরা ছেলেবেলা থেকেই শুনেছি আপনাদের এই বাড়িতে অষ্টধাতুর তৈরি ব্রজগোপালের মূর্তি আছে। খুব দামি। সেটা ঠিক আছে তো?"

pathagar.net

"ব্রজগোপালের মূর্তি!" এস পি সেন ভ্রূ কোঁচকালেন।

"আপনি জানেন না? ওহো, আপনি তো সেন। এ-বাড়ির কর্তারা রায় ছিলেন। গেটে তো দেখলাম "রায়বাড়ি" লেখা আছে।"

"আমার মামা হৃদয়রঞ্জন রায় বিপত্নীক এবং নিঃসন্তান ছিলেন। মারা যাওয়ার আগে এইসব সম্পত্তি তিনি আমার নামে উইল করে গিয়েছেন। মনে হচ্ছে আমাদের এই বাড়ির ব্যাপারে আমার চেয়ে আপনি বেশি জানেন!" এস পি সেন বাঁকা স্বরে কথাগুলো বললেন।

"আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন। আপনাদের এ-বাড়ির অষ্টধাতুর কথা শহরের সবাই জানে। শুনেছি বাহাদুর শাহ যখন পালিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন একদল মুঘল সৈন্যের ওপর লুঠতরাজ করে এই বংশের পূর্বপুরুষ অনেক সম্পদ পেয়েছিলেন। তার মধ্যে একটি বড় হিরে ছিল সেই হিরে ওই অষ্টধাতুর মূর্তির ভেতর লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। চোর এসেছিল শুনে আমার মনে হয়েছিল ওই মূর্তির সন্ধানেই সে এসেছিল।" অর্জুন হাসল, "যাক, মূর্তিটি চুরি যায়নি?"

"আমি এমন মূর্তির কথা কখনও শুনিনি। অবাক লাগছে।"

"যে বৃদ্ধ এ-বাড়িতে থাকতেন, তিনিও তো রায়। তিনি জানতে পারেন।"

"পারেন। কিন্তু আমি আসামাত্র তিনি ছুটে নিয়ে তীর্থে চলে গিয়েছেন। তা ছাড়া ওসব গল্প বিশ্বাস করার মন আমার নেই।"

"তা হলে অন্য কথা। তবে ওই বৃদ্ধ হাকিমপাড়ায় প্রায়ই যেতেন।"

"হাকিমপাড়া! কেন?"

"ওখানে একজন ব্যাচেলর প্রবীণ মানুষ আছেন। অমল সোম। লোকে ওঁকে খুব বিশ্বাস করে। নির্লোভ মানুষ। এমন হতে পারে বৃদ্ধ আপনাকে নিজের বংশের মানুষ নন মনে করে। অমল সোমের কাছে মূর্তিটা গচ্ছিত রেখেছেন।"

বড়বাবু বললেন, "আমরা অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে ওঁর সময় নষ্ট করছি। মূর্তি সম্পর্কে ওঁর যখন কোনও ইন্টারেস্ট নেই, তখন; আচ্ছা চলি। চোরটাকে ধরতে পারলেই আপনাকে জানাব। নমস্কার।"

বাইরে বেরিয়ে এসে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বড়বাবুর জিপকে অনুসরণ করে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে জিপটাকে থামাল অর্জুন। বড়বাবু অবাক! অর্জুন তাঁকে এবার সব কথা খুলে বলল। বড়বাবু হতভম্ব হয়ে বললেন, "তা হলে সেই বুড়ো মানুষটাকে ওরা ওই বাড়িতেই লুকিয়ে রেখেছে?"

"মনে হয়। ছাদের চিলেকোঠা অথবা মাটির তলার ঘর, যে-কোনও একটা জায়গায় হয়তো এখন সরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু অমলদা এখন জলপাইগুড়িতে নেই। আজই ওঁর বাড়িতে হানা দেবে এরা। হাবু বাড়িতে আছে। ও কথা বলতে পারে না, কিন্তু গায়ে প্রচণ্ড শক্তি আছে। খুনোখুনি হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। আমাদের উচিত ওঁর বাড়িতে লুকিয়ে পাহারা দেওয়া।" অর্জুন বলল।

"ফাঁদ পাততে বলছেন? কিন্তু এস পি সেন আপনার ফাঁদে পা দেবেন?"

"লোভ বড় মারাত্মক জিনিস"

"ঠিক আছে। ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দিন।"

সেই রাত্রে অমল সোমের বাড়িতে কোনও হামলা হল না। অর্জুন একটু অবাক। তার পাতা ফাঁদে পা দেবেন না এস পি সেন, এটা সে ভাবতে পারেনি। সকালে থানায় এল সে। বড়বাবু বললেন, "আপনার যজ্ঞেশ্বর হাওয়া হয়ে গিয়েছে।"

"মানে!"

"তার বউ বলছে সে নাকি কাজকর্মের খোঁজে শিলিগুড়িতে গিয়েছে।"

অর্জুন বলল, "আমি একটু ঘুরে আসছি। যজ্ঞেশ্বরের ঠিকানাটা দিন তো?"

যজ্ঞেশ্বরের ভাঙা টিনের বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে ওর বউ বলল, "কবে ফিরবে বলে যায়নি।"

"টাকাপয়সা কিছু দিয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ।"

"ওর তো হাতে টাকা ছিল না। দিল কী করে?"

"একজন বুড়ো মানুষ এসেছিলেন ওর কাছে। রায়বাবু নাম। তিনি দিলেন।"

"কবে এসেছিলেন।"

"কাল সকালে।"

"কীরকম দেখতে।"

"খুব রোগা আর বুড়ো।"

বাড়ি ফিরে এসে অর্জুন বড়বাবুকে ফোন করল, "বড্ড বোকা বনে গেছি।

pathagar.net

এস পি সেন কাউকে বেঁধে রেখে অত্যাচার করেননি। সেই বৃদ্ধ বাইরে, আর তার পরামর্শে যজ্ঞেশ্বর ওই বাড়ি থেকে অষ্টধাতুর মূর্তি চুরি করে একসঙ্গে উধাও হয়ে গিয়েছে। লোকটা আর পাতিচোর নেই। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, ও কেন আমার কাছে এল? আমার কাছে আগ বাড়িয়ে মিথ্যে বলে ওর লাভ কী হবে?"

বড়বাবু বললেন, "একদিনের জন্যে আমরা ওর দিকে নজর দিতাম না, এটা কী ওর কম লাভ? খুড়োর সঙ্গে পালিয়ে যেতে পারল! কিন্তু কোথায় পালাবে?"

অর্জুন রিসিভার নামিয়ে রাখল। সে হতভম্ব!

pathagar.net

অর্জুন ও অদিতি

ভোরবেলায় প্রচণ্ড জোরে দরজায় শব্দ হতে ঘুম ভেঙে গেল অর্জুনের। কোনও ভদ্র মানুষ এত জোরে কড়া নাড়ে না, এই সময়ে তো নয়ই। বিরক্ত হয়ে সে ঘর থেকে বেরুতেই মাকে দেখতে পেল, আওয়াজে তাঁর ঘুম ভেঙেছে। নিচু গলায় বললেন, "একটু বকে দিস তো!"

দরজা খুলে হাবুকে দেখে হেসে ফেলল অর্জুন। এরকম আওয়াজ করা হাবুর পক্ষেই সম্ভব। বেচারা কানে কিছুই শুনতে পায় না। কতটা জোরে শব্দ হচ্ছে তা টের পাবে কী করে! অর্জুনকে দেখে হাবু নানারকম শব্দ করে বক্তব্য বলার চেষ্টা করল। এইসময় ওর মুখ বিস্ফারিত হয়। তারপর আঙুলের ইশারায় বোঝাতে চাইল। অর্জুন বুঝল অমল সোমের বাড়িতে সাংঘাতিক কিছু ঘটে গেছে বলে হাবু তার কাছে ছুটে এসেছে। সে ইশারায় জানাল যত তাড়াতাড়ি পারে ওই বাড়িতে পৌঁছচ্ছে, কোনও চিন্তা না করতে।

হাবুকে বিদায় করে সে তৈরি হয়ে নিল। মা চা এনে দিলেন। চা খেতে খেতে হাবুর কথাই ভাবছিল অর্জুন। বয়স হয়ে গেছে হাবুর। শরীর শীর্ণ হয়েছে। অমল সোম অবশ্য প্রতি মাসের এক তারিখে হাবু যাতে বাড়ি আগলানোর টাকা পায় তার ব্যবস্থা করে রেখেছেন। কিন্তু তিনি তো দীর্ঘকাল প্রবাসে। হাবু বিশ্বস্ত ভরতের মতো তাঁর বাড়ি আগলাচ্ছে। মাঝে মাঝে অর্জুন ওখানে। গেলে খুব খুশি হয় হাবু। চা বাড়িয়ে দেয়। এককালে প্রচণ্ড শক্তি ছিল হাবুর শরীরে। এখন তো প্রকৃতির নিয়মে যা হওয়ার তাই হয়েছে।

লাল মোটরবাইক নিয়ে হাকিমপাড়ায় পৌঁছে গেল অর্জুন। হাবু বাড়ির

pathagar.net

গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। হাত নেড়ে ভেতরে আসতে বলে সে এগিয়ে গেল বাড়ির দিকে। বাগানে চমৎকার ফুল ফুটিয়েছে হাবু। অমল সোমের বাইরের ঘরের দরজা খোলা। সেখানে পৌঁছে হাবু ইঙ্গিত করল ভেতরে যেতে। যেন অপরাধী ঘরের ভেতরে রয়েছে। অর্জুন দেখল বাইরের ঘরে কেউ নেই। মাঝখানের ঘরটি ফাঁকা। সে ভেতরের উঠোনে চলে আসতেই প্রশ্ন শুনল, কে? কী চাই?

মহিলা কণ্ঠ। শুনে অবাক হয়ে মুখ ফেরাতেই যাকে দেখতে পেল তার পরিচয় সে জানে না। বছর বাইশের মেয়েটির পরনে জিনস আর টপ। চুল পিঠের কিছুটা নীচে এসে থেমেছে। দেখতে বেশ ভাল তবে লাবণ্য কম।

"আপনার পরিচয় জানতে পারি?"

"প্রশ্নটা আমি আগে করেছি", তিরের মতো শব্দগুলো ছুটে এল।

"আমি অর্জুন।"

"সাবাস।"

"মানে?"

"আপনি সে-ই? সোম আঙ্কেলের শিষ্য। গ্লাড টু মিট ইউ।"

"আপনি কে?"

"আমি অদিতি। সোম আঙ্কেলের ভাইঝি। আপনি কি রোজ এখানে আসেন না ওই উজবুকটা খবর দিয়ে নিয়ে এল?"

"ওকে উজবুক বলার কারণ?"

"উজবুক নয়! কাল এখানে পৌঁছাতে একটু দেরি হয়েছে। সাড়ে দশটা কি পৌনে এগারোটা। কিছুতেই দরজা খুলছিল না। শেষ পর্যন্ত যখন খুলল তখন আমাকে এখানে থাকতে দেবে না। যেন ও-ই এই বাড়ির মালিক! খুব খিদে পেয়েছিল কিন্তু ও আমাকে কোনও খাবার সার্ভ করেনি। আজ ভোর থেকে ওকে খুঁজে পাচ্ছি না। আমি ওকে স্যাক করব। এরকম চাকর না রাখাই উচিত।" উত্তেজিত গলায় বলল অদিতি।

অর্জুন হেসে ফেলল, "এই বাড়িতে কখনও কোন মহিলাকে থাকতে দেখেনি হাবু। আপনাকে চেনেও না। অতএব ওর প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক। আর হাবুকে চাকরি দিয়েছেন অমলদা, অমল সোম। ছাড়াবার অধিকার শুধু তাঁরই আছে।"

অদিতি বারান্দার চেয়ারে গিয়ে বল, "শুনুন মশাই। আজ থেকে এই বাড়ির মালিক আমি। সোম আঙ্কেল এসব আমাকে গিফ্ট করে দিয়েছেন।"

pathagar.net

অর্জুন অবাক হল। অমল সোমের মুখে সে কখনও কোনও ভাইঝির কথা শোনেনি। সে বিড়বিড় করল, "গিফ্‌ট করে দিয়েছেন!"

"বিশ্বাস হচ্ছে না?"

"অমলদা এখন কোথায়?"

"দিল্লিতে ছিলেন। তখনই আমাকে দেন। এখন কোথায় তা বলতে পারব না। হয়তো হিমালয়ের কোনও এয়ারকন্ডিশন্ড গুহায় বসে সাধনা করছেন," অদিতি বলল।

"আপনি কি এখানে থাকবেন?"

"সেটা নির্ভর করছে আমার ভাললাগার ওপর। না লাগলে থাকবে না। তবে ইন এনি কেস, ওই উজবুকটাকে আমি অ্যালাউ করব না।"

"ও না থাকলে বিপদ আপনারই হবে। ঠিক আছে, ওকে বলে যাচ্ছি যাতে আপনার দেখাশোনা করে।"

"সরি। আমি নিজের দেখাশোনা নিজেই করতে পারি। ওকে দরকার নেই।"

অর্জুন অদিতির দিকে তাকাল। "এই মেয়েটির মতলব কী?"

অর্জুন বলল, "হাবু অমলদার খুব বিশ্বস্ত। একমাত্র অমলদাই ওকে কাজ থেকে বরখাস্ত করতে পারেন। অমলদা যতক্ষণ এখানে না আসছেন ততক্ষণ ও থাকবে।"

অদিতি হাসল, "মনে হচ্ছে আপনিই এই বাড়ির মালিক?"

"অবশ্যই নয়। তবে এত বছর অমলদার হয়ে যে বাড়িটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে তারও তো কিছু কৈফিয়ত চাওয়ার অধিকার জন্মায়!"

"গুড! ঠিক আছে, ঝগড়া করব না। খামোকা ঝগড়া করে কী লাভ! ডাকুন আপনাদের হাবুকে, চা করতে বলুন।" অদিতি বারান্দার চেয়ারে বসল।

ইশারায় হাবুকে চা করতে বলে অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, "অমলদা এখানে কবে আসবেন কিছু বলেছেন?"

"না।"

"আচমকা এই বাড়ি আপনাকে দান করে দিলেন?"

আচমকা হবে কেন? আমি চেয়েছিলাম। ওঁর এখানে বাড়ি পড়ে আছে শুনে বলেছিলাম, নর্থবেঙ্গলে গিয়ে থাকতে চাই। উনি বললেন, "নিয়ে নাও আমার বাড়িটা। আমি নিয়ে নিলাম।" অদিতি হাত ওলটাল।

"কিছু মনে করবেন না, এই নেওয়াটা কি আইনমাফিক হয়েছে?"

Pathagar.net

"সেটা আপনাকে বলতে যাব কেন?"

"দেখুন, আপনি যদি পুরুষ হতেন তা হলে হাবু কিছুতেই আপনাকে বাড়িতে ঢুকতে দিত না। অনেক রাত এবং মহিলা বলে ও চূড়ান্ত কঠিন হতে পারেনি। এখন আপনি বলছেন এই বাড়িটা অমলদা আপনাকে দান করেছেন। যেহেতু কথাটা আপনার মুখ থেকে শুনতে হচ্ছে তাই তার সত্যতা যাচাই করার জন্যে প্রমাণ আপনাকেই দিতে হবে। আমি গিয়ে বললাম বাড়িটা আমার আর সঙ্গে সঙ্গে আমার হয়ে গেল এটা তো সম্ভব নয়। হ্যাঁ, অমলদা যদি এসে বলতেন তা হলে অবশ্যই মেনে নিতাম।"

"আমি কোনও প্রমাণ দেখাতে বাধ্য নই।" অদিতি দৃঢ় গলায় বলল।

"আপনি অবশ্যই বাধ্য।"

"না দেখালে কী করবেন? জোর করে বের করে দেবেন?—দিয়ে দেখুন!"

"আপনি মহিলা বলে বারংবার অ্যাডভানটেজ নেওয়ার চেষ্টা করবেন না।"

হঠাৎ হেসে উঠল অদিতি, "আমরা কিন্তু সমানে ঝগড়া করে যাচ্ছি। ছেড়ে দিন এসব। এখানে কী কী দেখার আছে? স্পেশালি জঙ্গল?"

অর্জুন কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। এই মেয়েটি কে? অমল সোমের কোনও আত্মীয় কি? যেভাবে বাড়ির দখল নিতে চাইছে তাতে সন্দেহের কারণ আছে। আর অমলদা কাউকে কিছু না জানিয়ে এই মেয়েকে বাড়িটা দান করে যাবেন, এমন বিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই। সেই ব্যাপারে কথা বললেই মেয়েটি প্রসঙ্গ ঘোরাচ্ছে। তার মানে মেয়েটি প্রতারক ছাড়া কিছু নয়। এবং খুব কাঁচা প্রতারক।

অদিতি তাকিয়ে আছে দেখে সে হাসার চেষ্টা করল, "হ্যাঁ, জঙ্গল তো সবসময় দেখতে ভাল লাগে। আপনি এক কাজ করুন, এখান থেকে হাসিমারার বাস ছাড়ে। বাসটায় উঠে পড়ুন। একটি বিখ্যাত জঙ্গলে পৌঁছে যাবেন। চমৎকার থাকার ব্যবস্থা আছে ওখানে। হাতি-গন্ডার দেখতে পাবেন।"

"হাতি-গন্ডার দেখতে তো আমি আসননি। ওদের তো ছেলেবেলা থেকেই চিড়িয়াখানায় দেখছি, খোলা জঙ্গলে আর কী আলাদা হবে।" অদিতি হাসল।

হাবু চা নিয়ে এল। অদিতির সামনে কাপ রাখার সময় ওর মুখের চেহারা বলে দিল যে সে খুশি হয়ে চা দিচ্ছে না।

চায়ে চুমুক দিয়ে অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, "আপনার উদ্দেশ্য কী?"

pathagar.net

"কিচ্ছু না। এখানে থাকব। আশেপাশে ঘুরব, ব্যস।"

"কিন্তু হাবু তো আপনাকে এখানে থাকতে দেবে না।"

"হাবু? ওই লোকটা? ও কে? একটা কাজের লোক ছাড়া কিছু না।"

"আপাতত এ-বাড়ির কেয়ারটেকার। শুনুন, আপনি হুট করে কোত্থেকে উদয় হয়েছেন জানি না। কিন্তু আপনি যদি প্রমাণ দেখাতে না পারেন তা হলে কেয়ারটেকার আপনাকে এই বাড়ি থেকে বের করে দিতে পারে। আপনি এক কাজ করুন, থানায় যান। পুলিশকে বলুন অমলদার দানের কথা। ওরা যদি আপনাকে এই বাড়িতে থাকার জন্যে নিয়ে আসে, আমি কথা দিচ্ছি, হাবু সরে যাবে।"

"থানাটা কোথায়?"

"চায়ের কাপ সরিয়ে রাখল অর্জুন, "চলুন, দেখিয়ে দিচ্ছি।"

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল অদিতি, "চলুন।"

"আপনার লাগেজ?"

"এখানেই থাক, একটু বাদেই তো ফিরে আসব।"

অর্জুন হাবুকে ইশারায় বোঝাল ব্যাপারটা। বোঝার পর হাবুর মুখে হাসি ফুটল।

গেটের বাইরে এসে অদিতি চেঁচাল, "ওয়া! আপনার বাইক?"

"হ্যাঁ।" বাইকে উঠে ইঞ্জিন চালু করে অর্জুন, "উঠে পড়ুন।"

বেশ চটপট উঠে বসল অদিতি। বাইক চলতে শুরু করলে বলল, "আমরা কোথায় যাচ্ছি?"

"আশ্চর্য! থানায় নিয়ে যাচ্ছি আপনাকে?"

"কেন? আমি চোর না ডাকাত?"

"আপনাকে তো আগে কখনও দেখিনি, প্রতারকও হতে পারেন!"

খিলখিল করে হাসল অদিতি, "সাবাস! এটা কী নদী?"

"করলা।"

"একটু দাঁড়াবেন?"

"কেন?"

"প্লিজ!"

অতএব অর্জুন দাঁড়াল। বাইক থেকে নেমে দাঁড়াল অদিতি, "নিন।"

অর্জুন দেখল তার মানিব্যাগটা অদিতির হাতে। অদিতি হাসল, "মাত্র দেড়শো টাকা। অবশ্য সকালে কে আর বেশি টাকা নিয়ে বের হয়!"

Pathagar.net

সর্বনাশ! হাঁ হয়ে গেল অর্জুন, "আপনি পকেট মারতেও পারেন।"

"অ্যাপ্রিসিয়েট করুন।" ব্যাগটা ফেরত দিল অদিতি।

"আপনি ঠিক কে বলুন তো?"

"আমি অদিতি।"

"সেটা বুঝলাম। কোথায় থাকেন, কী করেন। অবশ্য এটা যদি আপনার প্রফেশন হয় তা হলে নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন না।" অর্জুন কথা শেষ করতেই পুলের নীচে নদীতে হইহই শুরু হয়ে গেল। একটি বালক পুলের থামের ওপর বসে মাছ ধরছিল, জলে পড়ে গেছে। সবাই পাড়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে আর ছেলেটা খাবি খাচ্ছে। অদিতি দ্রুত তার জুতো খুলল। তারপর পুলের রেলিং বেয়ে ওপারে পৌঁছে নীচে ঝাঁপ দিল। অর্জুন তখনও মোটর বাইকে বসে। সে চিৎকার করল, "কী করছেন?"

ততক্ষণে অদিতির শরীর ঝপাং করে জলে পড়ছে। অর্জুন বাইক থেকে নেমে রেলিংয়ের ধারে গিয়ে দেখল অদিতি সাঁতরে ছেলেটিকে ধরে ফেলেছে। তারপর তাকে টানতে টানতে পারের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। বাইক ঘুরিয়ে অর্জুন ওপারে পৌঁছে দেখল সবাই হাততালি দিচ্ছে অদিতিকে। ছেলেটা প্রচুর জল খেয়ে ফেলেছিল। তাকে উপুড় করে শুইয়ে পিঠে চাপ দিয়ে অদিতি জলের অনেকটা বের করে দিতে সে সুস্থ হল। ইতিমধ্যে খবরটা চাউর হাওয়ায় পিল পিল করে লোকজন ছুটে আসছে অদিতিকে দেখতে। একজন মহিলা হাঁউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে অদিতির হাত জড়িয়ে ধরলেন। অদিতি না বাঁচালে তার ছেলে আজ মরে যেত। অর্জুন দেখল অদিতির পোশাক ভিজে একসা হয়ে গেছে। দুটো হাত বুকের ওপর ভাঁজ করে কাঁপছে সে। অর্জুন চেষ্টা করল ওর কাছে যেতে কিন্তু ভিড়ের দেওয়াল ভেদ করতে পারল না। ইতিমধ্যে তিনজন মহিলা অদিতিকে নিয়ে চলে গেলেন পাশের বাড়িতে। জনতাই তাদের পথ করে দিল।

সমস্ত ব্যাপারটা এত আকস্মিকভাবে ঘটল যে অর্জুন কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। এই মেয়ে প্রতারক, পকেটমার! অথচ অজানা একটি বালকের জীবন বাঁচাতে জলে লাফিয়ে পড়তে দ্বিধা করল না। হঠাৎ খেয়াল হল অদিতির জুতোর কথা। সে বাইক ঘুরিয়ে জুতোর কাছে গিয়ে হতাশ হল। জুতোদুটো নেই। ইতিমধ্যে যার প্রয়োজন সে চুরি করে নিয়ে গিয়েছে।

এখন কী করা উচিত? যে বাড়িতে অদিতিকে ওরা নিয়ে গিয়েছে সেই বাড়ির সামনেও বেশ ভিড়। বোঝাই যাচ্ছে অদিতির ভেজা পোশাকের

জন্যেই ওকে নিয়ে গিয়েছেন মহিলারা। এইসময় একটা বাচ্চা ছেলে ছুটতে ছুটতে এসে বলল, "দিদির দেরি হবে। আপনাকে চলে যেতে বলল।"

মাথা নাড়ল অর্জুন। তারপর বাইক চালু করল।

বাড়িতে ফিরতে মা জিজ্ঞাসা করলেন, "কী হয়েছিল রে হাবুর?"

অর্জুন পুরো ব্যাপারটা মাকে বলল। মা ভাবতে বসলেন। আজকাল এই হয়েছে। যে কোনও বিষয়ের মধ্যে রহস্যের গন্ধ পেলে মা ভাবতে বসেন। অর্জুন রসিকতা করে, "তুমি এবার এটাকেই পেশা করো।" মা ধমক দেন, "থাম তো?" তবু মা অনেকক্ষণ ভেবেটেবে বললেন, "মনে হচ্ছে মেয়েটা খারাপ না।"

"কেন মনে হচ্ছে?" অর্জুন হাসল।

"তা হলে নিজের জীবন বিপন্ন করত না।"

"ও।"

"তবে তোর অমলদাকে নিশ্চয়ই চেনে।"

"তা তো বটেই।"

বেলা এগারোটার সময় দরজায় শব্দ হতে মা খুললেন। অর্জুন নিজের ঘরে বসে কাগজ পড়ছিল। মায়ের উচ্ছ্বসিত গলা কানে আসছিল। একটু পরে মা তাকে ডাকল, "অর্জুন, এ ঘরে আয়।"

অর্জুন পাশের ঘরের দরজায় দাঁড়াতেই অদিতিকে দেখতে পেল। নিজের পোশাক ওর পরনে। শুকিয়ে গেছে ওগুলো। চেয়ারে বসে মায়ের সঙ্গে কথা বলছে। অর্জুনকে দেখে হাবু হাসিহাসি মুখে এগিয়ে এল। হাত নেড়ে চোখ ঘুরিয়ে ইশারায় কিছু বলে যেতে লাগল।

মা বললেন, "দেখলি, আমি ঠিক বলেছি কি না!"

"কোনটা ঠিক বলেছ?"

মা অদিতিকে বললেন, "তুমিই বলো।"

অদিতি উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করল, "নমস্কার। আমি অদিতি দত্ত। অমল সোমকে কাকা বলি। দিল্লিতে থাকি। আপনার কাছে পরিচয়টা সকালে দিইনি বলে দুঃখিত।"

"এইটেই আপনার সঠিক পরিচয় কিনা কে জানে!"

pathagar.net

অদিতি হাসল, "বলতেই পারেন। আপনি তো হাবুর ভাষা বোঝেন। ও কি বলছে বুঝতে পারছেন না?"

"আপাতত না।"

"না! অমলকাকা আমাকে বাড়ি দান করেননি। ওর সঙ্গে আমার বাজি হয়েছিল রাত্রে এসে ওই বাড়িতে থাকব। বলব বাড়ির মালিক আমি। সবই ঠিকঠাক চলছিল শুধু ওই বাচ্চাটা জলে পড়ে গিয়ে গোলমাল করে দিল।"

"হ্যাঁ। আপনি ওভাবে ঝাঁপ দিয়ে ঠিক করেননি, ভাগ্যিস ওখানে জল গভীর ছিল, করলার সব জায়গায় তো কোমর জল। অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেত।"

"আমার ভাগ্য ভাল বলুন।"

"আপনার জুতো—এ কী, জুতো কোথায় পেলেন?"

"কেন? একজন এসে দিয়ে গেল। বলল, 'দিদি আপনার জুতো পুলের ওপর পড়েছিল, নিন। তা এবার চলুন।'"

"কোথায়?"

"এতক্ষণ হাবু আপনাকে ওই কথাটাই বোঝাতে চেয়েছে। আমরা গতকাল একই ফ্লাইটে দিল্লি থেকে এসেছি। অমলকাকা থেকে গিয়েছিলেন শিলিগুড়িতে। আমি চলে এসেছিলাম এখানে। আজ সকালে উনি জলপাইগুড়িতে এসেছেন। ওঁর কাছে সব জানার পর হাবু আমার ওপর সদয় হয়েছে।"

"অমলদা শহরে এসেছেন?" অর্জুন উত্তেজিত।

"হ্যাঁ।"

"মিথ্যে বলছেন না তো?"

"মাসিমা, দেখুন—!" অদিতি মায়ের দিকে তাকাল।

মা বললেন, "শোন, হাবু এখন এখানে থাক। আমি রান্না করে হাবুর হাত দিয়ে খাবার পাঠাব। তুই যা, দেখা কর।"

বাইকের পেছনে অদিতি বসল। ইঞ্জিন চালু করেই খেয়াল হল অর্জুনের, "শুনুন, দয়া করে আমার পকেট মারবেন না।"

BANGLA EBOOK DOWNLOAD.COM
FREE BANGLA

বেরসিক অর্জুন

আগে পৌঁছেছিল টুপুর। শরীরে এক ফোঁটা মেদ নেই। ডিপ-ব্লু জিনসের উপর সাদা শার্ট। কাঁধে জিনসের ঝোলা। পায়ে নর্থস্টার। এখন সন্ধে। তবু অভ্যেসবশে রোদচশমাকে মাথার সামনে গুঁজে রেখেছে। ঘড়ি দেখল সে। তারপর একটা ম্যাগাজিন স্টলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল, এবং তখনই কানে এল, "কী জিনিস! উফ!"

শক্ত হল টুপুর। পত্রিকা তুলে নিয়ে দেখতে দেখতে শুনতে পেল, "এ জিনিস বাঙালি না! মুখ খুললে ইংরেজি বলবে।"

"মুখ খোলার কী দরকার! জামা খুললেই মরে যাব!"

পত্রিকাটা রেখে ঘুরে দাঁড়াল টুপুর। একেবারে ঘাড়ের কাছে দাঁড়িয়ে ছেলেদুটো বোকা বোকা হাসল। ঝট করে পা চালাল টুপুর, প্রায় একই সঙ্গে হাত। ছেলেদুটো ছিটকে পড়ল প্ল্যাটফর্মে। ট্রেনে উঠতে আসা যাত্রীরা দাঁড়িয়ে গেল দৃশ্যটা দেখতে। রোগা চোয়াড়ে চেহারার ছেলেদুটো উঠে বসার চেষ্টা করছে। শান্তমুখে ওদের দেখছিল টুপুর। ঠিক তখনই রিয়া আর মিলা এসে গেল। দু'জনের পরনেই জিন্স আর টপ, হাতে ব্যাগ। রিয়া জিজ্ঞেস করল, "এনি প্রবলেম?"

টুপুর বলল, "ওরা আমাকে জামা খুলতে বলছিল। জামা খুললেই নাকি মরে যাবে।"

কথাটা শুনেই রিয়া এগিয়ে গেল, "অ্যাই, জামা খোল।"

ছেলেদুটো ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। রিয়া আবার বলল, "জামা না খুললে হাড় ভেঙে দেব। খোল জামা।"

pathagar.net

ছেলেদুটো সম্ভবত বিশ্বাস করল, রিয়া মিথ্যে বলছে না। দ্রুত জামা খুলে ফেলল তারা। হাত বাড়িয়ে সে দুটো রিয়া নিয়ে নিতেই বোঁ-বোঁ দৌড়োল ওরা। যারা দর্শক ছিল তারা বুঝল, ছেলে দুটোই অন্যায় করেছে। হো হো হাসল তারা।

একজন ভিখারিকে ডেকে শার্টদুটো দিয়ে রিয়া বলল, "চল।"

টুপুর বলল, "তোদের টাইমসেন্স কবে যে হবে!"

"মিলার জন্য, ও-ই পাঁচ মিনিট দেরি করেছে।"

এসি টু-টিয়ারে উঠল ওরা। টিকিটে ছাপা নম্বর মিলিয়ে পরদা সরিয়ে তাকাতেই দেখল, দুটো লোক চাপা গলায় খুব জরুরি কথা বলছে। রিয়া বলল, "এখানকার তিনটে বার্থ আমাদের।"

"নিশ্চয়ই।" মোটা লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয়জনকে ইশারা করতে সে-ও বাইরে চলে গেল। দুটো লোয়ার আর একটা আপার।

মিলা বলল, "আমি কিন্তু উপরে শোব।"

টুপুর বলল, "ভেবে বলছিস?"

"এর মধ্যে ভাবাভাবির কী আছে?"

"তোর উলটোদিকের আপার বার্থে যে শোবে সে তোর দিকে সারারাত তাকাবে আর মনে মনে বলবে কী জিনিস!" টুপুর বলল।

"একবার বলে দেখুক না, চোখ অন্ধ করে দেব!" মিলা ফুঁসে উঠল।

"মুখে বলবে কেন? ওই লোচ্চাদের মতো সবাই তো নয়। মনে মনে বলবে।"

মিলা ঠোঁট কামড়াল।

চতুর্থ লোকটি ঢুকল ট্রেন ছাড়ার মুখে। সুটকেস রেখে ধপাস করে বসল। ওরা দেখল লোকটাকে। বছর চল্লিশেক বয়স। রুমালে মুখ-ঘাড় মুছছে। তারপর মিলার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কতদূর যাওয়া হচ্ছে?"

"কেন?" মিলা অকারণেই কড়া হল।

"অনেকে শান্তিনিকেতনে নেমে যায়। সেটা হলে ঠিক আছে, নইলে...!"

টুপুর জিজ্ঞেস করল, "নইলে?"

"চেঞ্জ করতে হবে জায়গা। বুঝতেই পারছেন, তিনজন মহিলার সঙ্গে এই কুপেতে রাত কাটালে আমার যেমন অসুবিধে হবে, আপনাদেরও অস্বস্তি হবে।"

"আপনার অসুবিধে হবে কেন?"

লোকটি তাকাল, হাসল। তারপর কিছু না বলে কুপে থেকে বেরিয়ে গেল।

pathagar.net

"স্ট্রেঞ্জ!" রিয়া বলল।

মিলা বলল, "ধুর! এখানে তো সিগারেট খাওয়া যাবে না, এসি বলে কথা!"

রিয়া বলল, "লুকিয়ে ধরা। বাইরে ধোঁয়া না গেলেই হল।"

টুপুর আপত্তি জানাল, "কী দরকার ঝামেলায় গিয়ে। টয়লেটে গিয়ে খেলেই তো হয়। প্রথম রাত্রে এসি টু-টিয়ারের টয়লেট নোংরা থাকে না।"

লোকটি ফিরে এসে সুটকেস তুলে অন্য কুপেতে ঢুকে গেল।

মিলা বলল, "যাই, টয়লেট থেকে ঘুরে আসি।"

চলন্ত ট্রেনের দুলুনি সামলে ও পাল্লা খুলে বাইরে বেসিনের কাছে এসে দেখল তিনজন লোক দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে। ট্রেনে সিগারেট খাওয়া যদি অপরাধ হয়, তা হলে এই জায়গাটাও ট্রেনের বাইরে নয়। কিন্তু ছেলেরা যত সহজে সিগারেট খেতে পারে, মেয়েরা সেভাবে খেলে পাবলিকের চোখ কপালে উঠবে। সে টয়লেটে ঢুকল। স্যাঁতসেঁতে গন্ধ, দুলুনির জন্য ধরে দাঁড়াতে হয়। 'ধ্যুত' বলে সে বেরিয়ে এল বাইরে। উলটোদিকের দরজা বন্ধ। সেখানে কেউ নেই। দরজায় ঠেক দিয়ে পকেট থেকে প্যাকেট বের করে গন্ধ শুঁকে নিল একটু। তাজা তামাকের গন্ধই অন্যরকম। সিগারেট ঠোঁটে চেপে পকেট থেকে লাইটার বের করে আগুন ধরাতেই উলটোদিকের খোলা দরজায় দাঁড়ানো লোকগুলো মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখল। দেখে চোখ স্থির হল ওদের।

"কিছু বলবেন আপনারা?" মিলা জিজ্ঞেস করল।

"না না।" তিনজনেই মাথা নেড়ে বাইরের দিকে তাকাল। সেখানে ঘুটঘুটে অন্ধকার। লোকগুলো বোধহয় আধখাওয়া সিগারেটগুলো বাইরে ছুড়ে ফেলে ভিতরে ঢুকে গেল দরজা খুলে। বেশ মজা লাগল মিলার।

মিনিটখানেক পরে কালো কোটপরা টিকিট চেকার বেরিয়ে এলেন ভিতর থেকে। মিলার দিকে তাকিয়ে বললেন, "কিছু মনে করবেন না, ট্রেনে সিগারেট খাওয়া নিষেধ। তবু আপনার যদি নেশা বেশি হয়, তা হলে দয়া করে টয়লেটে গিয়ে খান, কেউ দেখতে পাবে না।"

"ধন্যবাদ, কিন্তু একটু আগে তিনজন লোক এখানে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিল। তারাও নিশ্চয়ই আইন ভেঙেছে?" মিলা জিজ্ঞেস করল।

"অবশ্যই।"

"আপনি নিশ্চিত যে এখানে দাঁড়িয়ে আর কেউ স্মোক করবে না?"

pathagar.net

"সেটা কী করে বলি! ছেলেরা তো নিয়ম ভাঙেই।"

"তার মানে নিয়ম মেনে চলার দায় শুধু মেয়েদের?"

চেকার ভদ্রলোক জবাব দিলেন না। মিলা সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বলল, "সত্যি কথাটা বলুন তো? আপনার কাছে কেউ আমার নামে কমপ্লেন করেছে?"

"হ্যাঁ।" ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন।

"তিনজন লোক? মাঝবয়সি?"

জবাব না দিয়ে চেকার হেসে চলে গেলেন পাশের কম্পার্টমেন্টে।

সিগারেট শেষ করে বেসিনের কলে তার আগুন নিভিয়ে দরজার বাইরে ফেলে দিল মিলা। দরজা হাট করে খোলা আছে। ওটা বন্ধ করল সে। তারপর কাচের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল। ইতিমধ্যে রাতের খাওয়া শুরু হয়ে গিয়েছে বিভিন্ন কুপেতে। রিয়া দায়িত্ব নিয়েছে তাদের তিনজনের ডিনার নিয়ে আসার।

নিজেদের কুপেতে এসে দেখল, টুপুর কানে ওয়াকম্যান লাগিয়ে চোখ বন্ধ করে আধ-শোওয়া হয়ে আছে। তার পা তাল রাখছে যা শুনছে তার সঙ্গে। রিয়ার হাতে নতুন পেপারব্যাক। উপরে রিভলভারের ছবি। দরজা ঠেলে আসার পথে যে-ক'টা কুপে পড়েছিল, তার একটাতেও মিলা ওই লোক তিনটেকে দেখতে পায়নি।

"টয়লেট পরিষ্কার?" রিয়া বই থেকে মুখ তুলল।

"যেমন হয়। আমি বাইরের বেসিনের পাশে দাঁড়িয়ে স্মোক করেছি।"

"কেউ কিছু বলেনি?"

মিলা লোক তিনটের কথা বলল। শোনামাত্র উঠে বসল রিয়া, "বল, ওদের মুখ দেখে আসি। লোকগুলো নিশ্চয়ই ম্যারেড, বাড়িতে ডিক্টেটর।"

"ছাড়।"

"ছাড়ব কেন? চুকলিবাজদের ছেড়ে দেব? চল। ঘুরে দেখি।"

"ওরা যে চেকারকে বলেছে তার কোনও প্রমাণ নেই।"

"বেশ। এমনিই দেখব, দেখে চলে আসব।"

এইসময় টিকিট চেকার এলেন, এসে হাত বাড়ালেন।

টুপুরকে বলল মিলা। বিরক্ত হয়ে তাকিয়ে চেকার দেখে সে হিপ-পকেট থেকে টিকিট বের করে এগিয়ে ধরল।

সেটা দেখে একটা লিস্টে টিক মেরে টিকিটের উপর সই করে ফেরত

pathagar.net

দিলেন ভদ্রলোক। রিয়া জিজ্ঞেস করল, "এখানে আর কেউ ঢুকবে না তো?"

"সম্ভবত না।" বলে চেকার পাশের কুপের দিকে যেতে ওরা উঠল। মিলা এবার উলটোদিকে হাঁটল, পিছনে রিয়া। একটা কুপেতে পরদা টানা রয়েছে। তবু সামান্য যেটুকু ফাঁক তার মধ্যেই চোখ পড়ল রিয়ার। তিনজনের একজনকে দেখা যাচ্ছে। খুব হাসছে। সে চাপা গলায় বলল, "এখানে আছে।"

"শিওর?" রিয়া তাকাল। মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল মিলা।

সঙ্গে সঙ্গে পরদা ধরে টান দিল রিয়া। উন্মুক্ত হল ভিতরটা। চারটে লোক মদ্যপান করছে। ওরা অবাক হয়ে দেখল চতুর্থ লোকটা সেই ব্যক্তি যে ওদের কুপে থেকে চলে এসেছিল অসুবিধের দোহাই দিয়ে।

"এ কী, কী ব্যাপার?" দু'জন চেঁচিয়ে উঠল।

"কী ব্যাপার? বাঃ! আপনারা পাবলিক প্লেসে বসে মদ খাচ্ছেন আবার জিজ্ঞেস করছেন কী ব্যাপার?"

চতুর্থজন খেপে গেল, "বেশ করছি। আপনাদের কুপেতে গিয়ে তো খাচ্ছি না, আমাদের কুপেতে এসে নাক গলাবার কোনও রাইট আপনাদের নেই।"

ইতিমধ্যে অন্য কুপের লোকজন চলে এসেছে। রিয়া তাদের বলল, "ট্রেনে মদ খাচ্ছে এরা। এরপর মাতাল হবে। মাতাল হয়ে মেয়েদের শ্লীলতাহানি করবে।"

একজন বৃদ্ধ বললেন, "ঠিক কথা। ট্রেনে বসে মদ খাওয়া ক্রাইম। ওদের পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া উচিত। চেকার কোথায়? এই যে ভাই, এদিকে আসুন।"

ভিড় ঠেলে চেকার এলেন। ততক্ষণে চারজন গ্লাস লুকিয়ে ফেলার জন্যে সিটের নীচে চালান করে দিয়েছে। ধাক্কা লেগে একটা গ্লাস উলটে যাওয়ায় বাতাস মদের গন্ধে ভারী হয়ে গেল।

বৃদ্ধ উত্তেজিত হয়ে চেকারকে অভিযোগ জানালেন।

চেকার চারজনকে বললেন, "এঁরা যখন আপত্তি জানাচ্ছেন, তখন আপনারা ড্রিঙ্ক করতে পারবেন না। বুঝতে পারছেন?"

"বেশ। করব না। আমরা নেশা করে মাতাল হওয়ার জন্য তো ড্রিঙ্ক করছি না। একটু আনন্দ করার জন্যই, ঠিক আছে!" একজন বলল।

"আরে! আমরা আপত্তি না করলে ওদের আপনি খেতে অ্যালাউ করতেন?" একজন মাঝবয়সি মহিলা বলে উঠলেন, "খাওয়াটা নিষিদ্ধ না?"

"অবশ্যই," ঘাড় নাড়লেন চেকার।

pathagar.net

"আপনি ওদের ফাইন করুন," বৃদ্ধ বললেন।

"সেটা করার অধিকার আইন আমাকে দেয়নি।"

"কী অধিকার দিয়েছে আপনাকে?"

হঠাৎ চেকার যেন বদলে গেলেন, "আমার নাম এস কে রয়। টিকিট চেকার। দার্জিলিং মেল, এসি টু টিয়ার। আমাকে অ্যাড্রেস করে একটা অভিযোগ লিখে সবাই নিজের ঠিকানা দিয়ে সই করুন। আমি লিখব অভিযোগ সত্যি। তারপর বর্ধমান এলে ওদের রেলওয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেব।" খট খট করে চলে গেলেন ভদ্রলোক।

বৃদ্ধই কাগজ বের করে অভিযোগ লিখে সই জোগাড় করলেন। রিয়া এবং মিলা সই করল। সেটা দেওয়া হল চেকারকে। একটা রশিদ তাঁর কাছ থেকে নেওয়া হল। মিলারা ফিরে এল নিজেদের জায়গায়। তখনও টুপুর কানে যন্ত্র লাগিয়ে গান শুনে যাচ্ছে। এতক্ষণ ধরে কম্পার্টমেন্টে যে-কাণ্ড হল তার কিছুই ওর জানা নেই।

মিলা জিজ্ঞাসা করল, "বর্ধমানে ট্রেন কখন পৌঁছোয়?"

"দুই-আড়াই ঘণ্টা লাগে," রিয়া জিজ্ঞাসা করল, "ডিনার করব?"

"দাঁড়া। বর্ধমান আসুক," মিলা হাসল।

এইসময় কুপের সামনে সেই লোকটি এসে দাঁড়াল, যে এখান থেকে সিট বদলে ওই তিনজনের সঙ্গে মিশেছে। লোকটা হাতজোড় করল, "দিদিভাইরা, ক্ষমা করে দিন। ওঁরা সকলে সরকারি চাকুরে। খুব বিপদে পড়ে যাবে ওদের পরিবারগুলো।"

"আপনার কোনও অসুবিধে হবে না?" রিয়া জিজ্ঞাসা করল।

"হবে। তবে আমি ব্যবসা করে খাই, চাকরি যাওয়ার ভয় তো নেই।"

"দেখুন, আমরা ক্ষমা করার কেউ নই। সকলে যদি ওঁদের ক্ষমা করে দেন, আমরাও দেব। আপনারা অন্যদের কাছে অ্যাপিল করুন।" মিলা বলল।

"বাকিরা তো আপনাদের কথা শুনে জেনেছেন। এটা ঠিক, ওঁরা খুব অন্যায় করেছেন। আপনাকে সিগারেট খেতে দেখে চেকারকে মজা করেই বলেছিল। চেকার যে সেটা সিরিয়াসলি নেবেন তা ভাবেনি।"

"তার সঙ্গে মদ খাওয়ার কী সম্পর্ক?" মিলা জিজ্ঞাসা করল।

"আপনাকে না চটালে তো আপনারা ওঁদের খুঁজতে যেতেন না। এসব সমস্যাও হত না। এতক্ষণে রাতের খাওয়া খেতে শুরু করে দিতাম। লাস্ট আট বছরে অন্তত ছিয়ানব্বইবার আমি এই ট্রেনে যাতায়াত করেছি। রাত্রের

খাওয়ার আগে একটু পান করার শখ আমার। কুপেতে মহিলা থাকলে জায়গা বদলে নিই। কখনও এমন সমস্যায় পড়তে হয়নি আমাকে, প্লিজ।"

নমস্কার করে চলে যেতেই সেই বৃদ্ধ দেখা দিলেন, "কী করা যায় বলো তো দিদিভাইরা? ওরা একেবারে ছেলেমানুষের মতো ক্ষমা চাইছে। তোমাদের কী মনে হচ্ছে, ঢের শিক্ষা পেয়ে গেছে ওরা?"

রিয়া হাসল, "আপনার যদি তাই মনে হয় তা হলে সেটা মানতে আমাদের আপত্তি নেই।"

"গুড। এই ঘটনার কথা ওরা সারাজীবন মনে রাখবে। জেলে পাঠালে ছেলেমেয়ের কাছে মুখ দেখাতে পারবে না ওরা। যাই, চেকারের কাছ থেকে অ্যাপ্লিকেশন ফেরত নিয়ে আসি।" বৃদ্ধ চলে গেলেন।

ডালখোলা স্টেশন পেরিয়ে যেতে যেতে ভোর হয়ে গিয়েছিল। টুপুর টয়লেট থেকে ফিরে এসে ওদের ডাকল। যত বেলা বাড়বে, তত টয়লেটের বাইরে লাইন পড়বে, ভেতরটা কদর্য হয়ে উঠবে। রেলের বেয়ারা এসে চায়ের অর্ডার নিয়ে গেল। মিনিট পনেরো বাদে ওরা যখন জমিয়ে চা খাচ্ছে, তখনও রোদ ওঠেনি বাইরে। এসি কম্পার্টমেন্টের একটাই অসুবিধে যে, বাইরেটা স্পষ্ট দেখা যায় না। কিন্তু রোদ উঠলে বোঝা যায়। মিলা বলল, "কেউ যদি স্টেশনে না আসে তা হলে আমরা সোজা চলে যাব।"

টুপুর বলল, "আসবে।"

রিয়া বলল, "আচ্ছা, আমরা কি মায়ের আমলে পড়ে আছি! একজন উটকো ছেলেকে জোটানোর কোনও মানে আছে?"

"দাদু এমনভাবে বললেন যে, না বলতে পারলাম না। লোকটা নর্থবেঙ্গলের সব ঘাস চেনে। বাংলায় টানা পড়তে অসুবিধে হয়। কিন্তু আমি ওর দুটো থ্রিলার পড়েছি। খুব ইন্টারেস্টিং।" টুপুর বলল।

"মাই গড!" রিয়া বলল, "নর্থবেঙ্গলে বসে থ্রিলার লেখে নাকি? কত বয়স? নিশ্চয়ই অ্যাবাভ ফিফটি?"

"দুর। ও থ্রিলার লিখবে কেন? ওকে নিয়ে লেখা হয়েছে। সমরেশ মজুমদারের নাম শুনেছিস? রাইটার। ওর লেখা থ্রিলারের হিরো।"

রিয়া কাঁধ নাচিয়ে মিলার দিকে তাকাল। ও আজ পর্যন্ত ফেলুদার বই ছাড়া কোনও বাংলা বই পড়েনি। নামটা একদম অচেনা। মিলা বলল, "হ্যাঁ, মনে পড়ছে। টিভি-তে রাইটার হিসেবে নামটা দেখেছি।"

"মাই গড! তুই বাংলা সিরিয়ালগুলো দেখিস? আর আমার সামনে কথা বলবি না।" কপট রাগ দেখাল রিয়া।

"মা দেখে। মাঝে মাঝে আমার চোখে পড়ে।" মিলা বলল।

রিয়া জিজ্ঞেস করল, "তা হলে যে-লোকটাকে স্টেশনে দেখতে পাব সেই লোকটা থ্রিলারের হিরো হয় কী করে? হোমস, পোয়ারো, টিনটিন তো কাল্পনিক!"

"দাদু বলেছেন ও নাকি রিয়েল-লাইফ হিরো। ওকে নিয়েই রাইটার লিখেছে। হি মাস্ট বি ইন আর্লি টোয়েন্টিস।"

"তার মানে আমাদের কাছাকাছি। এরপরে নিশ্চয়ই বলবি না, খুব হ্যান্ডসাম!"

"আমি তো দেখিনি, কী করে বলব।"

"হোয়াট্‌স হিজ নেম?"

"অর্জুন।"

সকাল সাড়ে আটটায় দার্জিলিং মেল নিউজলপাইগুড়ি স্টেশনে ঢুকল। ওরা প্ল্যাটফর্মে নামতেই ওই চারজন লোক অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে পাশ দিয়ে চলে গেল। যাত্রীরা কুলির মাথায় মালপত্র চাপিয়ে ওভারব্রিজের দিকে এগিয়ে চলেছে। দুটো কুলি ওদের কাছে ব্যাগ নিতে এসে মনখারাপ করে চলে গেল।

রিয়া বলল, "অ্যাই টুপ, তোর হিরো কোথায়?"

টুপুর রেগে গেল, "আমার হিরো হবে কেন? আমার কোনও হিরো নেই।"

মিলা হাসল, "গুড। আমরা যেটা প্রমিস করেছি, সেটা যেন ভুলে না যাই।"

"না রে বাবা! না।" টুপুর মাথা নাড়ল।

এই সময় লম্বা, ছিপছিপে, বয়সের তুলনায় একটু গম্ভীর ধরনের এক যুবক ওদের সামনে এসে বলল, "নমস্কার। আপনাদের কেউ কি পরমব্রত সেনগুপ্তকে চেনেন?"

তিনজন নিজেদের দেখে নিলে টুপুর জিজ্ঞেস করল, "অর্জুন?"

"তা হলে কোনও সমস্যা রইল না। আসুন।" অর্জুন ওভারব্রিজের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

Pathagar.net

তিনজন পাশাপাশি হাঁটছে।

রিয়া বলল, "এমনভাবে কথা বলল যেন আমাদের বাবার বয়সি।"

মিলা বলল, "কিন্তু পার্সোনালিটি আছে। তবে কম্পানি হিসেবে একদম চলবে না।"

টুপুর বলল, "দ্যাখ, কেমনভাবে স্টেপ ফেলছে, বেশি ফান্টা। দাদুটা না...।"

ওভারব্রিজ পেরিয়ে বাইরে এসে দেখল অর্জুন একটা ট্যাক্সিওয়ালার সঙ্গে কথা বলছে। তার দিকে তাকিয়ে মিলা বলল, "তোর দাদু বলেছে এই লোকটা নর্থবেঙ্গলের সব ঘাস চেনে। গোরু যখন নয়, তখন ঘাস কেটে ব্যবসা করে নাকি?"

রিয়া হাসল, "মনে হচ্ছে বেশ কিপটে। খুব দরাদরি করছে। আমরাই তো ভাড়া দেব অথচ দ্যাখ মনে হচ্ছে ও নিজের টাকা বাঁচাচ্ছে।"

অর্জুন ওদের কাছে এল, "আপনারা কার্শিয়াংয়ে কোথায় উঠবেন?"

"কোনও ঠিক নেই। দাদু বলেছেন আপনি নাকি ঠিক করে রাখবেন।"

"আপনার দাদুর সঙ্গে আমার সরাসরি কথা হয়নি।" অর্জুন বলল।

"তার মানে?" রিয়া অবাক হল, "তা হলে আপনি এখানে এলেন কী করে?"

"অমলদার অনুরোধে। অমলদা ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ। ওঁর কাছেই আমার কথা শুনেছেন। অবশ্য আসল সর্বনাশ করেছেন সমরেশদা।"

"রাইটার?" টুপুর জিজ্ঞেস করল।

"অ্যাঁ! লেখক! আমার সব কথা উনি লিখে ফেলেন। শুনুন, এই ট্যাক্সি আপনাদের কার্শিয়াংয়ে নিয়ে যাবে। জায়গাটা ছোট্ট, নিজেরাই ঘুরে বেড়াতে পারবেন। হিল কাউন্সিল হওয়ার পর কার্শিয়াংয়ে কোনও গোলমাল হয় না। ও চারশো টাকা চেয়েছিল, সাড়ে তিনশোতে রাজি হয়েছে।" অর্জুন ট্যাক্সিটাকে দেখিয়ে দিল।

"আপনি আমাদের সঙ্গে যাবেন না?" টুপুর জিজ্ঞেস করল।

"আমাকে আপনাদের প্রয়োজন হবে না। চিন্তা করবেন না। আমি কার্শিয়াংয়ে থাকব কয়েকদিন। ওখানকার চার্চের ফাদার খবর পাঠিয়েছেন দেখা করার জন্য। যদি বলেন রোজ ফোনে খবর নিতে পারি।"

"তার দরকার হবে না। আমরা যখন কলকাতা থেকে আসতে পেরেছি, তখন বাকিটাও ম্যানেজ করতে পারব।" রিয়া এগিয়ে গেল ট্যাক্সির দিকে।

Pathagar.net

টুপুর জিজ্ঞেস করল, "আপনি কীভাবে যাবেন?"

মিলা বলল, "একই জায়গায় যখন যাচ্ছেন একসঙ্গে গেলে ক্ষতি কী!"

অর্জুন হাসল, "বেশ। যাওয়ার পথে এয়ারভিউয়ের সামনে এক মিনিট দাঁড়াতে হবে। আপনাদের খোলামেলা কথা বলতে দেওয়ার জন্যই আমি বাসে যাব ভেবেছিলাম।"

ড্রাইভারের পাশে বসল অর্জুন। পাহাড়ের ট্যাক্সি হিসেবে এখন মারুতি ওমনিকে ব্যবহার করা হচ্ছে।

মিলা জিজ্ঞেস করল, "আপনি এখানে থাকেন?"

"না। জলপাইগুড়িতে। পঁয়তাল্লিশ মিনিটের দূরত্ব।" কথাটা বলে সামনের আয়নায় চোখ পড়তেই অর্জুন দেখল রিয়া সিগারেট ধরাচ্ছে।

অমলদা বলেছিলেন, "আমার বন্ধুর নাতনি দুই সহপাঠিনীর সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছে। তোমার হাতে যদি এখন কোনও কাজ না থাকে তা হলে ওদের একটু গাইড কোরো।' কোন ট্রেনে আসছে, কী নাম ওদের তাও বলে দিয়েছিলেন। দেখে মনে হচ্ছে, এরা কলেজের ফার্স্টইয়ারে পড়ে। কিন্তু কথাবার্তায়, পোশাকে নিজেদের বড় করে দেখানোর চেষ্টা খুবই স্পষ্ট।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে গলি দিয়ে শর্টকাট করছিল ট্যাক্সিওয়ালা। মিলা জিজ্ঞেস করল, "এটা কি নিউ জলপাইগুড়ি?"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "না। স্টেশনটার নাম নিউ জলপাইগুড়ি। এটা শিলিগুড়ি শহরের এক্সটেনশন।"

টুপুর বলল, "শহর বলে মনেই হয় না।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনারা কি বাড়িতে ফোন করতে চান?"

"কেন?" টুপুর ধোঁয়া ছাড়ল।

"আপনারা শিলিগুড়িতে পৌঁছে গিয়েছেন এই খবরটা যদি দিতে চান, তা হলে গাড়ি দাঁড় করাচ্ছি, সামনেই একটা টেলিফোন বুথ আছে।"

"তার মানে, কার্শিয়াংয়ে টেলিফোন বুথ নেই?"

অর্জুন বুঝল, মেয়েটা তাকে চিমটি কাটছে। সে কথা বাড়াল না।

টুপুর হাসল, "চিন্তা করবেন না। আমাদের প্রত্যেকের পকেটে সেলফোন আছে। যখন ইচ্ছে তখন কথা বলে নিতেই পারি।"

সেলফোনের কথাটা অর্জুনের মাথায় ছিল না। কয়েক মাস আগে সে একটা সেলফোন কিনেছিল। ব্যবহার করার কথা খেয়াল থাকে না। গতকালও তাড়াহুড়োয় বাড়িতেই ফেলে এসেছে।

pathagar.net

এয়ারভিউ হোটেলের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে অর্জুন ভিতরে গেল। দু'মিনিটের মধ্যে ফিরে এল একটা ব্যাগ নিয়ে। গাড়িতে উঠে বলল, "চলুন।"

রিয়া জিজ্ঞেস করল, "আপনি বললেন জলপাইগুড়িতে আপনার বাড়ি। ধরেই নিচ্ছি সেখান থেকে আজ এসেছেন। তা হলে শিলিগুড়ির হোটেলে আপনার সম্পত্তি কী করে এল?"

"আমি গতকাল বিকেলে এসে ওই হোটেলে উঠেছিলাম।" অর্জুন বলল।

"তাই বলুন। আচ্ছা অর্জুন, নর্থবেঙ্গলকে আপনি যেমন চেনেন তেমনি এই এলাকার মানুষও আপনাকে নিশ্চয়ই চেনেন!" রিয়া জিজ্ঞেস করল।

"না বোধ হয়। আমি তো অভিনেতা বা ক্রিকেটার নই।"

"আপনি সিগারেট খান না?"

"খাই। খুব কম।"

"একটা খাবেন?" রিয়া প্যাকেট এগিয়ে ধরল।

"না। থ্যাঙ্কস।"

"আমরা সিগারেট খাই, সিগারেটে গাঁজা পুরেও খেয়েছি। তবে ড্রাগ টেস্ট করিনি। আপনি করেছেন?"

"একবার এই কার্শিয়াংয়ে এক সাধুর সঙ্গে থাকতে গিয়ে কলকেতে গাঁজা পুরে টেনেছিলাম। চোখের সামনেটায় অন্ধকার নেমেছিল।" অর্জুন বলল।

"বাঃ। আমাদের নিয়ে যাবেন ওখানে?"

টুপুর এবার না বলে পারল না, "এই! কী বলছিস!"

রিয়া শব্দ করে হাসল, "আমি খারাপ কিছু কি বলেছি? ওঁর সঙ্গে একটু না হয় অ্যাডভেঞ্চার করতে যেতাম। আচ্ছা, এ নিয়ে পরে কথা বলা যাবে।"

গাড়ি শুকনার দিকে না গিয়ে বাঁদিকে মোড় নিল। তারপর চা-বাগান পেরিয়ে পাহাড়ি পথ ধরল।

টুপুর বলল, "এত সরু পথে সকলে দার্জিলিংয়ে যায় জানতাম না।"

"এটা শর্টকাট। আমরা পাঙ্খাবাড়ি হয়ে যাচ্ছি। এদিক দিয়ে গেলে রাস্তা অনেক কমে যায়। আপনারা তাড়াতাড়ি পৌঁছোতে পারবেন।" অর্জুন বলল।

"আমাদের যে খুব তাড়া আছে তা আপনাকে কে বলল?" মিলা জিজ্ঞেস করল, "যে-রাস্তায় সকলে যায় সেখান দিয়ে গেলে বেশ দেখতে দেখতে যেতাম।"

কার্শিয়াং শহরে পৌঁছোনো পর্যন্ত সকলে চুপচাপ থাকল। স্টেশনের কাছে

pathagar.net

গাড়ি উঠে এলে অর্জুন বলল, "এই হল কার্শিয়াং। আপনারা কোথায় উঠবেন?"

"জানি না।" রিয়া বলল।

"বেশ। বাজেট বলুন।" অর্জুন ঘুরে বসল।

"আমরা স্টুডেন্ট। পকেটমানির টাকায় এসেছি। আমাদের বাজেট কত হতে পারে ভেবে নিন। তবে অ্যাটাচড বাথ আর পরিষ্কার ঘর চাই।" মিলা বলল।

"টুরিস্ট লজটা বেশ ভাল। ওখানেই চলুন।"

টুরিস্ট লজে গিয়ে শোনা গেল সব ঘর ভর্তি। ভাড়াও পাঁচশো টাকার উপরে।

রিয়া বলল, "খুব রিজনেবল ভাড়া।"

আড়চোখে মেয়েটাকে দেখল অর্জুন। ও কত পকেটমানি পায়? এইসময় ড্রাইভার বলল, "বাজারের কাছে কয়েকটা ভাল হোটেল হয়েছে, সেখানে গেলে ঘর পাবেন।"

অর্জুন বলল, "ঠিক আছে, ওর সঙ্গে চলে যান আপনারা। এখান থেকে চার্চ হেঁটে গেলে মিনিট পনেরো লাগবে। আমি বিকেলে আপনাদের খোঁজ নেব।"

মেয়েরা গাড়িতে উঠে বসেছিল। রিয়া হাত নেড়ে বলল, "বাই!"

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল অর্জুনের। এরকম ট্যাকটেকে কথা সে কখনও শোনেনি। হাঁটতে হাঁটতে সে অনুমান করল, বড়লোকের বখে যাওয়া মেয়ে এরা। পকেট-ভর্তি টাকার সঙ্গে স্বাধীনতাও পেয়ে গিয়েছে এই বয়সে।

মিনিট দশেক হাঁটার পর একজন লোককে দেখতে পেল অর্জুন। এতক্ষণ বাঁদিকে খাদ, বিরাট বাস টার্মিনাল, চা গাছের রাস্তা পেরিয়ে এসেছে শুনশান পথে। লোকটার নির্দেশমতো ডানদিকের পাহাড়ি রাস্তা ধরল সে। নীচের রাস্তা থেকে বোঝা যায় না, উপরের পাহাড়ে একটা সুন্দর কলোনি রয়েছে। রাস্তার দু'পাশে বাড়ির গেট, দরজায় খ্রিস্টান নাম। একজন পাহাড়ি বৃদ্ধ কুকুর নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন যে বাড়ির সামনে, তার দরজায় লেখা আছে 'গেস্ট হাউস'।

চোখাচোখি হতে বৃদ্ধ বললেন, "ইয়েস মাই বয়, হোয়াট ক্যান আই ডু?"

"থ্যাঙ্ক ইউ। চার্চটা কোথায়?"

"জাস্ট উপরে। তুমি কি ফাদার ম্যাকলিনের সঙ্গে দেখা করতে চাও?"

"হ্যাঁ।"

Pathagar.net

"তা হলে তোমাকে বিকেল চারটে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। ফাদার আজ সকালে দার্জিলিংয়ে গিয়েছেন বিশেষ প্রয়োজনে।"

যাচ্চলে। উচিত ছিল ফাদারকে খবর দিয়ে আসা। এখনও ঘণ্টা চারেক অপেক্ষা করতে হবে ফাদারের জন্য। যাই হোক না কেন, আজকের রাতটা কার্শিয়াংয়েই কাটাতে হবে। সে গেস্ট হাউস সাইন বোর্ডটার দিকে তাকাল।

"ফাদার না-ফেরা পর্যন্ত তুমি কি এখানে অপেক্ষা করতে চাও?"

"খুব ভাল হয়।"

বৃদ্ধ ডাকলেন, "এ নিমা, এত্তা আইজ।"

ওপাশ থেকে একটি হাফপ্যান্ট পরা কিশোর বেরিয়ে এল। বৃদ্ধ তাকে নেপালি ভাষায় কিছু বললে সে ইশারায় অর্জুনকে অনুসরণ করতে বলে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে লাগল। অর্জুন এগোল।

দোতলায় প্যাসেজের একপাশে তিন-তিনটে ঘর। ঘরগুলো খালি, কারণ প্রত্যেক দরজায় তালা ঝুলছে। যে ঘরটা নিমা খুলল, সেখানে একটা খাট, টেবিল, চেয়ার, আয়না এবং অ্যাটাচড বাথ রয়েছে। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

'খানা খায়ো?'

মাথা নেড়ে না বলল অর্জুন। হাত বাড়াল নিমা।' থার্টি রুপিয়া ভেজ, ফর্টি রুপিয়া আন্ডাভেজ, ফিপটি রুপিয়া মাটনভেজ।'

আন্ডাভেজ বা মাটনভেজ কখনও শোনেনি অর্জুন। হেসে চল্লিশটা টাকা বের করে নিমাকে দিতেই সে উধাও।

মিনিট দু'-এক পরে, অর্জুন যখন জুতো খুলে পা ছড়িয়েছে বিছানায় তখন বৃদ্ধ দরজায় এলেন, "সরি। নিমা জানত না তাই তোমার কাছ থেকে টাকা নিয়েছে। এই রাখো টাকা।" টেবিলে চল্লিশটা টাকা রেখে দিলেন বৃদ্ধ।

"মানে?"

"তুমি বাইরে থেকে ফাদারের কাছে এসেছ, নিশ্চয়ই কোনও কাজে?"

"হ্যাঁ। উনি আমাকে দেখা করতে বলেছেন।"

"গুড। ফাদার ম্যাকলিন নিশ্চয়ই তাঁর গেস্টকে লাঞ্চ খাওয়াতেন। তার অনুপস্থিতিতে আমি সেটা কেন করব না?" বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন।

অর্জুন অবাক হল। "আপনি ভুল করছেন। ফাদার কী করতেন সেটা তাঁর ব্যাপার। আপনি গেস্ট হাউস চালান, এটা আপনার ব্যবসা।"

"নিশ্চয়ই। কিন্তু আমার খ্রিস্টানরা মনে করি ফাদার যা করেন তা আমাদের

pathagar.net

জন্য করেন। তুমি এখানে চার ঘণ্টা বিশ্রাম নেবে, একটু খাবে, তার জন্য আমি তোমার কাছ থেকে টাকা নিতে পারি না।" বৃদ্ধ হাসলেন।

"তা হলে তো মুশকিল। আপনি টাকা নিতে রাজি না হলে আমাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে। তা ছাড়া চার ঘণ্টা নয়, আমি আজকের রাতটা এখানেই থাকব।"

"সেটা আলাদা কথা, কিন্তু চার ঘণ্টার জন্যে আমি টাকা নিতে পারি না।"

"আপনার এই ঘরের পার ডে চার্জ কত?"

"দু'শো! দু'বেলা খাওয়া, ব্রেকফাস্ট নিলে তিনশো।"

"বেশ।" পকেট থেকে দু'শো ষাট টাকা বের করে চল্লিশ টাকার পাশে রেখে অর্জুন হাসল, "আমি আপনার মতো গেস্ট হাউসের মালিক কখনও দেখিনি।"

"থ্যাঙ্ক ইউ মাই সন, টাকাটা তুলে রাখো। যাওয়ার সময় পেমেন্ট নেওয়াই এখানকার নিয়ম।" বৃদ্ধ চলে গেলেন।

এই পৃথিবীর মানুষগুলো অদ্ভুত। কারও সঙ্গে কারও চরিত্রের মিল নেই।

এখন একটু ঠান্ডা লাগছে। বছরের এই সময়টায় এই পাহাড়ের দুপুরের দিকটায় সোয়েটার না পরলে অসুবিধে হয় না। কিন্তু বেলা গড়ালেই ঠান্ডা বাড়তে থাকে। ব্যাগ থেকে একটা সোয়েটার বের করে গলিয়ে নিতেই নিমা একটা ট্রের ওপর ঢাকা দেওয়া কয়েকটা প্লেট নিয়ে ঘরে ঢুকে টেবিলে রাখল। হেসে বলল, "খানা বহুৎ রামরো ছ'।"

খাওয়া শেষ হলে অর্জুন বেরিয়ে পড়ল। আরও কিছুটা আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে ওঠার পরে চার্চের বাড়ি চোখে পড়ল। পাশে বিশাল বাগান। টিলার উপর চার্চের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেল সে। ও-পাশের নীল আকাশ নেমে গিয়েছে চার্চের পেছনে। গেট খুলে ভেতরে ঢুকল অর্জুন।

বাগানে কাজ করছিল দু'জন লোক। তাদের একজন উঠে দাঁড়াল জিজ্ঞাসু চোখে।

অর্জুন বলল, "ফাদার দার্জিলিঙে গিয়েছেন আমি জানি। ওঁর সহকারী কেউ নেই এখানে?"

লোকটা বলল নেপালিতে, "দু'জনেই দার্জিলিং গিয়েছেন।"

"আমি এখানে অপেক্ষা করতে পারি?"

pathagar.net

"জরুর।"

ঘুরতে ঘুরতে পেছনে চলে এল অর্জুন। অনেক নীচে একটা পাহাড়ি বসতি আবছা দেখা যাচ্ছে। পাকদণ্ডী নেমে গেছে নীচে। এদিকের তারের বেড়ার কিছুটা ভাঙা। স্বচ্ছন্দে যাওয়া আসা করা যায়। সেদিকে একটু যেতেই চোখ পড়ল। অপরাহ্নের রোদ এসে পড়ায় ধাতব বস্তুটি চকচক করছে। অর্জুন এগিয়ে গিয়ে ওটা তুলে নিল। দামি কালো কাঠের হাতলওয়ালা ছুরিটা অন্তত আট ইঞ্চি লম্বা। বস্তুটি ইস্পাতের তৈরি এবং অত্যন্ত ধারালো। তাকালেই বোঝা যায় ওটা খাপের মধ্যে রাখা হত বলে কোথাও একটুও মরচে পড়েনি। কিন্তু এখানে পড়েছিল ঘাসের ওপর, খাপ ছাড়াই।

ছুরিটা দামি। কিন্তু এরকম খোলা অবস্থায় ওকে পকেটে রাখা সম্ভব নয়। পকেট ফুটো হয়ে যাবে। হাতে নিয়ে হাঁটলে লোকের নজরে পড়বে।

"ওটা আমার ছুরি, আমাকেই দিয়ে দিন।"

অর্জুন মুখ ফিরিয়ে দেখল ছিপছিপে লম্বা, বছর পঁচিশের একটি স্কার্ট সোয়েটার পরা মেয়ে তার দিকে হাত বাড়িয়েছে। কথা বলছে স্পষ্ট বাংলায়।

"আপনার ছুরি হলে ওখানে পড়ে থাকবে কেন?"

"পড়ে গিয়েছিল। রাত্রে পড়েছে বলে খুঁজে পাইনি। খাপটা যে ঢিলে হয়ে গিয়েছে জানতাম না। এখন খুঁজতে এসে দেখছি আপনি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ভালই। আমাকে আর কষ্ট করে খুঁজতে হল না।" টানা বলল মেয়েটা।

"কিন্তু এটা যে আপনার তা বুঝব কী করে?"

মেয়েটি খাপ দেখাল। অগত্যা অর্জুন ওকে ছুরি ফিরিয়ে দিল। সেই সময় চার্চের ওপাশে গাড়ির আওয়াজ শোনা গেল। হয়তো ফাদার ফিরে এসেছেন, অর্জুন এগোল। সামনে আসতেই তার চোখ কপালে উঠল। তিনজন মালিদের সঙ্গে কথা বলছে। তাকে দেখতে পেয়েই রিয়া চিৎকার করল, "এই যে মশাই, আপনি কী ভেবেছেন?"

অর্জুন কাছে এল, "বলুন।"

"বেশ তো এখানে এসে শোভা দেখে বেড়াচ্ছেন আর আমাদের পাঠিয়ে দিয়েছিলেন মাফিয়াদের আড্ডায়?"

"মাফিয়া?"

"ও। আপনি জানেন না? কেন? নর্থবেঙ্গলের সব ঘাস নাকি আপনার চেনা? ওই হোটেলে নটরিয়াস লোকজন রাজত্ব করে তা আপনি জানেন

pathagar.net

না? ঘরে এসে বলছে রাতের নাচের পার্টিতে আমাদের যেতে হবে। হ্যাঁ, চেহারা দেখে যদি বুঝতাম ভদ্রলোক তা হলে নিশ্চয়ই যেতাম।" রিয়া বলল।

"বিশ্বাস করুন, ড্রাইভার আপনাদের কোন হোটেলে নিয়ে গেছে তা আমি জানি না। হোটেলের নাম কী?"

টুপুর বলল, "আমরা তো হোটেল ছেড়ে চলে এসেছি, ভাবছি দার্জিলিংয়ে গিয়ে হোটেলে খুঁজে নেব। এদিক দিয়ে যাওয়ার সময় ট্যাক্সিওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম চার্চে চলে আসা যায়। আপনি চার্চে যাবেন বলে শুনেছিলাম তাই আপনাকে জানাতে এসেছি।"

"অনেক ধন্যবাদ। আমার খুব খারাপ লাগছে। দার্জিলিংয়ে গেলে তো প্রথমেই যেতে পারতেন। নিশ্চয়ই কার্শিয়াং আপনাদের অন্য কারণে আকর্ষণ করেছিল।" বলতে বলতে মনে পড়ে গেল গেস্ট হাউসের কথা, "অবশ্য আমি আপনাদের একটা গেস্ট হাউসের কথা বলতে পারি। নীচের রাস্তায়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, অ্যাটাচড বাথ, তিনশো টাকা পার ডে উইথ মিল।" অর্জুন বলল।

রিয়া বলল, "সরি, আপনার উপর ডিপেন্ড করা যায় না।"

মিলা বলল, "আহা, উনি যখন বলছেন তখন একবার দেখেই আসি।"

গাড়িতে মিনিট দুয়েকের মধ্যে গেস্ট হাউসে পৌঁছে গেল ওরা। বৃদ্ধ কুকুর নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হেসে বললেন, "ইয়েস মাই সন, তুমি দেখছি ম্যাজিক জানো। একটু আগে একা এলে এখানে আর এখন তিনজন অ্যাঞ্জেলকে সঙ্গে নিয়ে এসেছ। গুড আফটারনুন, গুড আফটারনুন, গুড আফটারনুন।" তিনজনের দিকে আলাদা করে ঝুঁকে বললেন বৃদ্ধ।

তিনজনেই বেশ অবাক। অর্জুন বলল, "এঁরা কলকাতা থেকে বেড়াতে এসেছেন। কার্শিয়াং বাজারের কাছে একটা হোটেলে আজ দুপুরে থাকতে গিয়ে খুব খারাপ অভিজ্ঞতার জন্যে চলে এসেছেন। আমার খুব শ্রদ্ধেয় একজন ওর দাদুর বন্ধু।"

বৃদ্ধ বিচলিত, বলেন, "কার্শিয়াংয়ের কোন হোটেলে তোমাদের খারাপ অভিজ্ঞতা হয়েছে? না, না, এটা ঠিক নয়। যাঁরা বেড়াতে আসেন তাঁদের আমরা অতিথি বলে মনে করি। নামটা জানা দরকার।"

"হোটেল স্কাইলেভেল।" মিলা বলল।

"ওঃ! বুঝতে পেরেছি। তোমাদের কি খুব অসম্মান করেছে?" বৃদ্ধ উদ্বিগ্ন।

pathagar.net

টুপুর ব্যাপারটাকে সহজ করার জন্যে বলল, "ওরা ভেবেছিল আমরা তিনটে মেয়ে গার্জেন ছাড়াই এসেছি। তাই বেশ কম্যান্ড করে বলেছিল রাত্রে ওদের সঙ্গে নাচতে যেতে হবে। যেন আমরা ওদের কথা শুনতে বাধ্য।"

বৃদ্ধ বললেন, "আমি তোমাদের কাছে কার্শিয়াংয়ের সমস্ত মানুষের তরফ থেকে ক্ষমা চাইছি। এরকম ঘটনা আর ঘটবে না।"

ওঁর বলার ভঙ্গি দেখে তিনজনেই হেসে ফেলল। রিয়া বলল, "এই গেস্ট হাউস আপনার?"

"বাড়িটা আমার। একা থাকি, কথা বলার সঙ্গী পাব বলে গেস্ট হাউস করেছি। শহর থেকে দূরে, পাহাড়ের মধ্যে বলে টুরিস্টরা খবর পায় না। তবে যে একবার এসেছে সে তার বন্ধুদের এখানেই পাঠায়।" বৃদ্ধ বললেন।

অর্জুন বলল, "ওঁদের যদি ঘর অপছন্দ না হয় তা হলে এখানেই থাকতে পারে। নিমাকে একবার ডাকবেন?"

"নিশ্চয়ই। নিমা, এ ও নিমা!"

নিমা চলে এল সামনে। বোধ হয় আড়ালে থেকে সে কথাবার্তা শুনছিল। বলল, "আইয়ে মেমসাব।" মেয়েরা ওর পেছনে ওপরে উঠে গেলে বৃদ্ধ পকেট থেকে মোবাইল বের করে নম্বর টিপলেন। সাড়া পেয়ে নেপালি ভাষায় যা বললেন তার মানে অর্জুন বুঝতে পারল। হোটেল স্কাইলেভেলে তিনজন বাঙালি টুরিস্ট মেয়ের সঙ্গে আজ অশোভন ব্যবহার করা হয়েছে। অশ্লীল প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এটা কারা করেছে তা খুঁজে বের করতে অনুরোধ জানালেন তিনি।

উপর থেকে চিৎকার ভেসে এল, "ফ্যান্টাস্টিক। আমরা এখানেই থাকব।" মিলা শেষ করতেই রিয়া বলল, "আপনি ডেঞ্জারাস লোক অর্জুন। নিজে এখন ভাল জায়গায় এসে লাঞ্চ করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর আমাদের ঠেলে দিয়েছেন বাজারি হোটেলে?"

অর্জুন কিছু বলার আগেই বৃদ্ধ মুখ তুলে বললেন, "তোমাদের নিশ্চয়ই খুব খিদে পেয়েছে। কিন্তু এখন ভাতরুটির লাঞ্চ করলে শরীর খারাপ হবে। বরং ফ্রেশ হয়ে ভাল স্ন্যাক্স খেয়ে নাও। আর হ্যাঁ, মায়েরা, দয়া করে এবার শাল বা সোয়েটার ব্যবহার করো।"

গাড়ির শব্দ শোনা গেল। মেয়েরা নেমে এসে ওদের ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে মালপত্র নামাতেই গাড়িটাকে ওপরে উঠে আসছে দেখা গেল। বৃদ্ধ হাত নেড়ে থামতে বললে ওটা ট্যাক্সিটাকে পেরিয়ে গিয়ে থামল।

pathagar.net

বৃদ্ধ দ্রুত এগিয়ে গিয়ে বললেন, "গুড আফটারনুন ফাদার। আপনাদের দার্জিলিংয়ের কাজ নিশ্চয়ই ভালভাবে হয়েছে?"

"কিছুটা হয়েছে, তবে আর একবার যেতে হবে।"

"আপনার একজন গেস্ট আমার গেস্ট হাউসে উঠেছেন।"

"আমার গেস্ট?"

অর্জুন শুনছিল। এগিয়ে গিয়ে বলল, "গুড আফটারনুন। আমি অর্জুন।"

"অ-র-জু-ন!" বৃদ্ধ ফাদারের মুখে বিস্ময়ের ছাপ পড়েই উধাও হল, "ও। তুমি অর্জুন। কখন এসেছ? আমাকে জানাওনি কেন যে আজ আসবে! উঠে এসো।"

ফাদার ড্রাইভারের পাশের সিট দেখিয়ে দিতে দরজা খুলে উঠে বসল অর্জুন। ফাদার বললেন, "আমি ফাদার ম্যাকনিল, আর ইনি ফাদার নায়ার। তোমার কোনও অসুবিধে হয়নি তো অর্জুন?"

"না, বিন্দুমাত্র নয়।"

"ফাদার নায়ার, আপনি কি অর্জুনের নাম শুনেছেন আগে?"

ফাদার নায়ার খুব গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। মাথা নেড়ে না বললেন।

"আগে আমিও শুনিনি। কিছুদিন আগে ওর গল্প শুনলাম।"

"গল্প? উনি কি লেখেন?" নায়ার নিস্পৃহ গলায় জিজ্ঞাসা করলেন।

"ওয়েল, তা বলা যেতে পারে।"

অর্জুন অবাক হল। ফাদার ম্যাকনিল প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন কেন?"

চার্চের পাশেই ফাদার ম্যাকলিনের বাড়ি। ওপাশের গেস্ট হাউসে ফাদার নায়ার থাকেন। ঢোকার সময় অর্জুনের নজরে এসেছে চার্চের দরজা খুলে গেছে। কিন্তু ফাদার ম্যাকলিন তাকে নিয়ে বসলেন স্টাডিরুমে। কাজের লোক চা আর বিস্কুট দিয়ে গেল। এখনও সূর্য অস্ত যেতে আধঘণ্টাটাক দেরি। ওপাশের বিরাট আকাশ থাকায় আলো এখনও যথেষ্ট।

পট থেকে কাপে চা ঢেলে এগিয়ে দিয়ে ফাদার বললেন, "আমি খুব খুশি হয়েছি তুমি এসেছ বলে।"

"এখানে কোনও সমস্যা হয়েছে—?"

"হ্যাঁ। দ্যাখো, আমি এই পাহাড়ে দশ বছর আছি। আমার আগেও যিনি বা যাঁরা ছিলেন তাঁদের কেউই স্থানীয় মানুষের কাছে দুর্ব্যবহার পাননি। পাহাড়ে

Pathagar.net

আন্দোলনের সময় আগুন জ্বলেছে কিন্তু চার্চের পবিত্রতা নষ্ট হয়নি। কিন্তু ঠিক দশ দিন আগে আমার প্রিয় দুটো কুকুরের প্রথমটিকে কেউ বা কারা খুন করে চার্চের দরজায় ফেলে গিয়েছিল। ঘটনাটা ঘটেছিল ঠিক মাঝরাত্রে। রাত্রে ঘুমাতে যাওয়ার সময় আমি ওদের ছেড়ে দিতাম। ঠান্ডা খুব না বাড়লে ওরা বাগানে ঘুরে বেড়াত। পাহাড়ি শেয়ালগুলোকে তাড়াত।"

"কীভাবে খুন করা হয়েছিল?"

"গলার শিরা ধারালো ছুরি দিয়ে কাটা হয়েছিল।"

"তখন দ্বিতীয় কুকুরটি কোথায় ছিল?"

"সে সম্ভবত ভয় পেয়ে ভেতরে পালিয়ে গিয়ে চেঁচাতে থাকে। ওটা একটু ভিতু প্রকৃতির ছিল। আমার ঘুম ভেঙেছিল কিন্তু ভেবেছিলাম শেয়াল দেখেছে।"

"পুলিশ এসেছিল?"

"হ্যাঁ। যেখানে দিনদুপুরে মানুষ খুন হচ্ছে সেখানে একটা কুকুরকে খুন করা হয়েছে বলে ওরা আদৌ চিন্তিত হয়নি।"

"আপনি কি কাউকে সন্দেহ করেন?"

"না। তারপর কাল দ্বিতীয়টিও খুন হয়েছে।"

"সে কী।"

"প্রথমটি খুন হওয়ার পর ওকে আমি রাত্রে আর ছাড়তাম না। কাল সন্ধেবেলায় যখন আমি চার্চে প্রেয়ারে ছিলাম তখন চেন-বাঁধা অবস্থাতেই ওকে খুন করে গেছে। শুধু তাই নয় আবার তোয়ালেতে ছুরিতে লেগে থাকা রক্ত পরিষ্কার করেছে।" ফাদার ম্যাকলিন জানালেন।

"এটা পুলিশকে জানিয়েছেন?"

"নাঃ। ওরা তো কোনও গুরুত্বই দেবে না। কিন্তু অর্জুন, দু'-দুটো নিরীহ প্রাণীকে যারা হত্যা করল তারা বোধ হয় আমাকে জানাতে চাইল যে এখান থেকে চলে না গেলে আমার অবস্থা ওদের মতো হবে। আমি ভয় পাই না। কারণ আমি কোনও অন্যায় করিনি। আজ দার্জিলিংয়ে গিয়ে বিশপের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তিনিও বললেন খুনির উদ্দেশ্য না জেনে চলে যাওয়া আমার উচিত হবে না। আমি তোমার কথা ওঁকে বলেছি।" ফাদার ম্যাকলিন কথা শেষ করলেন।

"আচ্ছা, ফাদার নায়ার এখানে কতদিন আছেন?"

"মাস দুয়েক। খুব পণ্ডিত মানুষ। একটু গম্ভীর কিন্তু বাইবেল সম্পর্কে ওঁর

জ্ঞান শ্রদ্ধা জাগায়। শুধু দুটো বিষয় ওঁর একটু দুর্বলতা আছে বলে মনে হয়—।" কথা বলতে বলতে যা বলার নয় তা বলে ফেলেছেন বলে থেমে গেলেন ফাদার ম্যাকলিন। অর্জুন বলল, "আপনি সংকোচ না করে বলুন।"

"বই। বই সম্পর্কে উনি খুব দুর্বল। না-পড়া বই দেখলেই সেটা পাওয়ার জন্যে উনি ব্যস্ত হয়ে ওঠেন।"

"দ্বিতীয়টা?"

"সুন্দরী মহিলার সান্নিধ্য পেলে উনি খুব খুশি হন। এর আগের জায়গাতেও ওঁকে নিয়ে গুঞ্জন উঠেছিল। চার্চ এ ব্যাপারে ওঁকে সতর্ক করে দিয়েছে। কিন্তু এসবের সঙ্গে আমার প্রিয় কুকুর দুটির খুনের নিশ্চয়ই কোনও সম্পর্ক নেই।" ফাদার ম্যাকলিন বললেন।

অর্জুন মাথা নাড়ল। তারপর বলল, "আপনার বাংলোর এবং চার্চের কর্মচারীদের সঙ্গে আমি একটু কথা বলতে পারি?"

"অবশ্যই। তুমি কি এখনই কথা বলতে চাও?" ফাদার জিজ্ঞাসা করলেন।

"হ্যাঁ।"

"তা হলে আমি ওদের বলছি এখানে এসে দেখা করতে।" ফাদার উঠে দাঁড়ালেন, "অর্জুন, আমি জানি না তোমার প্রোফেশন্যাল ফি কত, কিন্তু আমি জানি তুমি অপরাধীদের ধরতে সক্ষম হবে। আমি তোমার ওপর নির্ভর করছি।" মাথা নেড়ে বেরিয়ে গেলেন ফাদার।

প্রথমে যে এল তাকে দেখেই বোঝা যায় মানুষটি ভাল।

"আপনি এখানে কী করেন?"

"হাম কুক হ্যায় সাব।"

"কতদিন আছ?"

"বিশ সাল সাব।"

"কে খুন করতে পারে কুকুরদুটোকে?"

লোকটা কেঁদে ফেলে জানাল যে খুব ভাল প্রাণী ছিল ওরা। ওর হাতে দু'বেলা খেত। যে খুন করেছে তাকে ভগবান নিশ্চয়ই শাস্তি দেবেন।

শেষ প্রশ্ন করল অর্জুন, "লম্বা চেহারা, স্কার্টপরা কোনও মেয়েকে এখানে দেখেছ?"

লোকটা ভাবল। তারপর মাথা নেড়ে না বলল।

দারোয়ান, বাবুর্চি, জমাদার, মালীরা প্রায় একই জবাব দিল। শুধু চৌকিদার শেষ প্রশ্নের জবাব দিল আলাদা, "আপনি যেমন চেহারা বলছেন তেমন

pathagar.net

চেহারার একজন ফাদার নায়ারের কাছে পড়তে আসতেন। দিন তিন-চার এসেছেন।"

"কতদিন আগে?"

"দেড় মাস বড় জোর।"

"এখন আসেন না?'

"না।"

"কিন্তু এখানকার আর কেউ ওঁকে দেখেনি কেন?"

"উনি আসতেন সন্ধের পর। তখন সবাই ভেতরে থাকত। আমি শুধু বাইরে পাহারায় থাকতাম। প্রথমবার উনি আমার কাছে ফাদার নায়ারের খোঁজ করেছিলেন। আমি গেস্ট হাউস দেখিয়ে দিয়েছিলাম।" চৌকিদার বলল।

"ইনি নিশ্চয়ই কার্শিয়াংয়ের মানুষ। থাকেন কোথায়?"

"আমি জানি না সাব।"

"সত্যি কথা বলো। তোমার কোনও ভয় নেই।" অর্জুন হাসল।

লোকটা একটু ভাবল। তারপর বলল, "আমি ওঁকে আর একবার দেখেছি বাজারে। স্নাইলেভেল হোটেলের সামনে। উনি আমাকে দেখেননি।"

অর্জুন বেরিয়ে এল। চার্চে এখন প্রেয়ারের সময় হয়েছে। ধর্মপ্রাণ কিছু মানুষ চার্চে যাচ্ছেন। ফাদার ম্যাকলিন নিশ্চয়ই সেখানে আছেন। ফাদার নায়ারকে দরজায় দেখতে পেল অর্জুন। সে কাছে গেল।

"গুড ইভনিং, ফাদার।"

ফাদার আবার তাকালেন, 'গুড ইভনিং। ফাদার ম্যাকলিন তো এখন ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। ওঁকে কিছু বলতে হবে?"

"না না। ওঁর সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে। আমি শুনলাম আপনি কেউ পড়াশুনা করতে চাইলে তাকে সাহায্য করেন।"

"যে-কোনও মানুষের তো সেটাই করা উচিত।"

"আচ্ছা ফাদার, একটি মেয়ে মাস দেড়েক আগে আপনার কাছে পড়তে আসত। তার সঙ্গে আজ আমার দেখা হয়েছিল। তাকে কি আপনি আসতে নিষেধ করেছেন?"

"আপনি কার কথা বলছেন?"

"বছর পঁচিশেক বয়স। ও আসত সন্ধের পরে।"

"সরি। আমার মনে পড়ছে না।" ফাদার ঘুরে দাঁড়ালেন, "আমাকে এখন প্রেয়ারে যেতে হবে। গুড নাইট।" ফাদার চলে গেলেন।

Pathagar.net

আধঘণ্টা বাদে গেস্ট হাউসের একতলায় বৃদ্ধের মুখোমুখি বসেছিল অর্জুন। বেশ ঠান্ডা পড়েছে। মেয়েরা ওপরের ঘরে নেই। নিমাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে। সঙ্গে টর্চ আছে।

বৃদ্ধ মদ্যপান করছিলেন। পাতলা বিয়ারের মতো মদ। বাড়িতে তৈরি। বললেন, "এখানকার একজন মহিলা রোজ আমাকে এনে দেন। নিজেই তৈরি করেন।"

টেবিলে এক প্লেট মাংস। বৃদ্ধ বললেন, "তুমি কি গোরুর মাংস খাও?"

"না।" মাথা নাড়ল অর্জুন, "ধর্মের কারণে নয়, খেতে ইচ্ছে করে না, তাই।"

একটু আগে অর্জুন বৃদ্ধকে তার অভিজ্ঞতার কথা বলেছে। এবার মেয়েটির কথা জিজ্ঞাসা করল। বৃদ্ধ ভাবলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, "মেয়েটি নেপালি?"

"বুঝতে পারিনি। নেপালিদের মতো চোখমুখ নয়।"

"চৌকিদার ওকে বাজারে দেখেছে? স্কাইলেভেল হোটেলের সামনে?"

"হ্যাঁ।"

"লম্বা, স্কার্ট পরে, বছর পঁচিশেক বয়স!" বৃদ্ধ মাথা নাড়লেন, "বোধ হয় বুঝতে পেরেছি। মাস দেড়েক আগে এক সন্ধ্যার পর আমার এখান দিয়ে ওপরে যাওয়ার সময় জিজ্ঞাসা করেছিল চার্চ কত দূরে। কিন্তু সে খ্রিস্টান নয়। হলে চার্চ চেনাতে হত না। মনে হচ্ছে গুপ্তাজির মেয়ে।"

"গুপ্তাজি কে?"

"স্কাইলেভেলের মালিক। ওর স্ত্রী নেপালি। দুই ছেলে। ছেলেদুটো অত্যন্ত বদ। যত বখে যাওয়া ছেলেকে নিয়ে আড্ডা মারে ওখানে। আমি খবর পেয়েছি, এই তিনটে মেয়েকে ওরাই উত্ত্যক্ত করেছে। কিন্তু মেয়েটা দার্জিলিংয়ে থাকে। ওর সম্পর্কে কিছু শুনিনি।"

"ওর নাম জানেন?"

"না।" বৃদ্ধ পকেট থেকে সেলফোন বের করে নাম্বার টিপলেন। নেপালিতে জিজ্ঞাসা করলেন কাউকে মেয়েটি সম্পর্কে। তারপর ফোন বন্ধ করে বললেন, "ওর নাম নয়না।"

এইসময় মেয়েরা হইহই করে এসে গেল। নিমা তাদের নিয়ে এল বৃদ্ধের এই ঘরে। অন্ধকারে পাহাড়ি রাস্তায় হাঁটতে তাদের নাকি ফ্যান্টাস্টিক লেগেছে। বিশেষ করে দূরের পাহাড়ের আলোগুলো খুব আকর্ষণ করেছে

pathagar.net

ওদের। অর্জুন লক্ষ করল টুপুর এবং মিলার চেয়ে অনেক হালকা শীতবস্ত্র পরেছে রিয়া। সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার শীতে অসুবিধে হচ্ছে না?"

"আমার রক্ত একটু গরম। কিছু করার নেই।" কাঁধ ঝাঁকাল রিয়া।

হঠাৎ বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার কি ধারণা যে-ছুরিটাকে তুমি আজ চার্চের পেছনে কুড়িয়ে পেয়েছিলে সেটা দিয়েই কুকুরটাকে গত রাত্রে খুন করা হয়েছে?"

"না। আমি তো দেখিনি, কোনও প্রমাণও পাইনি। গত রাত্রে দ্বিতীয় কুকুর খুন হয়েছিল ছুরির আঘাতে। অর্থাৎ ওর গলা কাটা হয়েছিল এটা সবাই বলেছে আমাকে। সুতরাং, ছুরি ব্যবহার হয়েছিল। আর আজ একটা ছুরি আমি চার্চের পেছনের বাগানে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। বাগানে ছুরি পড়ে থাকার কথা নয়। মেয়েটি, যার নাম নয়না, এসেছিল ছুরির খোঁজে। তথ্য এটুকুই।"

"হোয়াটস দিস?" চেঁচিয়ে উঠল রিয়া, "আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না!"

টুপুর উৎসাহী হল, "আপনি কি এখানে খুনের তদন্ত করতে এসেছেন?"

মাথা নাড়ল অর্জুন, "আসার পর জেনেছি গত দিনদশেকের মধ্যে এখানকার চার্চের দুটো ভাল জাতের কুকুরকে ছুরি দিয়ে মারা হয়েছে। ফাদার খুব আপসেট হয়ে পড়েছেন। আমাকে অনুরোধ করেছেন কে খুন করেছে তা খুঁজে বের করতে।"

"এটা তো পুলিশের কাজ, পুলিশকে বলেছেন উনি?" মিলা জিজ্ঞাসা করল।

বৃদ্ধ হাসলেন, "মানুষ খুন হলেও পুলিশ যখন সমাধান করতে পারে না তখন কুকুরদের নিয়ে কি মাথা ঘামাবে খুকি?"

মিলা প্রতিবাদ করল, "আমি খুকি নই।" তার ভঙ্গি দেখে সবাই হেসে উঠল।

ঘড়ি দেখল অর্জুন। হঠাৎ তার মাথায় একটা ভাবনা এল। সে রিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি যেতে পারবেন?"

"কোথায়?" রিয়া অবাক।

"ফাদার নায়ারের কাছে।"

"তিনি কে?"

এবার ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলল অর্জুন। নয়না দেড়মাস আগে ফাদার নায়ারের কাছে কয়েকদিন যাওয়ার পর আর এই তল্লাটে আসেনি। অর্জুন বলল, "আপনি নয়নার বান্ধবী। কলেজে পড়েন, কলকাতায় এখানে এসে

pathagar.net

ফাদার নায়ারের কথা শুনেছেন। ক'দিন থাকবেন সেন্ট মেরিসে। মামার বাড়ি। যা মনে আসবে তাই মামার নাম হিসেবে বলতে পারেন। আপনি ওঁকে অনুরোধ করবেন, বাইবেল অবশ্যই ধর্মীয় গ্রন্থ কিন্তু তাতে সেকালের মানুষের জীবনের যে-ছবি পাওয়া যায় তা আপনাকে বুঝিয়ে বলতে। আজ নয়, তা হলে কাল থেকে আপনি ওঁর কাছে আসতে পারেন। কী পারবেন অভিনয় করতে?”

রিয়া সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল, “ও কে!”

মিলা আপত্তি করল, “তুই কি খেপে গেলি? এখানকার কিছুই জানিস না। ধরা পড়ে গেলে কী হবে ভেবে দ্যাখ।”

রিয়া বলল, “কিছু হবে না। আমি এই ভদ্রলোককে দেখিয়ে দিতে চাই আমাকে নিয়ে কোনও বই লেখা না হলেও আমি কিছু কম নই। চলুন।”

“আমি কোথায় যাব?” অর্জুন একটু অস্বস্তিতে, সে ভাবেনি রিয়া রাজি হয়ে যাবে।

“ফাদার নায়ার কোথায় থাকেন দেখিয়ে দেবেন।”

বৃদ্ধ বললেন, “প্রেয়ার শেষ হয়ে গেছে। লোকজন নেমে যাচ্ছে।”

অগত্যা অর্জুন রিয়াকে নিয়ে বের হল। বাইরের ঠান্ডা আরও বেড়েছে।

“আপনি কি মোটা পুলওভার পরে নেবেন?” অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

“নাঃ।” হাসল রিয়া, “তার চেয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে হাঁটুন, ঠান্ডা কমবেই।”

অর্জুন বিরক্ত হয়ে মাথা নাড়ল। হাঁটতে হাঁটতে রিয়া জিজ্ঞাসা করল, “আচ্ছা, এরকম নির্জন রাস্তা, অন্ধকারে জোনাকি জ্বলছে, আমি আপনার পাশে হাঁটছি, কেমন লাগছে?”

“ভালই।”

“প্রেম করতে ইচ্ছে করছে না?”

“করছে তো।”

দাঁড়িয়ে পড়ল রিয়া, “মাই গড। কী করে?”

“এই তো, কথা না বলে চুপচাপ পাশাপাশি হেঁটে।” অর্জুন হাসল।

“নাঃ। আপনাকে দিয়ে চলবে না।” এবার হাঁটতে শুরু করল।

চার্চের কাছে এসে, বাঁক ঘোরার আগেই অর্জুন দাঁড়াল, “ঘুরলেই চার্চ। তার বাঁ দিকে গেস্ট হাউস। সেদিকে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন একটু। একজন চৌকিদার আপনাকে জিজ্ঞাসা করলে তাকে ফাদার নায়ারের কাছে যাব বললেন। সে-ই দেখিয়ে দেবে।”

Pathagar.net

BANGLA EBOOK DOWNLOAD.COM
FREE BANGLA

"বাই।"

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে কত রাতপাখি ডেকে গেল। চার্চ এখন বন্ধ, অন্ধকারে ডুবে আছে। হঠাৎ একটা ছায়ামূর্তিকে দৌড়ে আসতে দেখল অর্জুন, প্রাণভয়ে লোকে ওভাবে দৌড়ায়। কাছে আসতেই চিনতে পেরে সামনে দাঁড়াল অর্জুন, "কী হয়েছে?"

"তাড়াতাড়ি চলুন এখান থেকে।" নীচের দিকে দৌড়াল রিয়া। তাকে অনুসরণ করে ধরে ফেলল অর্জুন। ওর হাত ধরে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "পালাচ্ছেন কেন?"

"লোকটা মরে গেছে।" হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রিয়া।

"কে?"

"জানি না। ফাদারের পোশাক পরা। সোফায় চিত হয়ে পড়ে আছে। গলা থেকে রক্ত বের হচ্ছে। মাই গড।" দু'হাতে মুখ ঢাকল রিয়া।

রাস্তা থেকে ওকে সরিয়ে একটা গাছের আড়ালে নিয়ে এল অর্জুন, "আপনাকে কে দরজা খুলে দিল?"

"কেউ দেয়নি। কোনও চৌকিদারকে দেখতে না পেয়ে আমি দরজা ঠেলতেই ওটা খুলে গিয়েছিল। ভেতরে আলো জ্বলছে দেখে আমি 'ফাদার' বলে তিনবার ডেকে সাড়া না পেয়ে এগিয়ে গিয়েছিলাম। উঃ। কী ভয়ংকর!" রিয়া কাঁপছিল। অর্জুন ওকে এক হাতে জড়িয়ে ধরতেই সে ককিয়ে উঠল, "আমার খুব ভয় লাগছে।"

"কোনও ভয় নেই। আপনাকে কেউ কি দেখেছে?"

"জানি না। আমি কারও দেখা পাইনি।" কাঁপুনি থামল রিয়ার।

"চলুন। আমরা এবার চার্চে যাব।"

"না। ওখানে আমি যাব না!"

"যাবেন। আপনাকে কেউ দেখেছে কি না জানা দরকার। দেখে থাকলেও অন্ধকারে চেনা সম্ভব নয়। তারপরে আপনি যদি আমার সঙ্গে যান তা হলে ভাববে অন্য মেয়ে।"

প্রায় জোর করেই রিয়াকে নিয়ে অর্জুন চলে এল ফাদার ম্যাকলিনের বাংলোয়। ফাদার তখন সবে ডিনার শেষ করেছেন। কাজের লোক খবর দেওয়ায় হন্তদন্ত হয়ে, চলে এলেন বসার ঘরে, "তোমার কথাই ভাবছিলাম অর্জুন। তখন প্রেয়ারের সময় হয়ে গিয়েছিল, আর কথা বলতে পারিনি। কিছু পেলে?"

pathagar.net

"কিছু। একটি মেয়ে রাত্রে ফাদার নায়ারের কাছে পড়তে আসত। ওই একমাত্র বাইরের লোক। আপনার কুকুরদুটো কি ফাদার নায়ারের ঘরে যেত?"

"হ্যাঁ। ফাদার অল্পদিনেই ওদের সঙ্গে ভাব করে নিয়েছিলেন। কিন্তু ফাদার নায়ারের কাছে কোনও মহিলা আসত পড়াশুনার জন্যে একথা তো কেউ আমায় জানায়নি। মেয়েটি কে?" ফাদার ম্যাকলিন প্রশ্ন করলেন।

"মেয়েটির নাম নয়না। হোটেল স্কাইলেভেলের মালিক মিস্টার গুপ্তার মেয়ে। তবে সে এখানে থাকে না, দার্জিলিংয়ে থাকে।"

"ও। মেয়েটির সঙ্গে কুকুর খুনের কী সম্পর্ক?"

"অপরিচিত কাউকে কুকুররা গলায় হাত দিতে কিছুতেই দেবে না। ফাদার নায়ারের কাছে আসায় মেয়েটি কুকুরদের পরিচিত হয়ে গিয়েছিল।"

"তার মানে, তুমি বলছ, নয়নাই কুকুরদের খুন করেছে?"

"আমার অনুমান। এ ব্যাপারে ফাদার নায়ারকে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে।"

"বেশ। চলো এখনই।" হঠাৎ ফাদার ম্যাকলিনের খেয়াল হল, "ইনি?"

"ওঁর নাম রিয়া। ওঁরা তিন বান্ধবী পাহাড় দেখতে এসেছেন। উঠেছেন নীচের গেস্ট হাউসে।" অর্জুন পরিচয় করিয়ে দিল।

"গ্ল্যাড টু মিট ইউ।" ফাদার হাসলেন।

অনেকক্ষণ পরে রিয়ার মুখে হাসি ফুটল।

ফাদার নায়ারের ঘরে এসে তাঁর মৃতদেহ আবিষ্কার করে ভেঙে পড়েছিলেন ফাদার ম্যাকলিন। তাঁর চেঁচামেচিতে চার্চের সবাই সেখানে উপস্থিত হল। কেউ জানে না ফাদার নায়ার কীভাবে খুন হয়েছেন। কাউকে এদিকে আসতে কেউ দেখেনি। অর্জুন লক্ষ করল কথাটা শোনার পর রিয়ার মুখ চোখ সহজ হয়ে গেল।

থানায় ফোন করা হয়েছিল। পুলিশ এসে গেল আধঘণ্টার মধ্যে।

ফাদার ম্যাকলিন পরিচয় করিয়ে দিলেন। ওসি নেপালি, কিন্তু তাঁর সহকারী বাঙালি। ভদ্রলোক চেঁচিয়ে উঠলেন, "আপনি অর্জুন? আপনি এখানে?"

ফাদার ম্যাকলিন বললেন, "উনি আমার অতিথি।"

ওঁরা তন্নতন্ন করে খুঁজলেন। কোনও ক্লু পেলেন না। বোঝা যাচ্ছে ফাদার নায়ারের গলার শিরা কেটে ফেলা হয়েছে। সঙ্গে আসা সেপাইরা গেস্ট

pathagar.net

হাউসের বাইরে টর্চ নিয়ে খোঁজাখুঁজি করছিল। হঠাৎ একজন চেঁচিয়ে উঠল। অফিসাররা ছুটে গেলেন। অর্জুন সঙ্গে গেল। ঘাসের উপর টর্চের আলোয় ছুরিটা চকচক করছে। এটা সেই ছুরি, কোনও সন্দেহ নেই অর্জুনের। ওসি রুমালে জড়িয়ে তুলে নিয়ে বললেন, "এক ফোঁটা রক্ত লেগে নেই।" নাকের কাছে নিয়ে এসে শ্বাস টানলেন, "কিন্তু রক্তের গন্ধ পাচ্ছি। নিশ্চয়ই কোথাও মুছে ফেলা হয়েছে ছুরিটাকে। খোঁজো তোমরা।"

ফাদার ম্যাকলিনকে জিজ্ঞাসা করলেন ওসি, "এই ছুরি আগে দেখেছেন?"

মাথা নাড়লেন ফাদার, "না।"

"আমি দেখেছি।" অর্জুন বলল।

"আপনি? কখন? কোথায়?" ওসি অবাক।

অর্জুন বিকেলের ঘটনাটা বলল।

"আপনি আমার সঙ্গে চলুন।" ওসি গাড়ির দিকে এগোলেন।

অর্জুন বলল, "যাওয়ার পথে আপনার গাড়িতে ও কি লিফট পেতে পারে নীচের গেস্ট হাউস পর্যন্ত?"

"অবশ্যই।"

রিয়াকে গেস্ট হাউসের সামনে নামিয়ে জিপ ছুটল বাজারের দিকে। কার্শিয়াংয়ে এখন বেশ রাত। বাজারের দু'-চারটে দোকান খোলা আছে এখনও। হোটেল স্কাইলেভেলের সামনে গাড়ি থামল। দু'জন অফিসারের সঙ্গে অর্জুন ভেতরে ঢুকতেই একটা লোক একগাল হেসে বলল, "আপনারা? এ-সময়?"

"গুপ্তাজি কোথায়?"

"উনি তো কলকাতায় গিয়েছেন, সবাই জানে।"

"ওর ছেলেদের ডাকো।"

"স্যার, ডেকে কোনও লাভ হবে না। এখন ওরা কথা বলার মতো অবস্থায় নেই।" লোকটা অর্থপূর্ণ হাসি হাসল, "আপনি তো সব জানেন!"

"জানি। কিন্তু আজ ওদের সঙ্গে কথা বলতে চাই। কোথায় ওরা?"

ওসি বাধ্য করলেন দোতলার একটি ঘরে ওঁদের নিয়ে যেতে। সেখানে তিনটে ছেলে আর দুটো মেয়ে নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছে। কথা বলার চেষ্টা করে কোনও লাভ নেই। ওসি লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মেয়েদুটো কোথাকার?"

pathagar.net

"শিলিগুড়ির। আমাদের হোটেলে উঠেছে।"

"মিস্টার গুপ্তার মেয়েকে ডাকুন। ওরা যখন কথা বলতে পারবে না তখন ওঁর সঙ্গেই কথা বলি।" ওসি বললেন।

"কী বলছেন স্যার। মিস গুপ্তকে এখানে কি ডাকতে পারি?"

"তা হলে চলুন, ওঁর কাছেই যাব।"

তিনতলার বসার ঘরে পৌঁছে লোকটা ভেতরে গেল। একটু পরেই কালো স্কার্ট, কালো ব্লাউজ, কালো জ্যাকেট পরে নয়না ঘরে ঢুকল, "ইয়েস। বলুন।" এবং তখনই অর্জুনকে দেখতে পেয়ে চমকে উঠল সে।

ওসি বললেন, "আপনাকে বাধ্য হয়ে বিরক্ত করছি। আপনি কি আজ চার্চের দিকে গিয়েছিলেন?"

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে মাথা নাড়ল নয়না "হ্যাঁ।"

"কখন?"

"বিকেলে?"

"কেন?"

"বেড়াতে।"

"বেড়াতে, না একটা ছুরি খুঁজতে?"

"ছুরি? আপনার কথা বুঝতে পারছি না।"

রুমালে মোড়া ছুরিটা বের করে রুমালসমেত সামনে ধরলেন ওসি, "এটাকে চিনতে পারছেন?"

"না।"

"কিন্তু এর হাতলে আপনার হাতের ছাপ যদি পাওয়া যায়?"

"অসম্ভব।"

অর্জুন বলল, "এই ছুরির খাপ আপনার কাছে আছে। থাকতে বাধ্য। আপনি সেই খাপের মধ্যে ছুরিটাকে ঢুকিয়ে নিয়ে এসেছেন। ছুরিটাকে ব্যবহার করার পর যে-কোনও কারণেই হোক ফেলে দেওয়া আপনার স্বভাব। খাপটা থেকে যেত কাছে। অফিসার, ওর হ্যান্ডব্যাগ বা টেবিলের ড্রয়ার সার্চ করলে খাপটা পেয়ে যাবেন বলে আমার বিশ্বাস।"

অফিসার বললেন, "চলুন।"

"আপনার কাছে সার্চ ওয়ারেন্ট আছে?"

"না নেই।"

pathagar.net

"তা হলে?"

"এটা এমন একটা জরুরি ব্যাপার যে ওয়ারেন্টের দরকার আছে বলে মনে করি না। চলুন।"

"এই ছুরি আপনারা কোথায় পেয়েছেন?"

"চার্চের গেস্ট হাউসের পাশে, ঘাসের ওপর।"

"সে কী? কেন?"

অর্জুন জবাব দিল, "ফাদার নায়ারকে গলার শিরা কেটে খুন করা হয়েছে। আর এই কাজটা আপনি ছাড়া আর কারও পক্ষে সম্ভব নয়। গত রাত্রে দ্বিতীয় কুকুরটাকে মেরে ফেলার পরে ছুরিটা ছুড়ে ফেলেছিলেন বাগানে। আজ গিয়েছিলেন ওটাকে খুঁজে নিয়ে আসতে। এখন যদি আমরা এখানে না আসতাম তা হলে আগামীকাল আপনাকে যেতে হত ছুরিটাকে খুঁজতে। কিন্তু নয়না, ওই নিরীহ কুকুরদুটোকে কেন খুন করলেন?"

বড় শ্বাস ফেলল নয়না। তারপর ধীরে ধীরে বসল চেয়ারে। শান্ত গলায় বলল, "ওরা খুব বেশি রকমের পাহারা দিত। আমার সঙ্গে ভাব হয়েছিল কিন্তু মনে হত আমাকে ওরা সন্দেহ করে।"

ওসি জিজ্ঞাসা করলেন, "ফাদার নায়ারের অপরাধ কী?"

"ওঁর কাছে আমি পড়তে গিয়েছিলাম। দ্বিতীয় রাত্রেই উনি আমাকে প্রেম নিবেদন করেন। আমার ভাল লাগে। তৃতীয় রাত্রে উনি, উনি আমাকে বাধ্য করেন সেক্সে। চতুর্থ রাত্রে আমি যখন বিয়ের প্রস্তাব দিই উনি রিফ্যুজ করেন। আমি এটা মেনে নিতে পারি না। আমি যা করেছি তা না করলে আমার শান্তি হত না।" নয়না উঠল। পাশের ঘর থেকে নিজের হ্যান্ডব্যাগ নিয়ে এসে তার ভেতর থেকে ছুরির খাপ বের করে ওসির হাতে তুলে দিল।

পুলিশের গাড়ি অর্জুনকে পৌঁছে দিল গেস্ট হাউসে। রাত এখন এগারোটা। প্রচণ্ড কুয়াশা চারপাশে। গাড়ি থেকে নেমে সিঁড়িতে পা দিতেই ওপরে আলো জ্বলে উঠল, শাল মুড়ি দেওয়া তিনটে মেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। রিয়া ছুটে এল, এসে হাত ধরল অর্জুনের, "কী হল?"

অর্জুন হাসল, "অপরাধী ধরা পড়েছে।"

"কী করে?"

pathagar.net

"ঘরে চলো, বলছি।"

নিজের ঘরের দরজা খুলল অর্জুন। তারপর বলল, "আমার খুব খিদে এবং ঘুম পেয়েছে। কাল সকালে কথা হবে। গুড নাইট!"

দরজা বন্ধ করতেই বাইরে থেকে রিয়ার গলা ভেসে এল, 'আপনি, আপনি একটা ভীষণ বেরসিক।"

অর্জুন হেসে ফেলল।

সমাপ্ত

...boi.net
BANGLA EBOOK DOWNLOAD.COM
FREE BANGLA